10. **মৎস্যক্ষেত্র ঃ** স্বাদু জলের মৎস্যক্ষেত্রগুলির মধ্যে নদনদী অন্যতম। সারাভারতের স্থানীয় বাজারগুলিতে প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ টন স্বাদু জলের মাছ বিক্রি হয় তার প্রধান উৎস হল নদনদী। শতদ্রু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও অন্যান্য ছোট ছোট নদীতে পর্যাপ্ত পরিমানে মাছ ধরা হয়। সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ভারতে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ নদনদী থেকে ধরা হয়।

11. **জলবায়ু ঃ** নদীর জলরাশি অনেকক্ষেত্রে জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন করতে সহায়তা করে। নদীতীরবর্তী অঞ্চলে সাধারনত আরামদায়ক আবহাওয়া বিরাজ করে।

12. **শ্রমিক ঃ** ভারতের শতদ্রু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, কাবেরী কৃষ্মা, গোদাবরী, মহানদী প্রভৃতি উপত্যকাগুলি ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। যে সকল প্রাকৃতিক উপাদান ঘন বসতি বা জনবসতি গড়ে তোলে তাদের মধ্যে নদী অন্যতম। নদী উপত্যকার ঘন জনবসতি একদিকে কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সুলভ শ্রমিকের যোগান দেয়, আবার অন্যদিকে খাদ্যশস্য ও অন্যশস্য উৎপাদনের চাহিদা সৃষ্টি করে থাকে, ফলে নদী কৃষিকে ব্যাপকভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

13. **তীর্থক্ষেত্র ঃ** নদীতীরবর্তী অঞ্চলে অনেক তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। এই তীর্থক্ষেত্রগুলি ভারতবাসীদের জীবনে নানানভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

14. **হ্রদ-উপহ্রদ ঃ** ভারতের ভূপ্রাকৃতিক গঠনের বৈচিত্র্য ও জলনির্গম ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যে হ্রদের একটি ভূমিকা আছে। নদনদীর ন্যায় হ্রদগুলিকে সাধারণভাবে দুভাগে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। যথা (1) হিমালয়ের হ্রদ ও (2) উপদ্বীপ ভারতের হ্রদ। উত্তর প্রদেশের নৈনিতাল অঞ্চল, জম্মু কাশ্মীরের কাশ্মীর লাদাক অঞ্চল এবং জম্মু অঞ্চল এই তিনটি অঞ্চলে হিমালয়ের হ্রদগুলি বর্তমান।

কুমায়ুন হিমালয়ের নৈনিতালে 7টি বড় হ্রদ রয়েছে। যথা নৈনিতাল, ভীমতাল, নৈকুচিয়াতাল, সাতাল, শুনাতাল, মালওয়া তাল, খুরপাতাল, এদের মধ্যে নৈনিতাল বৃহত্তম। এর দৈর্ঘ্য 510 মি, 1,500 মি চওড়া ও 20 মি গভীর। এই হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব কোণে বালিয়া নদী প্রবাহিত। এর অন্যান্য দিক উঁচু পাহাড় বেষ্টিত।

ভীমতালের আকৃতি ত্রিভুজকার। দৈর্ঘ্য 1860 মি., চওড়া 500 মি. ও গভীরতা 30 মি। উত্তর থেকে নোলি গদনা নদী এই হ্রদে পড়েছে। আর গাধেরা নদী এই হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নৌকুচিয়া তালের নয়টি কোণ। এটি 1008 মি. লম্বা, 750 মি. চওড়া, 45 মি. গভীর। এর উত্তরভাগে অনেক ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে। অন্যান্য দিক পাহাড়ী খাড়া ঢালযুক্ত। অন্যান্য হ্রদগুলি ছোট। এই সকল হ্রদে প্রচুর মাছ আছে। তাছাড়া এই সকল হ্রদের নৈসর্গিক পর্যটক শোভা দেখার জন্য অনেক পর্যটকের সমাগম হয়।

কাশ্মীর — লাডাক অঞ্চলের হ্রদগুলির মধ্যে স্বাদু জলের হ্রদ যথা কাশ্মীর উপত্যকার ডাল হ্রদ, উলার হ্রদ, হার নাগ, দুধনাগ, অঙ্কার হ্রদ, বূপসু অঞ্চলের 4600 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত সো মোরারি, ওলাডাক পার্বত্য মালভূমির 4250 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত নোনাজলের হ্রদ লিংজি চিং উল্লেখযোগ্য।

উলার হ্রদ ঃ উলার হ্রদ 1578 মিটার উচ্চতায় কাশ্মীর উপত্যকায় ঝিলাম নদীর প্রবাহ পথে অবস্থিত। সাধারণভাবে এর আয়তন 30 বর্গকিমি। ঝিলাম নদীতে প্লাবন হলে এর আয়তন বেড়ে 260 কিমি হয়। এই হ্রদের উত্তর ও পশ্চিমে পাহাড় পর্বত রয়েছে।

ডালহ্রদ ঃ ঝিলাম উপত্যকার শ্রীনগরে কাছে ছোট আকারের প্রায় 20 কিমি আয়তন বিশিষ্ট স্বচ্ছ জলের হ্রদ হল ডাল হ্রদ। এটিকে চার দিকে থেকে 100–1200 মি. উঁচু পাহাড় ঘিরে রয়েছে। এটি একটি অন্যতম পর্যটক কেন্দ্র। জম্মু অঞ্চলে ক্ষয় প্রাপ্ত উর্ধ্ব ভঙ্গে তিনটি সুন্দর হ্রদ রয়েছে। এর মধ্যে সরুউনসর, মানসর, বাসুকিনাগের নাম করা যেতে পারে। লাডাক, বুপসু নোনাজলের হ্রদ। অত্যধিক বাষ্পীভবনের ফলে এই হ্রদ গুলির লবণতা বেড়েছে।

উপদ্বীপ ভারতেব হ্রদ ঃ পশ্চিম রাজস্থানে উঁচু পাহাড়ের নোনা জলের হ্রদ প্লায়া হ্রদ নামে পরিচিত। জয়পুর শহরের 64 কিমি পশ্চিমে সম্বর হ্রদ অবস্থিত যা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 360 কিমি উঁচুতে বিদ্যমান। আয়তন 240 বর্গকিমি, লম্বা 32 কিমি। রাজস্থানের অন্যান্য নোনাজলের হ্রদ হল চপ্পর, পাঁচভদ্র, দিদ্ওয়ানা।

কচ্ছের রণ ঃ গুজরাটের কচ্ছ উপদ্বীপের নোনা জলের নিম্নভূমি কচ্ছের রন নামে পরিচিত। এটি বৃহৎ ও ক্ষুদ রনে বিভক্ত। এর মোট আয়তন 24.000 বর্গ কিমি। বিস্তার 55 কিমি। এটি পূর্বে নাব্য ছিল, বর্তমানে পলিতে ভরাট হয়েছে।

লোনার হ্রদ ঃ মহারাষ্ট্রের লোনার হ্রদ একটি বৃত্তাকার হ্রদ। অনেকের মতে কোন এক আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে জল জমে এই হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে।

চিল্কা হ্রদ ঃ উড়িষ্যার পুরী জেলার বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে বালুচড়ার মধ্যে যে উপহ্রদ সৃষ্টি হয়েছে, তা চিল্কা হ্রদ নামে পরিচিত। লম্বা 90 কিমি. এবং আয়তন 1200 বর্গকিমি। এই হ্রদে জোয়ার ভাঁটা হয়ে থাকে।

কোলেরু হ্রদ ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ম বদ্বীপ ও গোদাবরী বদ্বীপের মাঝখানে কোলেরু হ্রদ অবস্থিত। হ্রদটি অগভীর ও উপবৃত্তাকার। আয়তন 250 বর্গকিমি।

পুলিকট হ্রদ ঃ তামিলনাডু ও মাদ্রাজ শহরের উত্তরে অগভীর লেগুনকে পুলিকট হ্রদ বলে। এটি 15 কিমি. চওড়া, 60 কিমি. লম্বা এবং গভীরতা 2 কিমি। বর্ষায় এটি প্লাবিত হয়ে যায়।

কয়াল হ্রদ ঃ মালাবার উপকূলের উপহ্রদগুলি কয়াল নামে পরিচিত। ভেমবানাদ, অষ্টমুদী কয়াল দুটি উল্লেখযোগ্য। ভেমবানাদ কয়ালটি আয়তনে 205 বর্গ কিমি। এই জলপথে নৌকা-ষ্টীমার চলাচল করে।

3.1.3 জলবায়ু (Climate)

❑ ভূমিকা

আয়তনের বিশালতা, উপদ্বীপীয় অবস্থান, ভূমিরূপের বিচিত্রতা ভারতের জলবায়ুতে বৈচিত্র্য এনেছে। উত্তর পশ্চিমে থর মরুভূমির তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে 50^0 C-র বেশি ওঠে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 12 সে.মি.-র কম। উত্তর পূর্বে মেঘালয়ের মৌসিনরাম অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় 1300 সে.মি.। আগস্ট মাস নাগাদ হিমালয়ের

চিত্র 3.18 ঃ ভারতের বার্ষিক বৃষ্টিপাত

অনেক শহর মেঘাবৃত থাকে এবং আর্দ্রতা শতকরা প্রায় একশ ভাগে পৌঁছায়। মালাবারের কোচিনে বার্ষিক তাপমাত্রার প্রসার যেখানে 12^0 সেন্টিগ্রেড, মরুস্থলীর গঙ্গানগরে তা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় 30^0 সেন্টিগ্রেড। বস্তুতঃ (ক) উত্তরের হিমালয় পর্বতমালা, (খ) মধ্যভাগে কর্কটক্রান্তি রেখার অবস্থান, (গ) দক্ষিণ ভাগের ভারত মহাসাগর ভারতের জলবায়ুকে এক বিশেষ রূপ দিয়েছে। হিমালয় এক দিকে শীতকালে মধ্য এশিয়া থেকে ছুটে আসা শুষ্ক হিমশীতল উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহকে বাধা দেয় ও ভারতে প্রবেশ করতে দেয় না, অপর দিকে

গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ভারত মহাসাগর দিয়ে ছুটে আসা জলীয় বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহকে বাধা দেয় ও প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটায়। (ঘ) উত্তর গোলার্ধে সূর্যের আপাতগতির সীমারেখা (কর্কটক্রান্তি রেখা) ভারতে মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে বলে ভারতে উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং দক্ষিণাংশ উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। দক্ষিণ ভারত উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হলেও সমুদ্রসান্নিধ্য ও উচ্চতার জন্য এখানে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। (ঙ) দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের অবস্থানের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিমে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভূ-প্রকৃতির গঠন অনুযায়ী কয়েকটি বৃষ্টিপাত অঞ্চল সৃষ্টি করেছে। ভারতের কোন অঞ্চলে কিরকম বৃষ্টিপাত হয় তার বার্ষিক বণ্টন মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

ভারত মৌসুমী জলবায়ুর দেশ। মৌসুমী জলবায়ুর প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ **আর্দ্র-উষ্ম গ্রীষ্মকাল** ও **শুষ্ক-শীতল শীতকাল**। আর্দ্র গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এবং শুষ্ক শীতকালীন মৌসুমী বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। বৃষ্টিপাত একটানা হয়ও না। চাপ বলয়ের স্থান পরিবর্তনের ফলে মাঝে-মাঝে বৃষ্টিপাতের সাময়িক বিরতি ঘটে। **এক নির্দিষ্ট মানের ক্ষমুতা, স্বল্প দৈনিক তাপমাত্রার প্রসার, বায়ুর আর্দ্রতা, নিয়মিত মরসুমি বৃষ্টিপাত** প্রভৃতি ভারতের মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য।

ভারতের জড়বায়ুর প্রধান প্রধান ঋতু ঃ আবহাওয়াবিদ্‌গণ বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার তারতম্য অনুযায়ী ভারতের জলবায়ুকে চারটি ঋতুতে ভাগ করেন—

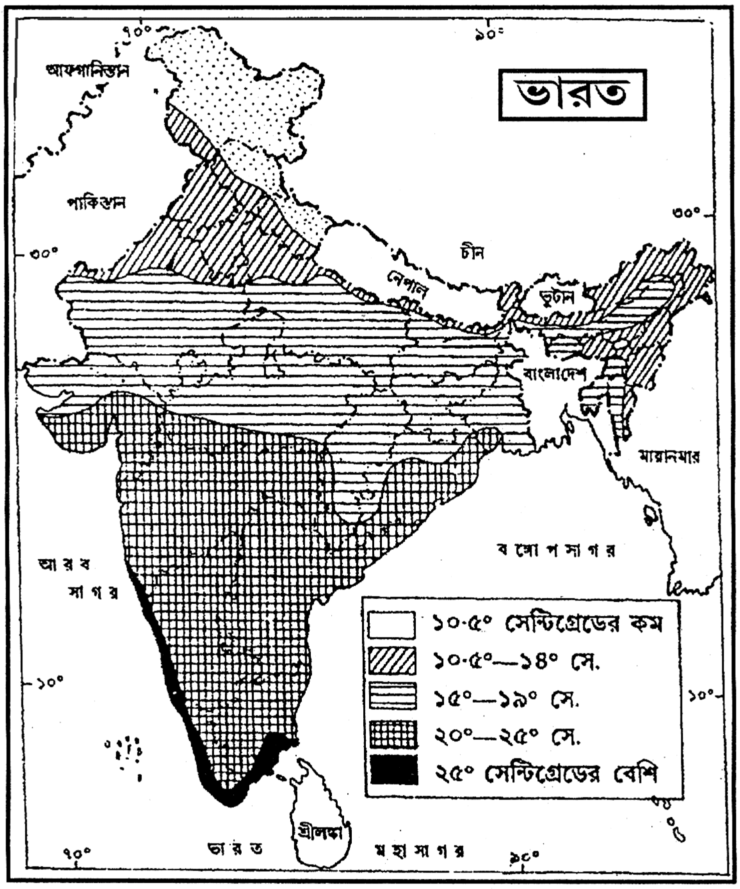

চিত্র 3.19 ঃ ভারতের গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারী)

1. **শীতকাল (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী) ঃ** এই সময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে সরে যায় বলে তাপমাত্রা কমে। তাছাড়া শীতল, শুষ্ক ও তীব্র উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। আকাশ পরিষ্কার ও মেঘশূন্য থাকে। জানুয়ারীর গোড়ার দিকে সারা এশিয়া মহাদেশে তাপমাত্রা খুব নিচে নেমে যায়। শতদ্রু সমভূমি ও মরুস্থলী অঞ্চলে উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়। দক্ষিণে কেরল ও তামিলনাড়ু অঞ্চলে বায়ুর চাপ তখন খুব কমে যায়। ফলে উচ্চচাপ অঞ্চলে থেকে শুষ্ক শীতল বায়ু প্রবাহ দক্ষিণে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এ সময় উত্তর-পূর্ব মেরুবায়ু প্রবাহ দক্ষিণে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। ভারতে এ বায়ু প্রবাহ এক শৈত্য প্রবাহের সৃষ্টি করে। স্থলভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এ বায়ু প্রবাহে জলীয়বাষ্প থাকে না। এই বায়ু প্রবাহ বৃষ্টিপাত ঘটায় না। তাই শীতকালে সারা ভারতে আবহাওয়া মোটামুটি শুষ্ক ও শীতল থাকে। এ সময় ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে উৎপন্ন ঘূর্ণবাত ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভারতের শতদ্রু সমভূমিতে প্রবেশ করে। কোন কোন সময় জলীয় বাষ্পপূর্ণ এই পশ্চিমাবায়ু প্রবাহ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছায়। শীতকালে এই পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহ এক ঝঞ্ঝাপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে বলে একে

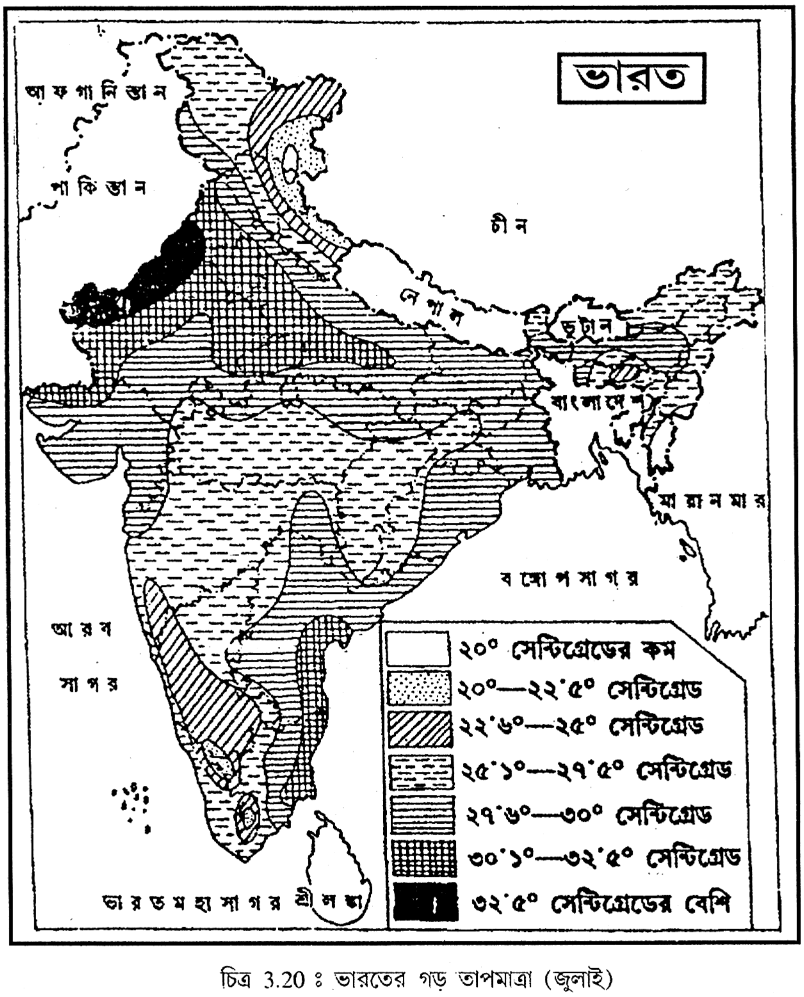

চিত্র 3.20 ঃ ভারতের গড় তাপমাত্রা (জুলাই)

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা বলে যা পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে প্রচুর তুষারপাত ঘটায়, আর শতদ্রু সমভূমি ও উচ্চগঙ্গা সমভূমিতে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ কারণেই বলা হয় যে, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চলে বছরে দু'বার বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমা (গ্রীষ্ম ও শীতকালীন) ঝঞ্ঝার জন্য কাশ্মীর ও হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলে তুষারপাত হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে শীতকালীন বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালীন বৃষ্টিপাতের জনয এই অঞ্চলে গম চাষ ভাল হয়। তাছাড়া, উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে করমণ্ডল উপকূলের দক্ষিণভাগে খানিকটা বৃষ্টিপাত ঘটায়।

2. **গ্রীষ্মকাল (মার্চ-মে)** ঃ এই সময় সূর্যের উত্তর গোলার্ধে সরে আসার জন্য ভারতে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ে এবং মে-জুন মাসে চরমে পৌঁছায়।

ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল 37.5 সে. সমোষ্ণ রেখার অন্তর্ভুক্ত হয়। মরুস্থলী অঞ্চল সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাই 'নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা'' (রবীন্দ্রনাথ)। এই সময় মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। আবার স্থানীয় কারণে স্থানে স্থানে স্বল্প এলাকা জুড়ে স্থানীয় নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয় এবং আশেপাশের কোন কোন অংশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে মার্চ-মে মাস নাগাদ নরওয়েস্টার নামক এক প্রবল ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়। কবির ভাষায় 'খরবায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে''। এই ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 80–160 কিমি পর্যন্ত হয়। কখনও কখনও এই ঘূর্ণিঝড় ঘরবাড়ি ধ্বংস করে।

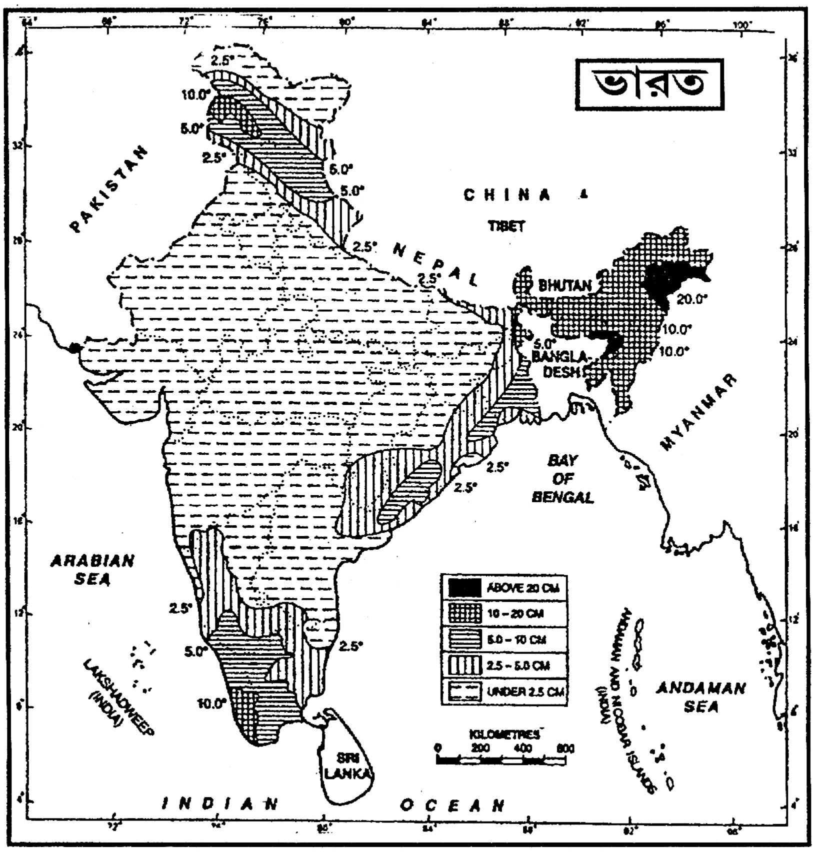

চিত্র 3.21 ঃ ভারতের বৃষ্টিপাতের বণ্টন (এপ্রিল)

বৈশাখ মাসে এমন অশুভ ও ক্ষতিকারক ঝড় হয় বলে পশ্চিমবঙ্গে একে কালবৈশাখী বলে। শীতের শেষে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গে দুই রকম বায়ুপুঞ্জ প্রবাহিত হয়। উত্তর ভাগে শীতল শুষ্ক উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ুপ্রবাহ ও দক্ষিণ প্রান্তে উষ্ম আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ। এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বায়ুমণ্ডলে দুইটি ভিন্নধর্মী বায়ুপুঞ্জ পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থান করে। এই দুইটি বিপরীত ধর্মী বায়ুপুঞ্জ সীমান্তে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় উষ্ম আর্দ্র বায়ুর একটি অংশ শীতল শুষ্ক বায়ুপুঞ্জের অভ্যন্তরে বক্রাকারে প্রবেশ করে। যেহেতু উষ্ম বায়ু শীতল বায়ু অপেক্ষা হাল্কা, তাই উষ্ম-আর্দ্র বায়ুর একটি অংশ শীতল শুষ্ক বায়ুর উপর তির্যকভাবে উঠে যায় এবং অপর অংশ শীতল বায়ুকে উপরে উঠতে সহায়তা করে। উষ্ম-আর্দ্র-বায়ু শীতল বায়ুর উপরে উঠে গেলে তা ক্রমশঃ কিউমুলোনিম্বাস মেঘে পরিণত হয়। এই মেঘ থেকে বজ্র বিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিপাত হয়। আবার জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবল বেগে উর্ধ্বগামী হয় বলে জলকণা জমে ছোট বড় শিলার আকার ধারণ করে এবং ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠে শিলাবৃষ্টিও হয়। তাই ''এত যে ভীষণ তবু তারে হেরি ধরার ধরে না হর্ষ, ওরি মাঝে আছে কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ''। (কমি মোহিতলাল)

এইরূপ ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণ ভারতে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তা আমের ফলন বাড়ায়। তাই এই বৃষ্টিপাতকে দক্ষিণ ভারতের **আম্রবৃষ্টি** বলে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে এই ঘূর্ণিঝড়ের ফলে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না। এই অঞ্চলে এটা ধূলিঝড় বা 'আঁধি' বলে পরিচিত।

3. **বর্ষাকাল (জুন-সেপ্টেম্বর)** ঃ এই সময় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর আরব সাগরীয় শাখা প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে তীব্র গতিতে জুনের প্রথম সপ্তাহে মালাবার উপকূলে পৌঁছায় এবং পশ্চিমঘাট

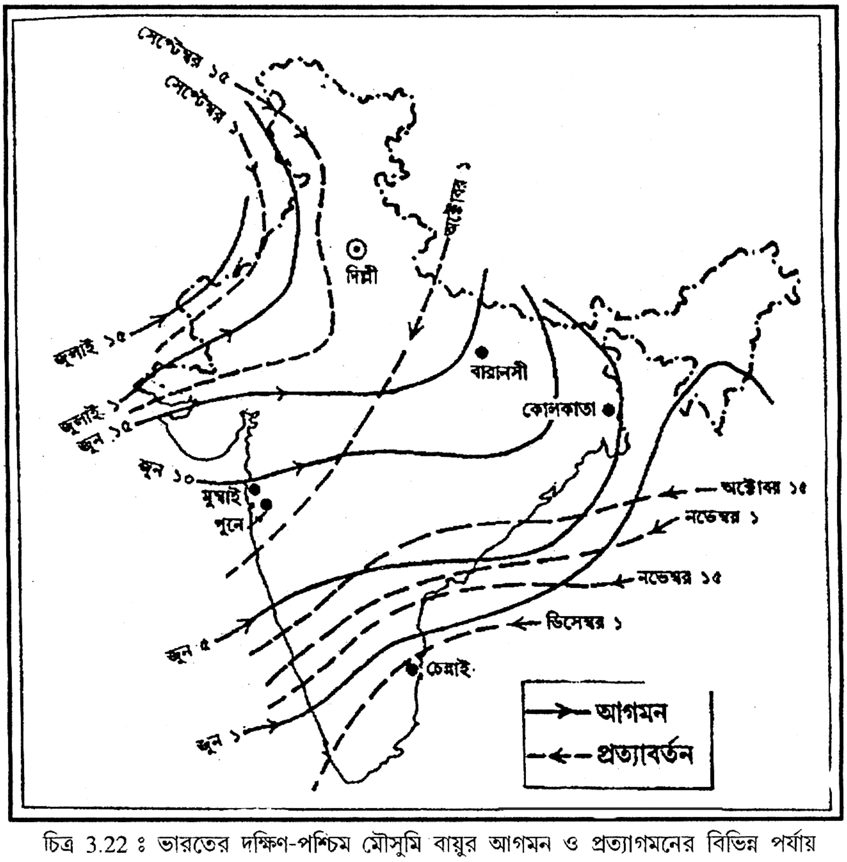

চিত্র 3.22 ঃ ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমনের বিভিন্ন পর্যায়

পর্বতের পশ্চিমভাগে বৃষ্টিপাত ঘটায়। কবির 'ভাষায়' "আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা ভাদরে, আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও ধরে"। উপকূলভাগের উত্তরাংশের চেয়ে দক্ষিণাংশে বৃষ্টিপাতের সময়সীমা ও পরিমাণ বেশি। এই বায়ু কোঙ্কন ও উত্তর কর্ণাটক উপকূলে চার-পাঁচ মাস, মাঙ্গালোর অঞ্চলে ছয় সাত মাস এবং কেরল উপকূলে আট-নয় মাস ধরে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পশ্চিমঘাটের পূর্বভাগ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত বলে বৃষ্টিপাত কম হয়। পালঘাট, ভোরঘাট ও থলঘাট ফাঁক (gap) দিয়ে প্রবাহিত এই আর্দ্র-বায়ুর খানিকটা অংশ দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে কিছু বৃষ্টিপাত ঘটায়। গুজরাট ও রাজস্থানে উঁচু পর্বত না থাকায় এবং সেখানকার স্থলভাগের অত্যধিক উষ্ণতার জন্য এই বায়ুপ্রবাহ কাথিয়াবাড়, কচ্ছ ও মরুস্থলী অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাতের সূচনা করে। আরাবল্লী পর্বত এই বায়ুপ্রবাহের সমান্তরালে অবস্থিত বলে মরুস্থলিতে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। নর্মদা ও তাপ্তি উপত্যকা অঞ্চল দিয়ে এ বায়ু প্রবাহ বিন্ধ ও সাতপুরা পর্বতমালায় প্রবাহিত হয় এবং ঐ অঞ্চলে বাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত ঘটায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষা, আসাম, পূর্ব হিমালয় ও উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বায়ু দার্জিলিং-সিকিম হিমালয় এবং গারো খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ী অঞ্চলে ঘণীভূত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সূচনা করে। মেঘালয়ের মৌসিনরাম পৃথিবীর আর্দ্রতম অঞ্চল। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 1000 সেমি। মৌসিনরাম খাসি পাহাড়ের প্রতিবাত পাশে অবস্থিত। প্রচুর জলীয় বাষ্পপূর্ণ এই বায়ু খাসি পাহাড়ে বাধা পেয়ে হঠাৎ প্রায় 1200 মিটার উপরে উঠে যায় এবং ঘনীভবনের ফলে মেঘ সৃষ্টি হয়ে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

শিলং শহর পাহাড়ের অনুবাত পাশে অবস্থিত বলে কম বৃষ্টিপাত হয়। শিলং-এর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র 230 সেমি। একই কারণে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর ভাগ অপেক্ষা দক্ষিণ ভাগ কম বৃষ্টিপাত পায়। এই বায়ুপ্রবাহ হিমালয়কে অতিক্রম করতে না পেরে হিমালয়ে প্রতিহত হয়ে দুটি অংশে বিভক্ত হয়। একটি অংশ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ও উত্তরপূর্ব পার্বত্য রাজ্যগুলিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং অপর অংশটি পশ্চিম দিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও হিমালয়ের পাদদেশে বৃষ্টিদান করতে করতে ক্রমশঃ পশ্চিমে অগ্রসর হয়। এই বায়ুপ্রবাহ যতই পশ্চিমে অগ্রসর হয় ততই তার জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে, সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমানও। কলকাতায় বছরে গড়ে 150 সেমি, পাটনায় 112.5 সেমি., এলাহাবাদে 107.5 সেমি ও দিল্লীতে 67.5 সেমি. বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

৪। **শরৎকাল (অক্টোবর-নভেম্বর) ঃ** উত্তর ভারতের নিম্নচাপ বলয়টি ক্রমশঃ দক্ষিণে সরতে সরতে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে চলে এলে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উত্তর ভারত থেকে প্রত্যাগমন করে। তাই এই বায়ুপ্রবাহকে প্রত্যাবর্তনকারী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু (Retreating south-west moonsoon) বলে। এই প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় খানিকটা জলীয়বাষ্প ধারন করে। ঐ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু উপকূলে পৌঁছালে সেখানে পূর্বঘাট পর্বতমালার পাদদেশে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ কারণে বলা হয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু উপকূল অঞ্চলে বছরে দুবার বর্ষা হয়। পালঘাট ফাঁকা (gap) দিয়ে প্রবাহিত প্রত্যাবর্তনকারী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেরলের উত্তরভাগে বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে বলতে গেলে কেরলে প্রায় সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয়। প্রায় আটমাস ধরে দঃ পঃ মৌসুমী বায়ু কেরলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। কেরলের

---

*মেঘ সৃষ্টির রহস্য বাঙ্গালী কবি হেঁয়ালী ছলে বর্ণনা করেছেন—

> বসুধা ও জলধির দুহিতা যে আমি,
> আকাশ আমারে সদা করেছে লালন,
> রূপ ত্যাজি ভিন্ন রূপে ফিরে যাই তবু,
> মরণ কাহারে বলে জানে না এ মন"

বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 300 সে.মি.। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দঃ পঃ মৌসুমীবায়ু এদেশ থেকে সরে যায়। এই সময় কখনও কখনও উত্তর-পশ্চিম ভারতের উচ্চচাপ বলয়ের বায়ুর সঙ্গে দঃ পঃ মৌসুমী বায়ুর সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে যে ঘূর্ণিবাতের সৃষ্টি হয় তাকে 'আশ্বিনের ঝড়' বলে। এই ঘূর্ণিবাত ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর এসে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

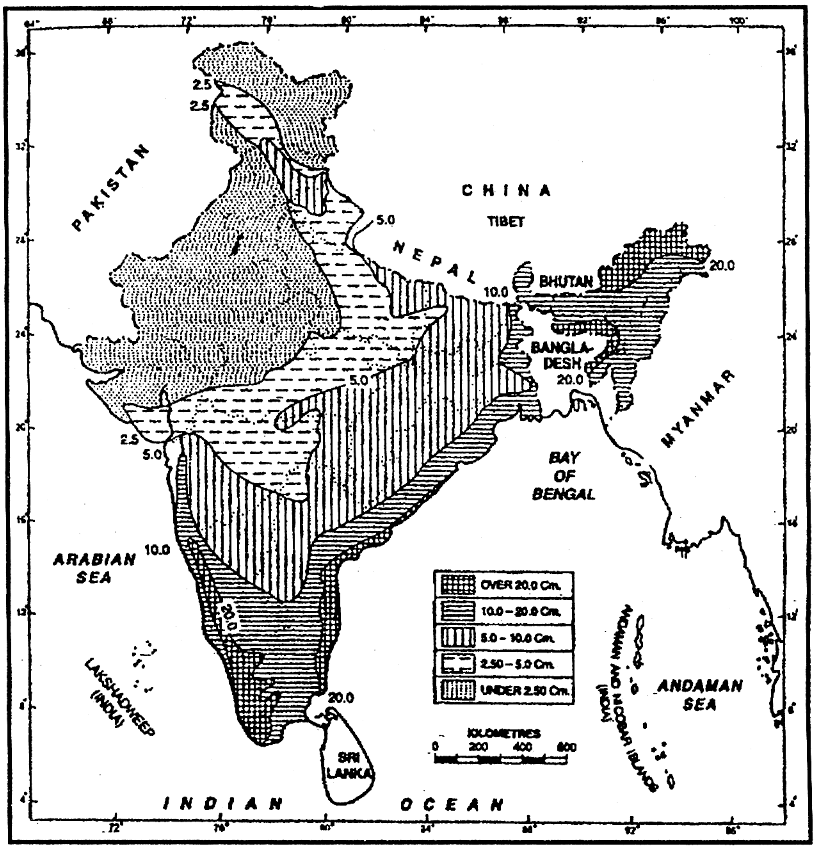

চিত্র 3.23 ঃ ভারতের অক্টোবরের বৃষ্টিপাত

❑ মৌসুমী বায়ু ও তার বৈশিষ্ট্য (Monsoon and Its Characteristics) ঃ

ভারত যেমন একটি বিশাল দেশ, তেমনি এর জলবায়ুও বিচিত্র ধরনের। ভারতের পূর্বদিকে আসাম ও মেঘালয়ের মত অতিবৃষ্টিপাত এবং পশ্চিমে রাজস্থানের মত শুষ্কতা যেমন রয়েছে, তেমনই পাঞ্জাব সমভূমির চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর সাথে দেখতে পাওয়া যায় কেরালা উপকূলের ক্রান্তীয় আর্দ্র সামুদ্রিক সমভাবাপন্ন জলবায়ু। বস্তুতঃ ভারতের ন্যায় আয়তন বিশিষ্ট পৃথিবীর অন্য কোন দেশে জলবায়ুর এই বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না।

ভারত উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তিরেখা এর প্রায় মধ্যস্থল দিয়ে অতিক্রম করায় এই রেখার দক্ষিণে অবস্থিত ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলের অধিকাংশ উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলের এবং উত্তরে অবস্থিত উত্তর ভারতের সমভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল উপক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। উপদ্বীপের আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজের মত এবং

তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় ভারতের জলবায়ু অনেকক্ষেত্রে সমুদ্রবায়ুর প্রভাবধান। উত্তরে হিমালয় পর্বতের অবস্থান মধ্য এশিয়া থেকে আগত কনকনে শীতল বাতাসকে যেরূপ ভারতে প্রবেশ করতে বাধাদান করে তেমনি দক্ষিণ পশ্চিম থেকে আগত জলীয় বাস্পপূর্ণ মৌসুমী বায়ু গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে এসে হিমালয়ে বাধা পায় ও প্রচুর শৈলেৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটায়। আবার শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু মধ্য এশিয়া থেকে আসায় এটি শুষ্ক হয় এবং এতে বৃষ্টিপাত হয় না। সুতরাং সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, ভরতের জলবায়ু **দক্ষিণ পশ্চিম বা গ্রীষ্মকালীন এবং উত্তরপূর্ব বা শীতকালীন** এই দুই মৌসুমী বায়ুর দ্বারাই অধিক প্রভাবান্বিত, এইজন্য ভারতকে মৌসুমী বায়ুর দেশ বলা হয়।

ভারত মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত একটি দেশ। এই দেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী প্রকৃতির। এই জলবায়ুর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ।

1. **আর্দ্র উষ্ম গ্রীষ্মকাল ঃ** ভারতের গ্রীষ্মকালে সূর্যের আপাতগতির ফলে মার্চের মাঝামাঝি দক্ষিণ ভারতে গরমকাল আরম্ভ হয়, অবশ্য উত্তর ভারতে ঐসময় আবহাওয়া আরামদায়ক থাকে। মে মাসে সর্বত্র প্রচণ্ড গরম পড়ে। সামান্য কালবৈশাখী এবং আম্রবৃষ্টি (mango shower) দ্বারা এই সময় উত্তাপ সাময়িকভাবে কিছু কমে। রাজস্থানে সর্বোচ্চ 48^0 সে, মধ্যপ্রদেশে 45^0 সে., এমনকি কলকাতায় 42^0 সে. উত্তাপ হয়। উত্তর ভারতে এই সময় খরা ও উত্তাপে হাহাকার দেখা দেয়।

2. **শুষ্ক শীতল শীতকাল ঃ** এই সময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করে। সমগ্র ভারতে উত্তাপের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়। জানুয়ারীর প্রথমার্ধে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে উত্তাপের পরিমাণ যখন সর্বনিম্ন হয় তখনই শীতকালীন উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ু ভারতের স্থলভাগ ও জলভাগের ওপর তার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই সময় পাঞ্জাবের কাছে অত্যধিক শীতের ফলে বায়ুর উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে শুষ্ক শীতল বায়ু দক্ষিণে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্য দিয়ে ধাবিত হয়ে থাকে। এই বায়ু শীতল ও স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এতে জলীয়বাষ্প থাকে না, ফলে বৃষ্টিপাত হয় না।

3. **বৃষ্টিপাতের বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্যতা ঃ** সমগ্র ভারতে বৃষ্টিপাত একটানা হয় না। চাপবলয়ের স্থান পরিবর্তনের ফলে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাতের সাময়িক বিরতি লক্ষ্য করা যায়, যা এখানকার গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য। বৃষ্টিপাতের এই সাময়িক বিরতি কৃষিকাজের পক্ষেও যথেষ্ট উপযোগী। এই দেশে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

1. **বৈষম্য ঃ** বৈষম্য ভারতীয় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপদ্বীপীয় ভারত ও উত্তর পশ্চিম ভারতে বিভিন্ন বছর স্বাভাবিক বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের শতকরা 20 থেকে 30 ভাগ কম বা বেশী হয়। যে বছর বৃষ্টি কম হয়, সে বছর ঐ অঞ্চলের চাষের কাজ ব্যাহত হয়।

(a) **অধিক বৈষম্য ঃ** মহাদেশীয় ভারতের পশ্চিমভাগে স্বাভাবিক বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের শতকরা 30 ভাগ বেশী বা কম বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এই বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে কোন বছর কম বৃষ্টিপাত হলে জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি হয়। অবশ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়লে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনে আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য আসে।

(b) **অল্প বৈষম্য ঃ** অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল যথা উত্তরপূর্ব ভারত ও পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের শতকরা 15 ভাগের কম হারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ে বা কমে। ঐ হারে বৃষ্টিপাত কমলে জনজীবন ও চাষের কাজে তেমন কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে বছর ঐ হারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ে সে বছর ঐ অঞ্চলের নিম্নভূমিগুলি জলে প্লাবিত হয়ে চাষবাসের ক্ষতি করে এবং জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।

(ii) **বিলম্বিত মৌসুমী বৃষ্টিপাত ঃ** সাধারণভাবে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের আগমন বিলম্বিত হয় এবং এর প্রত্যাবর্তনও স্বাভাবিক সময়ের আগে ঘটে। এর ফলে খারিফ শস্য ও রবিশস্য উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(iii) **অঞ্চল বিশেষে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের প্রাদুর্ভাবের স্থায়িত্ব ঃ** কখনও কখনও মৌসুমী বৃষ্টিপাত কোন কোন অঞ্চলে বছরের পর বছর এমনভাবে ঘটে যে তা অঞ্চল বিশেষে প্লাবন বা খরার উদ্ভব ঘটায়।

(iv) **মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অসম বণ্টন ঃ** মৌসুমী বৃষ্টিপাত সুষমভাবে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তারলাভ করে না।

(v) **বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের প্রাদুর্ভাব ঃ** দেশের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা 74 ভাগ জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই চার মাসে ঘটে। বী অংশের শতকরা 13 ভাগ উত্তর মৌসুমী সময়ে, শতকরা 3 ভাগ শীতকালীন মৌসুমী সময়ে এবং শতকরা 10 ভাগ প্রাক্ মৌসুমী সময়ে ঘটে। 2 থেকে 4 মাস মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময়সীমা। এই সময়সীমার পরিবর্তন হলে কৃষিকাজ ব্যাহত হয় এবং এই অনিয়ম বহু লোকের অশেষ দুঃখই বহন করে আনে।

4. **বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব ঃ** এদেশে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রধানতঃ ভূপ্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ মৌসুমীবায়ু মালভূমি ও পর্বতের গায়ে প্রতিহত হয়ে যেখানে যেভাবে ঘনীভূত হয়, সেখানে সেইভাবে বৃষ্টিদান করে। ভারতের আকার উপদ্বৈপ হওয়ায় দু'পাশের সাগরের প্রভাব দেশের ওপরে যথেষ্ট পড়ে।

5. **দুই মৌসুমী বায়ুর বিপরীতমুখী প্রবাহ ঃ** গ্রীষ্মকালীন আদ্র-মৌসুমী বায়ু যেদিক থেকে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়, শীতকালীন শুষ্ক মৌসুমী বায়ু ঠিক তার বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। প্রবাহের দিক অনুসারে গ্রীষ্ম কালীন আর্দ্র মৌসুমী বায়ুকে **দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু** এবং শীতকালীন শুষ্ক মৌসুমী বায়ুকে উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু বলা হয়। জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হিমালয় পর্বতে বাধা পেয়ে প্রচুর শৈলেৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটায়। আবার শুষ্ক শীতল উত্তর পূর্ব মৌসুমীবায়ু জলীয়বাষ্প পূর্ণ না হওয়ায় এতে পৃষ্টিপাত হয় না।

6. **ঝড়-বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব ঃ** বিপরীতগামী দুই মৌসুমী বায়ু যথা গ্রীষ্মকালীন দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ এবং শীতকালীন উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের পরস্পরের সংঘাতে এদেশে শীতও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কিছু ছড় বৃষ্টি হয়।

❑ ভারতের জলবায়ু অঞ্চল ঃ

অধ্যাপক কেনড্রু (Kendrew) ও ডঃ এল. ডি. স্ট্যাম্প (L. Dedley Stamp) ভারতের জলবায়ুর আঞ্চলিক বৈচিত্র্য অনুযায়ী ভারতকে কয়েকটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ রেছেন। ডাড্লী স্ট্যাম্প (L. Dudley Stamp) জানুয়ারী মাসের গড় –21^0 সে. (সমুদ্র পৃষ্ঠের উষ্ণতায় পরিবর্তিত) সমোষ্ণ রেখার সাহায্যে ভারতকে দুটি প্রধান জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। এই সমোষ্ণ রেখার দক্ষিণে উপদ্বীপ ভারত ও নিম্ন গঙ্গা সমভূমি **ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল** এবং ঐ রেখার উত্তরাংশ **মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল** হিসাবে চিহ্নিত করেন। ভারতের জলবায়ু অঞ্চল সম্পর্কে ডাড্লী স্ট্যাম্পের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

Koppen এবং Thornthwaite কয়েকটি সূচরে ভিত্তিতে ভারতের জলবায়ু অঞ্চল নির্দেশ করতে সচেষ্ট হন। Kopen-এর মতবাদ অনেকটা গ্রহণযোগ্য।

কোপেন প্রধানতঃ স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ভারতকে কয়েকটী জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করে। যেহেতু জলবায়ু স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতির নির্ধারন করে তাই স্বাভাবিক উদ্ভিদের আঞ্চলিক বণ্টন অনুধাবন করে তিনি ভারতকে নিম্নলিখিত 8 টি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেন।

১। **অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল** (Amw) ক্রান্তীয় অতি আর্দ্র মৌসুমী অঞ্চল নামে পরিচিত। চিরহরিৎ অরণ্যময়

ভারতে দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল অঞ্চল নিয়ে এটি গঠিত। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 300 সেমি। সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয়। উষ্ণতা সমভাবাপন্ন, অতি স্বল্প সময়ের জন্য এখানে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে।

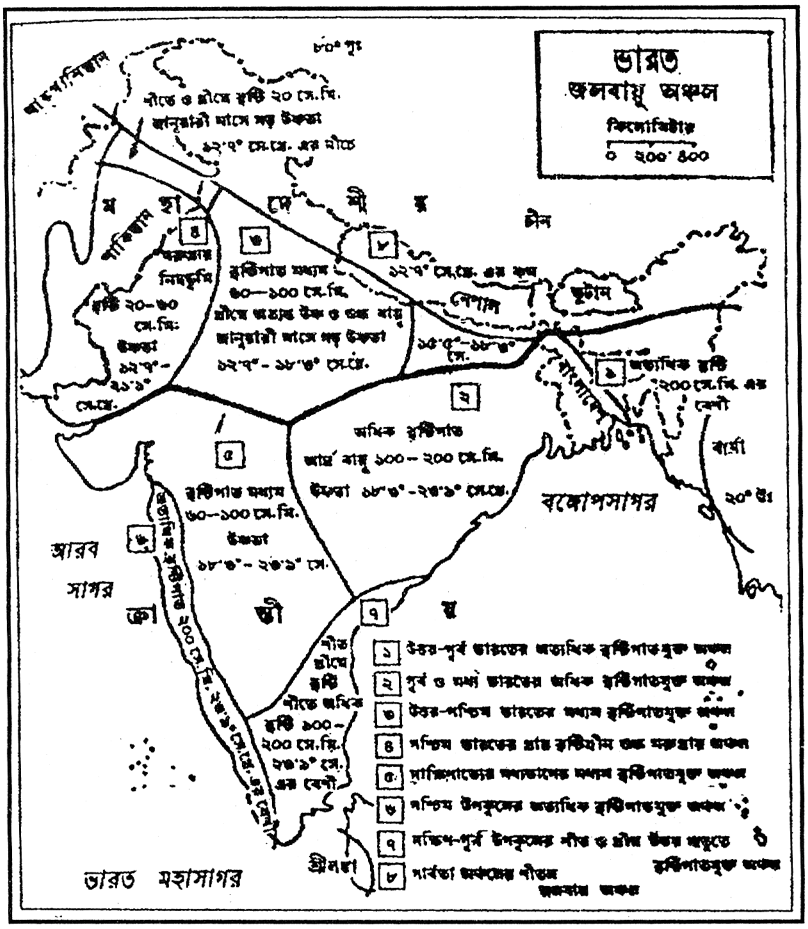

চিত্র 3.24 ঃ Kendrew ও Stamp-র মতানুসারে ভারতের জলবায়ু অঞ্চল

২। **ক্রান্তীয় সাভানা অঞ্চল** (Aw) ঃ এই অঞ্চলে পাতাঝরা গাছের অরণ্য ও সাভানা জাতীয় স্বাভাবিক উদ্ভিদ সংস্থান দেকা যায়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্য ও দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশ, ওড়িষা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিম তামিলনাড়ু দক্ষিণ বিহার, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ভাগ ও কর্ণাটকের কোন কোন অংশ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। গ্রীষ্মকালে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বেশি থাকে; এমনকি রাতেও উষ্ণতা কমে না। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহ বৃষ্টিপাত ঘটায়। বৃষ্টিপাত সর্বত্র একই হারে হয় না। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 75–125 সেমি-র মধ্যে থাকে।

৩। **শীতকালীন বৃষ্টিপাত অঞ্চল** (As) ঃ করমণ্ডল উপকূলের দক্ষিণ ভাগ (অন্ধ্র উপকূলের দক্ষিণ ভাগ ও তামিলনাড়ু উপকূলের উত্তর ভাগ) নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলে ক্রান্তীয় শুষ্ক চিরহরিৎ গাছের প্রাধান্য দেখা যায়। এই অঞ্চলে বছরে দুবার বর্ষা হয়। প্রত্যাবর্তনকারী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের জন্য অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 75 সেমি. ও 100 সেমি.।

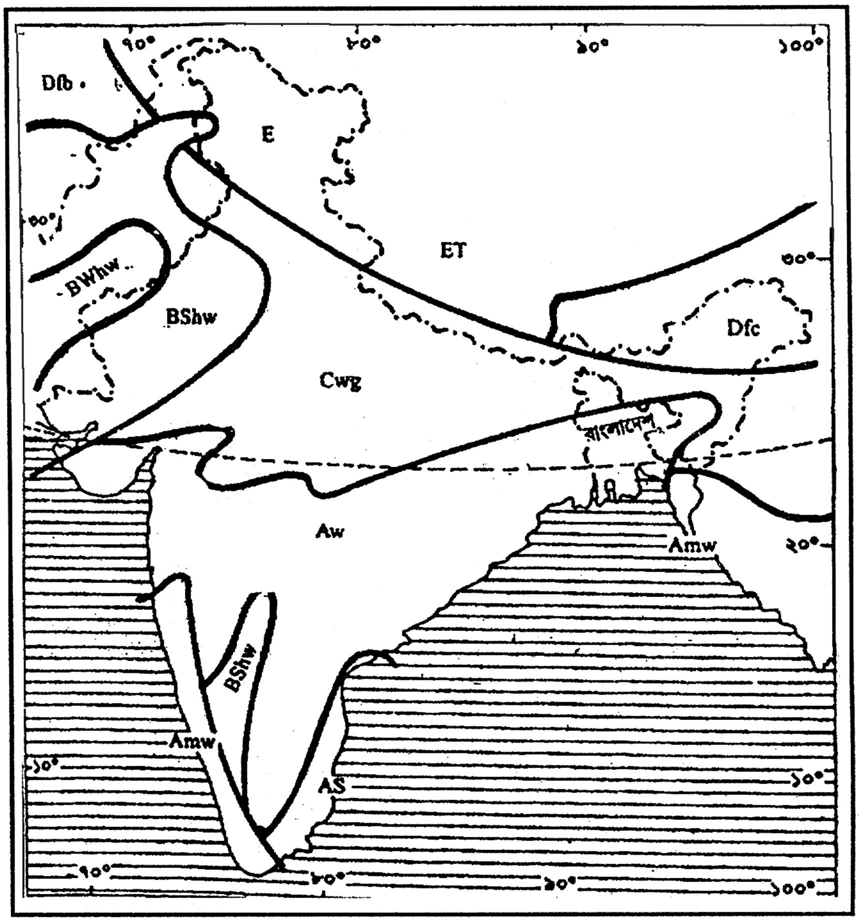

চিত্র 3.25 ঃ ভারতের জলবায়ু অঞ্চল (কোপেন-কৃত)

৪। **শুষ্ক প্রায় স্টেপস্ অঞ্চল** (BShw) ঃ এখানে কাঁটাযুক্ত ঝোপ ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। পশ্চিম রাজস্থানের রোহি ও বাগর অঞ্চল, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার দক্ষিণ ভাগ এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে এরূপ জলবায়ু বিরাজ করে। গ্রীষ্মকাল শুষ্ক এবং অতি সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। শীতকাল সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক। এখানকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান 12.5 – 25 সেমি.।

৫। **উষ্ম মরুভূমি** (BWhw) ঃ এই অঞ্চলে ক্যাকটাস বা ফনিমনসা জাতীয় কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ জন্মে। জলাভাব, অত্যধিক উষ্মতা ও শৈত্য, সহনশীল বিভিন্ন ধরনের মরু উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কোন উদ্ভিদ এখানে জন্মায় না। থর মরুভূমির অংশ যা রাজস্থানের পশ্চিম অংশে মরুস্থলী নামে পরিচিত তা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এটি একেবারেই শুষ্ক অঞ্চল। দৈনিক ও বার্ষিক উষ্মতার প্রসার অত্যন্ত বেশি। বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় 12.5 সেমিরও কম। অত্যাধিক বাষ্পীভবন এই অঞ্চলের জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬। **উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শীত আর্দ্র জলবায়ুকালীন অঞ্চল** (Dfc) ঃ অরুনাচল প্রদেশ ও আসামের উত্তর-পূর্ব ভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে গ্রীষ্মকাল ক্ষণস্থায়ী। শীতকাল আর্দ্র। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 300 সেমির বেশি।

৭। **আর্দ্র উপক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চল** (Cwg) ঃ এই অঞ্চলে পর্ণমোচী ও চিরহরিৎ গাছের বনভূমি বিদ্যমান। শতদ্রু-গঙ্গা সমভূমি এবং মালব মালভূমির অংশ বিশেষ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের জন্য জুলাই ও আগস্ট মাস নাগাদ প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পূর্বভাগ অপেক্ষা পশ্চিমভাগে ক্রমশঃ কম হয়ে থাকে। শুষ্ক উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হয় বলে শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। গ্রীষ্মকালে কোন কোন স্থানে কখনও কখনও উষ্ণতা 45^0 সেন্টিগ্রেডের বেশি হয়। শীতকালীন উষ্ণতা 27^0 সেন্টিগ্রেডের কম হয়।

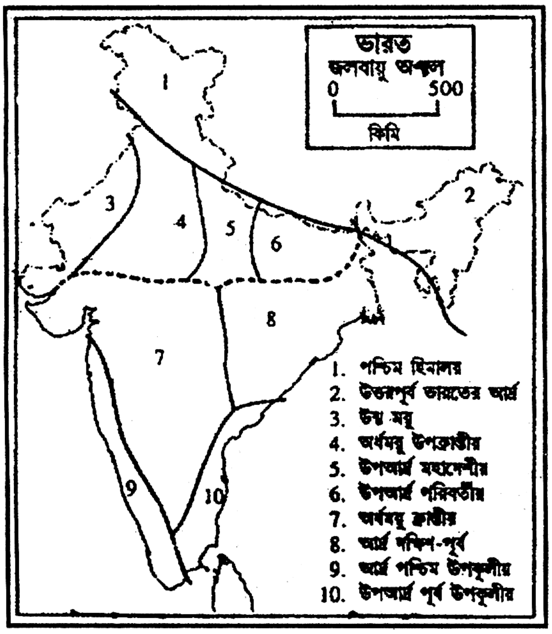

চিত্র 3.26 ঃ R. L. Singh-র শ্রেণীবিভাগ

৮। **পার্বত্য (হিমালয়ের) অঞ্চল** (E) ঃ এই অঞ্চলের হিমরেখা ও বৃক্ষ রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে তৃণ এবং তৃণভূমির নিচে সরলবর্গীয় গাছের বনভূমি বিদ্যমান। লাডাক, উত্তর কাশ্মীর ও উত্তর হিমাচল প্রদেশ এই জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে শীতকালে বরফ পড়ে। গরমকালের তাপমাত্রা 0^0 সে. থেকে 10^0 সে.-র মধ্যে ওঠানামা করে।

Prof R. L. Singh ও ভারতের জলবায়ুকে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। চিত্রে তাঁর শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল। আর্দ্রতা ও উষ্ণতার ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে যা অনেকটাই গ্রহণযোগ্য।

3.1.4 মৃত্তিকা (Soils)

❑ ভূমিকা

বিশাল আয়তন বিশিষ্ট দেশ ভারতবর্ষ ভূ-তত্ত্ব, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, জলবায়ু এবং স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈচিত্রময় নজির প্রদান করে বিশ্বের দরবারে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন স্থাপনের দাবীদার। উপরিউক্ত বিষয়াদি ছাড়াও ভারতবর্ষ মৃত্তিকার বিবিধ শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

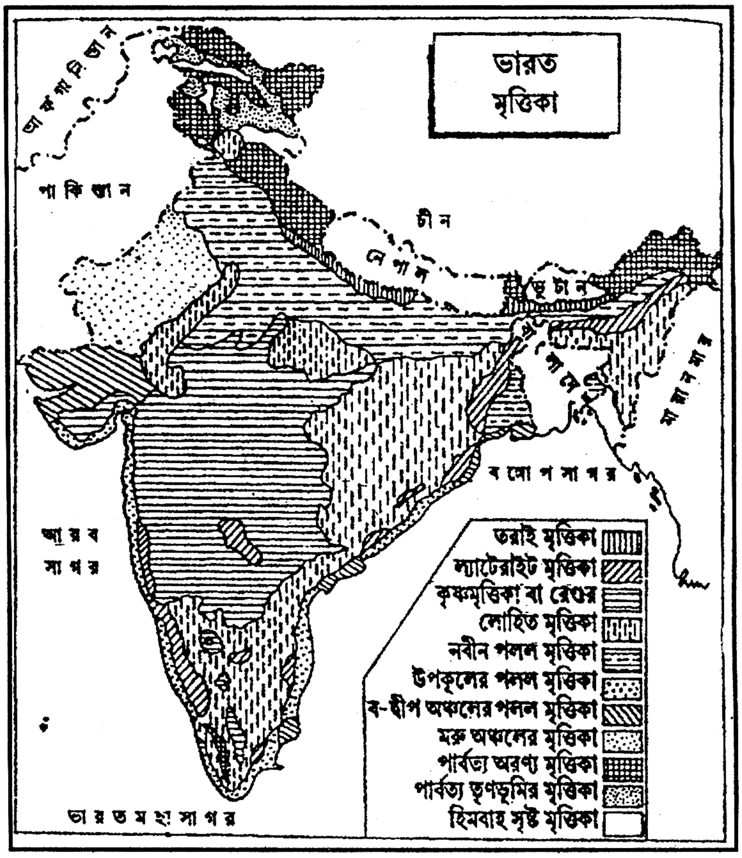

চিত্র 3.27 ঃ ভারতের মৃত্তিকা

ভূ-তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করে ভারতের মৃত্তিকাকে দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (1) উপদ্বীপীয় ভারতের মৃত্তিকা (Soils of Peninsular India) (2) উপদ্বীপীয় অঞ্চল-বহির্ভূত মৃত্তিকা (Soils of Extra-peninsular India)

যে সব মৃত্তিকা প্রাথমিক শিলাসমূহ অর্থাৎ Underlying rocks থেকে উৎপত্তিলাভ করে তাদের বলে উপদ্বীপীয় ভারতের মৃত্তিকা।

পক্ষান্তরে, যে সব মৃত্তিকা নদী এবং বায়ুপ্রবাহের সঞ্চয়ের ফলে উদ্ভূত হয় সেইসব মৃত্তিকা উপদ্বীপীয় অঞ্চল-বহির্ভূত মৃত্তিকা নামে পরিচিত।

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদ (Indian Council of Agricultural Research) 1953 সালে All India Soil Survey Committee গঠন করে এবং এই ভারতের Committee ভারতের মৃত্তিকাকে নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করে। যথা—

(i) পলি মৃত্তিকা (Alluvial Soil)
(ii) কৃষ্ম মৃত্তিকা (Black Soil)
(iii) লোহিত মৃত্তিকা (Red Soil)
(iv) ল্যাটারাইট মৃত্তিকা (Laterite & Lateritic Soil)
(v) অরণ্য ও পার্বত্য মৃত্তিকা (Forest and Mountain Soil)
(vi) লবণাক্ত ও ক্ষার মৃত্তিকা (Arid & Desert Soil)
(vii) শুষ্ক ও মরু মৃত্তিকা (Saline & Alkaline Soil)
(viii) পিট ও জলাভূমি মৃত্তিকা (Peaty & Marshy Soil)

(1) পলি মৃত্তিকা (Alluvial Soils) : ভারতের মৃত্তিকার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল পলিমাটি। ভারতে মোটামুটিভাবে 15 লক্ষ বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে রয়েছে এই মৃত্তিকা। কৃষি এবং জনবসতি এই মৃত্তিকাকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেছে। পলিমাটি বয়সে নবীন এবং দুর্বল পরিলেখ (Profile) বিশিষ্টহয়ে থাকে। রাসায়নিক মেলবন্ধন এই মৃত্তিকাকে পৃথিবীর অন্যতম উর্বর মৃত্তিকায় পরিণত করেছে। যদিও N_2-এর পরিমাণ কম তথাপি পটাশ, ফসফরিক অ্যাসিড, ক্ষারকীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে এই মৃত্তিকায় লক্ষ্য করা যায়। এই মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী থাকায় ফসল উৎপাদনের সহায়ক।

পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে শুরু করে পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের এক বিস্তুর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি জুড়ে পলি মৃত্তিকার বিস্তার লক্ষিত হয়। অবশ্য মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্মা, কাবেরী নদীর ব-দ্বীপেও পলিমাটি লক্ষ্য করা যায়। উপকূলবর্তী অঞ্চলে এই মৃত্তিকা **উপকূলীয় পলিমৃত্তিকা** নামে পরিচিত। উত্তর ভাগের গুজরাট রাজ্যেও এই মৃত্তিকা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া দক্ষিণে নর্মদা এবং তাপ্তী নদী উপত্যকাও এই মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত।

নবীন পলি 'খাদার' এবং পুরাতন পলি 'ভাঙর' নামে পরিচিত। খাদার অবশ্য উপত্যকার নিম্নাংশে লক্ষ্য করা যায় যা প্রতিবছরই প্লাবিত হয়। পক্ষান্তর 'ভাঙ্গর' প্লাবন সীমার প্রায় 30 মিটার ওপরে সঞ্চিত হয়। শিবালিক হিমালয়ের পাদদেশে পলল ব্যজনী লক্ষ করা যায় যেগুলো কাঁকরময় মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এই এলাকা 'ভাবর' নামে পরিচিত। এই ভাবর এলাকার বিস্তার প্রায় 56,000 বর্গ কিমি যা নীচের অংশে তরাই নামে চিহ্নিত। এই তরাই মৃত্তিকা গম, ধান, ইক্ষু, পাট, সোয়াবিন চাষের সহায়ক।

মৃত্তিকাস্তরের নমনীয়তা এবং উর্বরতার দরুণ সেচকার্য এবং কূপ ও নলকূপ থেকে জলসেচের পক্ষে এই মৃত্তিকা সহায়ক। এই মৃত্তিকা এবং প্রকৃত জলসেচের উপস্থিতিতে ধান, গম, ইক্ষু, তামাক, তুলা, পাট, ভুট্টা তৈলবীজ, ফল, শাকসজি, অধিক পরিমাণে জন্মায়।

(2) কৃষ্ম মৃত্তিকা (Black Soil) : তেলেগু শব্দ 'রেগুরা' থেকে রেগুর শব্দটির উৎপত্তি। এই মৃত্তিকা তুলা চাষের পক্ষে উপযোগী। অধিকাংশ মৃত্তিকা বিজ্ঞানীর মতে হাজার হাজার বছর আগে দাক্ষিণাত্য মালভূমির দুর্বল অংশের মধ্য দিয়ে উৎক্ষিপ্ত লাভ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জমা হয় এবং কালক্রমে শীতল হয়ে কৃষ্ম মৃত্তিকায় পরিণত হয়। অধিকাংশ কৃষ্ম মৃত্তিকা দু'ধরনের শিলা থেকে তৈরী হয়েছে। দাক্ষিণাত্য এবং রাজমহল অংশের শিলা এবং স্তরে স্তর বিন্যস্ত শিলা যা তামিলনাডুতে পাওয়া যায়।

Krebs-এর মতানুসারে যেখানে বার্ষিক বৃষ্টি পাতের পরিমাণ 50-80 সেমি সেখানে রেগুর মৃত্তিকার প্রাধান্য

বিদ্যমান। তবে তাঁর মতে একমাত্র ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিমাংশ যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 100 সেমি।

15^0 উঃ — 25^0 উঃ অক্ষাংশের মধ্যে 72^0 পূঃ — 82^0 পূঃ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এই কৃষ্ম মৃত্তিকা লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের বিস্তার প্রায় 5.46 লক্ষ মর্গ কিমি। কৃষ্ম মৃত্তিকা উচ্চ উষ্মতাবিশিষ্ট এবং কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সৃষ্টি হয়। মহারাষ্ট্র, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটকের কিছু অংশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট এবং তামিলনাড়ুতে এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

কৃষ্ম মৃত্তিকার জল ধারণক্ষম। বর্ষাকালে যখন এই মৃত্তিকা ভিজে যায় তখন তা আঠালো হয়ে পড়ে। এর ফলে লাঙ্গল মাটিতে আটকে যায়, ফলে কৃষিকাজ অসম্ভব হয়ে যায়। কিন্তু শুখা মরসুমে জল বাষ্পীভূত হয়ে যায়। ফলে মাটি তথা জমি ফুটোফাটা ও ফাটলযুক্ত হয়ে পড়ে।

কৃষ্ম মৃত্তিকায় 10 শতাংশ অ্যালুমিনা, 9–10 শতাংশ আয়রণ অক্সাইড, 6–8 শতাংশ ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট থাকে। এই মাটিতে পটাশ, ফসফেট, নাইট্রোজেন এবং হিউমাসের পরিমাণ কম।

জলের ধারণক্ষমতা, অত্যধিক উর্বরতার নিরিখে কৃষ্ম মৃত্তিকা বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদনের উপযোগী। এই মৃত্তিকায় তুলা, গম, জোয়ার, তামাক, সূর্যমুখী, মিলেট উৎপাদিত হয়। সেচকার্যের সুবিধাযুক্ত অঞ্চলে ধান ও ইক্ষু চাষ হয়।

(3) লোহিত মৃত্তিকা (Red Soil) : অধিক পরিমাণে লৌহের উপস্থিতির জন্য এই মৃত্তিকা লাল বর্ণ বিশিষ্ট। এই মৃত্তিকা অঞ্চলের বিস্তার প্রায় 3.5 লক্ষ বর্গকিমি। তামিলনাড়ু কর্ণাটকের কিছু অংশ, মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বাংশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা এবং ছোটনাগপুরে এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

এই মৃত্তিকা, কম ম্যাগনেসিয়াম, ফসফেট, নাইট্রোজেন এবং হিউমাসযুক্ত কিন্তু পটাশের পরিমাণ অধিক।

লোহিত মৃত্তিকায় সেচকার্য এবং সারপ্রয়োগ করা হয়। তুলো, গম, ধান, জল, মিলেট, তামাক, তৈলবীজ, আলু এবং ফলমূল এই মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয়।

(4) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা (Laterite and Lateritic Soil) : ল্যাটিন later শব্দ যার অর্থ ইট তা থেকে Laterite শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। 1810 সালে সর্বপ্রথম Buchanan মালাবারের কোন একটি কাদাপাথরকে এই নামে চিহ্নিত করেন। অধিকাংশের মতে পর্যায়ক্রমে উচ্চ উষ্মতা তথা অধিক বৃষ্টিপাত এবং শুকনো পরিস্থিতিতে এই মৃত্তিকা জন্মায়। Polynov-এর মতে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা হল—'the end products of weathering given sufficiently long time.'

ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা যায়। যেমন— এই মৃত্তিকার একপ্রান্ত বক্সাইট এবং অন্যপ্রান্তে ফেরিক অক্সাইডের মিশ্রণ দেখা যায়। অধিকাংশ ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় ম্যাগনেশিয়াম কম থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই মৃত্তিকা প্রবল হিউমাস সমৃদ্ধ হয়।

এই মৃত্তিকা ভারতের প্রায় 2.48 লক্ষ বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। পশ্চিমঘাট পর্বতের শিখরে সমুদ্র সমতল থেকে 1000-500 মি. উচ্চতায় এই মৃত্তিকা দেখা যায়। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, বিহার, আসাম এবং মেঘালয়ে এই মৃত্তিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই মৃত্তিকা, অতিরিক্ত উর্বর হয় না। ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হয় না। কিন্তু প্রয়োজনমতো সেচ এবং সার প্রয়োগের ফলে এই মাটিতে বাগিচা ফসল যেমন— চা, কফি, রবার, সিঙ্কোনা, নারকেল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় বাসস্থান নির্মাণের উপযোগী পদার্থ পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকা কোদালের সাহায্যে কাটা যায়। বাতাসে উন্মুক্ত হলে ল্যাটারাইট লোহার মতো শক্ত হয়ে যায়।

(5) অরণ্য ও পার্বত্য মৃত্তিকা (Forest and Mountain Soils) : পার্বত্য ঢাল বা ধাপ যা সাধারণতঃ

বনভূমি দ্বারা আচ্ছন্ন সেখানে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। এই প্রকার মৃত্তিকা 2.85 লক্ষ বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জনয যে সব জৈবিক পদার্থ প্রয়োজন তার ওপর ভিত্তি করে এই মৃত্তিকার জন্ম হয়। এই মৃত্তিকা চরিত্রগত দিক থেকে অসমসত্ব এবং এই মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য জলবায়ু, আদি শিলার পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল।

হিমালয় অঞ্চলে উপত্যকার ঢালে, খাতে এই মৃত্তিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় এবং উপদ্বীপীয় ভারতের কিছু অংশে এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

এই মৃত্তিকা হিউমাস সমৃদ্ধ হয়। তাছাড়া ফসফরাস, পটাশ প্রভৃতি পরিমাণ মত বিদ্যমান। তাই বেশী উৎপাদনের জন্য কম সারপ্রয়োগ করতে হয়। চা, কফি, মশলা প্রভৃতি ক্রান্তীয় অঞ্চলের উৎপাদিত ফসল এই মৃত্তিকায় ভালো হয়।

(6) শুষ্ক ও মরু মৃত্তিকা (Arid and Desert Soil) : বার্ষিক 50 সেমি-র কম বৃষ্টিপাতযুক্ত রাজস্থান এবং সংলগ্ন অঞ্চল যেমন পাঞ্জাব, হরিয়ানার কিছু অংশে (যা সিন্ধু এবং আরাবল্লী অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সেখানে) এই মৃত্তিকা বর্তমান। এই প্রকার মৃত্তিকা অঞ্চলের বিস্তার প্রায় 1.42 লক্ষ বর্গ কিমি। গুজরাট রাজ্যের কচ্ছের রান এই অঞ্চলেরই বর্ধিত অংশ। প্রাচীন শিলার ক্ষয়ীভবনের ফলে অথবা সিন্ধু উপত্যকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে এই মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে।

এই প্রকার মৃত্তিকা 90–95 শতাংশ বায়ুবাহিত বালুকা এবং 5–10 কাদা দ্বারা গঠিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মৃত্তিকা দ্রবীভূত লবণ, ক্যালসিয়াম-কার্বোনেট দ্বারা গঠিত। কিন্তু নাইট্রেট এবং ফসফেট-এর উপস্থিতি এই মৃত্তিকাকে উর্বর করেছে। Indira Gandhi Canal Command Area এই প্রকার মৃত্তিকার খরা নিরোধক এবং লবণ সহ্যকারী ফসল যেমন— বার্লি, তুলা, গম, মিলেট, ভুট্টা এবং ডাল জন্মায়।

(7) লবণাক্ত ও ক্ষার মৃত্তিকা (Saline and Alkaline Soils) : বিহার, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রের শুষ্ক অংশে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। প্রায় 68,000 বর্গ কিমি. অঞ্চল এই মৃত্তিকার অন্তর্গত। এই মৃত্তিকা কালার, উষার, ক্ষার, কাকর, চোপান ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

বিভিন্ন লবণাক্ত পদার্থ যেমন— সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি এই মৃত্তিকাকে অনুর্বর করে তুলেছে। গুজরাট রাজ্যের খাম্বাত উপসাগর সমুদ্রের লবণাক্ত জলে দ্বারা পরিপূর্ণ। নর্মদা, তাপ্তী, মাহী, সবরমতী প্রভৃতি নদীসমূহের খাড়িগুলো এই মৃত্তিকার উপস্থিতির জন্য অনুর্বর হয়ে পড়েছে।

(8) পিট ও জলাভূমি মৃত্তিকা (Peaty and Marshy soils) : মাটিতে অতিরিক্ত জৈবিক পদার্থের উপস্থিতির দরুণ আর্দ্র অঞ্চলে পচা উদ্ভিজ্জ পদার্থ সমন্বিত মৃত্তিকা দেখা যায়। কেরালার কোট্টায়ামে এবং আলাকুজা জেলায় এই মৃত্তিকা দেখা যায় যা কারি 'Kari' নামে পরিচিত।

এই প্রকার মৃত্তিকা কালো, আম্লিক হয়ে থাকে। পটাশ এবং ফসফেটের পরিমাণ কম থাকে। বর্ষাকালে অতিবাহিত হবার সাথে সাথে এই মৃত্তিকা ধান চাষে ব্যবহৃত হয়।

❑ মৃত্তিকা ক্ষয় এবং সংরক্ষণ (Soil erosion and conservation) ঃ

আমরা আগেই জেনেছি যে মৃত্তিকা পরিবেশজাত একটি বস্তু। বহু জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় এই মৃত্তিকার। আদি শিলা আবহবিকার ফলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে জৈব পদার্থের মিশ্রণে সৃষ্টি করে মৃত্তিকার।

এই মৃত্তিকার সৃষ্টি যেমন প্রকৃতি-নির্ভর, তেমনি প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি যেমন বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, সমুদ্রতরঙ্গ প্রভৃতির প্রভাবে ভূমিভাগের অতি প্রয়োজনীয় মৃত্তিকার অংশবিশেষ অপসারিত হচ্ছে যাকে মৃত্তিকা ক্ষয় বলে।

❑ মৃত্তিকা ক্ষয়ের মাধ্যমসমূহ (Agencies of Soil Erosion) ঃ

মৃত্তিকা ক্ষয়ের প্রধান দুটি মাধ্যম হলো ঃ জল (water) এবং বাতাস (wind)

(A) জল দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয়ের কারণসমূহ (Factors of Soil erosion by water)

বৃষ্টিপাত (Rainfall) : জল মৃত্তিকা ক্ষয়ের একটি প্রধান মাধ্যম এবং ভূমিভাগের ওপর এই জলের প্রধান উৎস হলো বৃষ্টিপাত। বৃষ্টির জল ভূমিভাগের ওপর পড়লে মাটির ওপর যে সমস্ত খনিজ পদার্থ থাকে তা জল দ্বারা বাহিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে চলে যায় বা পরিবাহিত হয়ে অন্যত্র নীত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কারণ বৃষ্টির বেগ বেশি হলে তা ভূমির ওপর জোরে আঘাত হানে। ফলে মৃত্তিকাকণাগুলি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যায় বা জল দ্বারা বাহিত হয়। আবার বেগবান জলধারাও মাটি কেটে নিজের পথ করে নেয়। এর ফলেও ভূমিক্ষয় হয়। ভূমিক্ষয়ের ওপর বৃষ্টিপাতের প্রভাবকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি নিম্নরূপ—

(1) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (Amount of Rainfall) : বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে জলের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্ষয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি ঘটে। আবার শীতপ্রধান দেশে তুষারপাত যতক্ষণ পর্যন্ত না জলাধারায় পরিবর্তিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তুষারপাত ভূমিক্ষয়ে সেই ভাবে অংশ গ্রহণ করে না।

(2) বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্ব (Duration of Rainfall) : ধীরে ধীরে সমস্ত দিন ধরে বৃষ্টিপাতের চেয়ে অতি অল্প সময়ে মুষলধারে বৃষ্টিপাত অত্যধিক পরিমাণে মৃত্তিকা ক্ষয় ঘটায়। কারণ মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে জল দ্রুত বেগে ভূমির ঢাল অনুসারে গড়িয়ে যাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে মাটি অপসারিত করে বয়ে নিয়ে যায়।

(3) বৃষ্টির ফোঁটার আকার ও গতিবেগ (Size of the rain drops and its motion) : বৃষ্টির ফোঁটার আকার যদি বড় হয় এবং গতিবেগও যদি বেশী থাকে, তবে সহজেই মৃত্তিকা স্থানচ্যুত হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা সহজেই স্থানান্তরিত হয়। এই জল দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ওপর যে সকল ক্ষয়সাধন ঘটে থাকে, তাকে সাধারণভাবে সাত ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(i) **কর্দমাক্ত ক্ষয় (Splash erosion) :** বৃষ্টির কণাগুলি অতি দ্রুতগতিতে মৃত্তিকার ওপর পড়ার ফলে মাটির কণাগুলি আলগা হয়ে পড়ে এবং এর আঘাতে মৃত্তিকা কণা ও জলের মিশ্রণ কিছুটা দূরে ছিটকে পড়ে। এভাবে বৃষ্টির ফোঁটা মৃত্তিকার সংযুক্তিকে ভেঙ্গে দেয়। বৃষ্টিপাত দীর্ঘস্থায়ী হলে ধীরে ধীরে ঐ কণাগুলি বৃষ্টির জলের সঙ্গে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে মৃত্তিকা ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে।

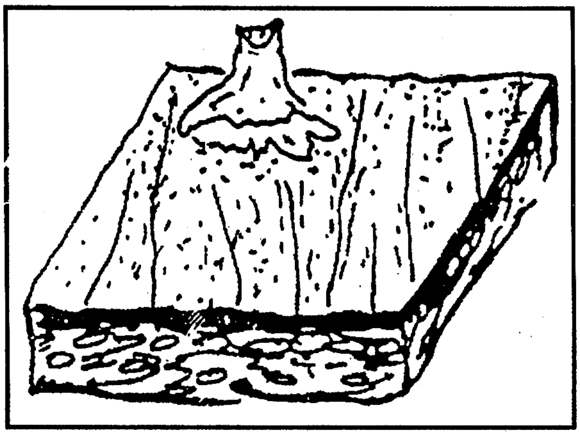

চিত্র 3.28 ঃ পাতক্ষয়

(ii) **পাতক্ষয় (Sheet erosion) :** বৃষ্টির জলের প্রবাহের ফলে মৃত্তিকার শীর্ষভাগের পাতলা আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বাহিত হয়। চাদরের মতো চারিদিক হতে প্রায় সমান পরিমাণ জল বয়ে যাওয়ার ফলে ভূমিভাগের অনেক পরিমাণ খনিজ পদার্থ ধৌত হয়ে যায়। এরূপ ক্ষয়কে পাতক্ষয় বলে। এই ধরণের ক্ষয়ের ফলে মৃত্তিকার গুরুত্ব ক্রমশ কমতে থাকে।

(iii) **নালী ক্ষয় (Rill erosion) :** হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে প্রধানত শুষ্ক অঞ্চলে সামান্য উঁচু এবং ঢালযুক্ত ভূমিভাগে তীব্র জলস্রোতের প্রভাবে অসংখ্য নালীর সৃষ্টি হয়। নালীর মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহ

চলার ফলে নালীর উভয় পাশ্বের মৃত্তিকা বেশি পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। এরূপ ক্ষয়কে বলে নালী ক্ষয়।

(iv) **প্রণালী ক্ষয় (Gully erosion) :** নালী ক্ষয় ধীরে ধীরে বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে প্রশস্ত হয়ে যে ভূমিক্ষয় হয় তাকে বলে প্রণালী ক্ষয়। যে সব স্থানের মৃত্তিকা নরম, সেখানে জল প্রবাহের দ্বারা এরূপ ক্ষয়ের পরিমাণও অধিক হয়। যে সকল অঞ্চলে নালী ও প্রণালীর মধ্য দিয়ে অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা ক্ষয় হয়, সে সব অঞ্চলকে ভৌগোলিক ভাষায় বলে বদভূমি বা ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি (Badland)। চম্বলের বেহেড় অঞ্চল কিংবা শান্তিনিকেতন লাগোয়া "খোয়াই" এইভাবে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

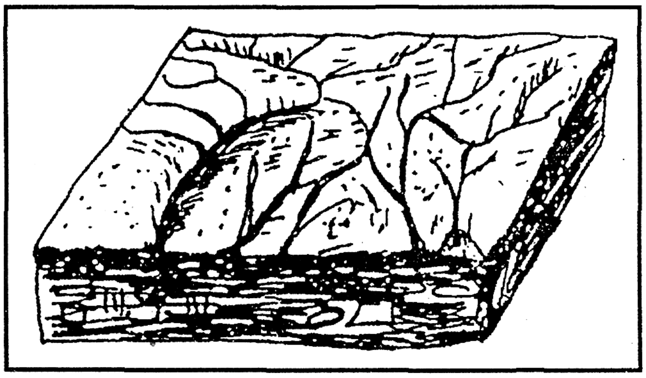

চিত্র 3.29 ঃ নালীক্ষয়

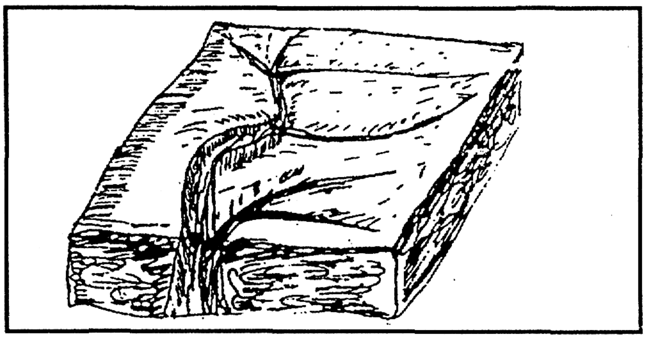

চিত্র 3.30 ঃ প্রণালী ক্ষয়

(v) **পতন জনিত ক্ষয় (Slip erosion) :** পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে বৃষ্টিপাতের ফলে বৃষ্টির জল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ঐ জল ভূ-অভ্যন্তরের অপ্রবেশ্য স্তরে অবস্থান করার ফলে ঐ অঞ্চলের মৃত্তিকা নরম হয়ে আলগা হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ঐ সমগ্র অঞ্চলটি হঠাৎ নিচের দিকে নামতে থাকে। পাহাড়ী অঞ্চলে এরূপ ক্ষয় হতে দেখা যায়।

(vi) **সমুদ্র তটভূমি ক্ষয় (Seashore erosion) :** সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে জোয়ারের সময় সাগরের জল অনেকদূর পর্যন্ত বেড়ে যায় বা ঝড় বাদলের সময় সমুদ্রে বড় বড় ঢেউয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ প্রথমে আলগা হয়ে যায় এবং বার বার এরূপ ঘটনার ফলে ধীরে ধীরে তা সমুদ্রের জলে ভেঙ্গে পড়ে। সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশি তার তীরবর্তী অঞ্চলের মাটিকে লবণাক্ত ও ক্ষার মাটিতে পরিণত করে। এভাবে সমুদ্র তার তীরবর্তী অঞ্চল ক্ষয় করে চলেছে।

(vii) **নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের ক্ষয় (Stream bank erosion) :** নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলি প্রধানত দুইভাবে ক্ষয় হয়। প্রথমত যদি নদীর কোনো অংশে নদী সঙ্গম (Confluence) ঘটে তবে প্রধানত নদীর জল বৃদ্ধি হবার ফলে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পায় এবং গভীরতা বৃদ্ধি পেলে পার্শ্বক্ষয় অবশম্ভাবী হয়ে পড়ে। আবার যে নদীর গভীরতা কম সে সকল অঞ্চলের জল নদীর দুই তীর ছাপিয়ে তীরবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করে তার ক্ষয় সাধন করে। দ্বিতীয়ত নদীর বাঁকের মুখে একদিক ক্ষয় করে এগিয়ে চলে। অন্যদিকে প্রথমে সঞ্চয় ঘটলেও তীরবর্তী অঞ্চল অধিক উঁচু হলে তা আপনা-আপনিই ভেঙ্গে পড়ে। আবার যে সব নদীতে জোয়ারের জল প্রবেশ করে সেই সব নদীতে ভাটির সময় জল তোড়ে সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ অপসরণ করা সময় ধীরে ধীরে ভূমি ক্ষয় হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকা ক্ষয় দেখানো হয়েছে।

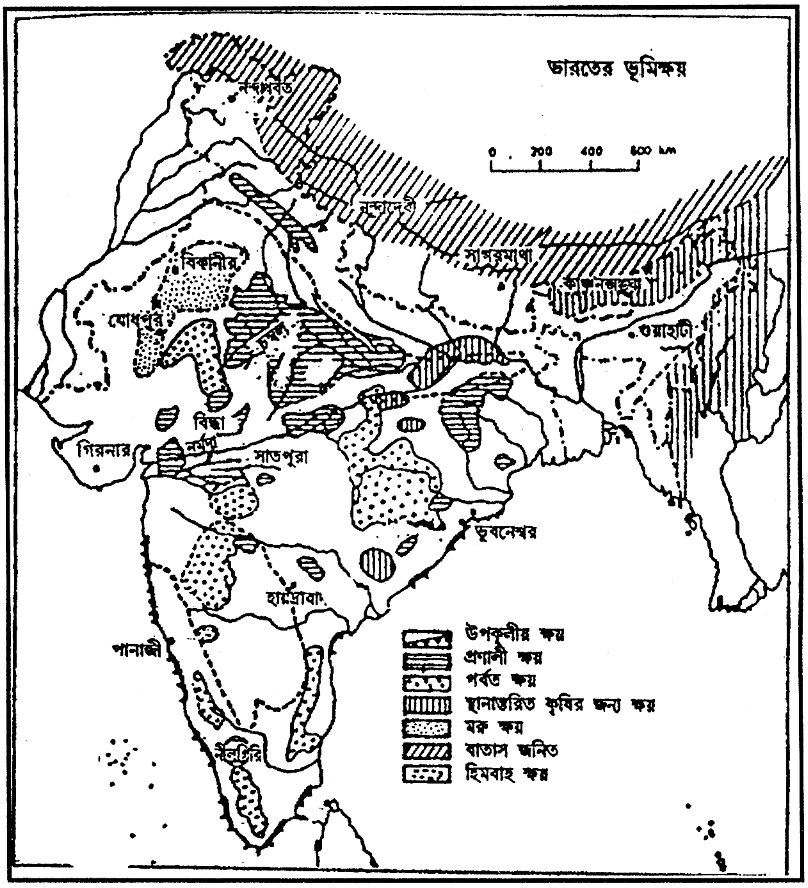

চিত্র 3.31 ঃ ভারতের মৃত্তিকা ক্ষয়

(B) বাতাস দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় (Soil Erosion by wind)

পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম কিন্তু বাতাসের বেগ যথেষ্ট থাকে (যেমন মরু অঞ্চল) সেই সকল স্থানে মৃত্তিকা ক্ষয়ের প্রধান শক্তি হলো বাতাস। তবে যে সকল অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদের পরিমাণ কম থাকে সেই সকল অঞ্চলে ক্ষয়ের পরিমাণ অধিক হয়, কারণ আবরণ বিহীন ভূমিভাগ থেকে সহজেই মৃত্তিকার অপসারণ ঘটে। এর ফলে উপরের স্তরের আলগা মৃত্তিকা অপসারিত হয়। আবার বাতাসের গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে মৃত্তিকার উপরিস্থিত আবরণ অনেক বেশি পরিমাণে আলগা হয়ে পড়ে এবং মৃত্তিকা অপসারণ অধিক সহজ হয়ে পড়ে।

বাতালের দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় বাতাসের গতিবেগের ওপর নির্ভরশীল। গতিবেগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার গতিবেগ কম হলে ক্ষয়ের পরিমাণ কমে যায়। রাজস্থানের মরু-অঞ্চল এই প্রাকৃতিক শক্তির শিকার।

(c) ভূ-প্রকৃতি (Topography) :

ভূ-প্রকৃতি বলতে ভূমিভাগের গঠনকে বোঝায়। ভূমিভাগ বন্ধুর হলে ক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কারণ বন্ধুর ভূমিভাগে ঢালের পরিমাণ অধিক থাকে এবং ঢাল বিশিষ্ট অঞ্চলে জলের দ্বারা মৃত্তিকা অতি সত্ত্বর বাহিত হতে পারে। আবার সমভূমি অঞ্চলে জল ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলে বলে ভূমিক্ষয় তুলনামূলকভাবে কম হয়।

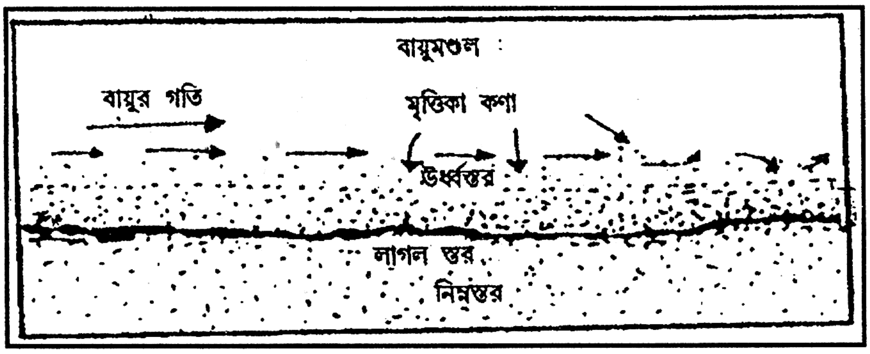

চিত্র 3.32 ঃ ভারতের মৃত্তিকা ক্ষয়

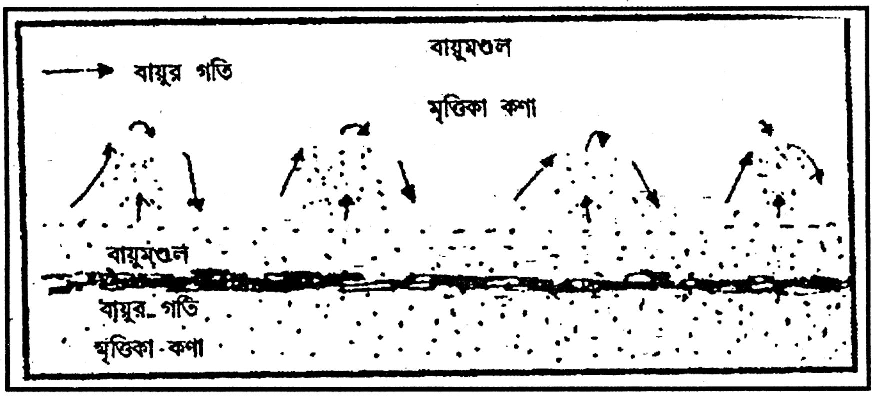

চিত্র 3.33 ঃ ভারতের মৃত্তিকা ক্ষয়

বিভিন্ন রাজ্যের মৃত্তিকা ক্ষয় ও ভূমির অবনমন ঃ 1987–88 সাল (লক্ষ হেক্টরে)

রাজ্য	মৃত্তিকাক্ষয়	ভূমি অবনমন	মোট এলাকা	গুনকদ্বার
রাজস্থান	199.02	174.92	373.94	16.28
মধ্যপ্রদেশ	196.10	11.02	207.12	41.82
মহারাষ্ট্র	191.81	6.65	198.46	101.25
উত্তর প্রদেশ	71.10	60.65	131.75	31.02
গুজরাট	99.46	26.40	125.86	28.81
অন্ধ্র প্রদেশ	115.62	7.29	122.91	9.27

রাজ্য	মৃত্তিকাক্ষয়	ভূমি অবনমন	মোট এলাকা	গুনকদ্বার
কর্ণাটক	109.89	4.14	114.03	81.43
উড়িষ্যা	45.78	22.25	78.03	7.24
বিহার	42.60	22.92	65.52	12.85
পশ্চিমবঙ্গ	10.33	32.70.	43.03	3.44
হরিয়ানা	15.91	25.11	41.02	4.97
তামিলনাড়ু	16.40	1.82	38.22	12.44
অসম	22.17	7.82	29.99	1.99
অরুণাচল	22.44	3.10	27.54	0.07
পাঞ্জাব	10.07	22.29	32.36	6.20
ভারত	**1266.22**	**470.20**	**1736.42**	**320.79**

(D) **মৃত্তিকার প্রকৃতি (Nature of Soil) :** মৃত্তিকার প্রকৃতি বলতে মৃত্তিকার গ্রথন, গঠন, বিভিন্ন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীসমূহ ইত্যাদিকে বোঝায়। কারণ এই সকল প্রকৃতির ওপর মৃত্তিকা ক্ষয় অনেকাংশে নির্ভরশীল।

(i) **গ্রথন (Texture) :** মৃত্তিকার গ্রথন যদি আলগা হয় তবে অতি শীঘ্র জলের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং এমতাবস্থায় যদি নিচে শক্ত প্যান থাকে তবে জল আর নিজের দিকে যেতে পারে না। তখন অতিরিক্ত জল ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা বহন করে স্থানান্তরিত করে। আবার মৃত্তিকার গ্রথন যদি কঠিন হয় তবে তার ক্ষয় সাধিত হয়ে থাকে।

(ii) **গঠন (Structure) :** মৃত্তিকার কণাগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট আকৃতি গঠন করে থাকে এবং এই গঠনের ওপর মৃত্তিকার ক্ষয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। মৃত্তিকার এই সংযুক্তি যদি আলগা থাকে তবে সে সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে জলের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং খুব শীঘ্র ভূমিক্ষয় হয়। অন্যদিকে মৃত্তিকা সুসংবদ্ধ হলে ক্ষয়ের পরিমাণও কম হয়।

(E) **উদ্ভিদ (Vegetation) :** বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মৃত্তিকা ক্ষয়ের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

1. উদ্ভিদ দ্বারা আচ্ছাদিত ভূমিভাগ বৃষ্টির ফোঁটার গতিবেগকে বাধা দেয়, ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় কম হয়।

2. উদ্ভিদের প্রস্বেদনের ফলে ভূ-ত্বক ও অন্তঃভূমির অনেকটা জল আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। ফলে মাটিতে আবার জল প্রবেশের পথ অনেকটা প্রশস্ত হয়।

3. উদ্ভিদের শিকড় মাটির কণাগুলিকে জড়িয়ে ধরে থাকে বলে বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে তা সহজে স্থানচ্যুত হয় না।

4. মৃত উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড ইত্যাদি মাটিতে জৈব পদার্থের জোগান দেয় এবং এই জৈব পদার্থ মৃত্তিকা গ্রথনে সহায়তা করে। ফলে জলের প্রবেশ্যতা অনেকাংশে কমে যায়।

5. উদ্ভিদের অবস্থান বৃষ্টিপাতের গতিবেগকে বাধা দিয়ে মৃত্তিকা ক্ষয়কে হ্রাস প্রাপ্ত করে। তাই ভূমিভাগের ওপর উদ্ভিদের আবরণ কম হলে ভূমিভাগের ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়।

(F) **অনুপ্রাণীর সমাবেশ (Presence of Micro-organism) :** মৃত্তিকাস্থিত অনুজীবীয় প্রাণীদের দেহাবশেষ মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ উৎপাদনে সহায়তা করে এবং এই জৈব পদার্থ মৃত্তিকার কণাগুলির গ্রথনে সহায়তা করে। ফলে মৃত্তিকা সহজে ধুয়ে চলে যেতে পারে না। তাই এই অনুজীবীয় প্রাণীর সংখ্যা কম হলে মৃত্তিকা ক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

(G) **তাপমাত্রা (Temperature) :** তাপমাত্রা মৃত্তিকা ক্ষয়কে অনেকাংশেই প্রভাবিত করে থাকে। তাপমাত্রার প্রভাবে শিলা খণ্ডিত হতে হতে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম ধূলিকণায় পরিণত হয় এবং এই সূক্ষ্ম কণা জল ও বায়ুদ্বারা অতি সহজে বাহিত হয়। আবার শীত প্রধান অঞ্চলে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করলে তা বরফে পরিণত হয় এবং উত্তাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে ঐ তুষার গলতে আরম্ভ করলে গলিত তুষার কণার সঙ্গে মৃত্তিকা বাহিত হয়ে চলে। এভাবে তাপমাত্রার প্রভাবে মৃত্তিকা ক্ষয় হয়ে থাকে।

(H) **মানুষের কার্যাবলী (Human activity) :** মানুষের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৃত্তিকা ক্ষয়ে সহায়তা করে থাকে।

1. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুয বসবাসের জমি ও চাষের জমির প্রয়োজনে প্রথমে বনভূমি ধ্বংস করে অবং পরবর্তী সময়ে বসতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাটের উন্নতি প্রকল্পে বনভূমি উচ্ছেদ করে। উদ্ভিদ-বিহীন ভূমিভাগ সহজেই প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্ষয়িত হয়ে থাকে।

2. পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষেরা তাদের প্রয়োজনে বনের কিছু অংশের জঙ্গল পরিষ্কার করে কয়েক বছর চাষ করে এবং পরবর্তী সময়ে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পেলে ঐ জমি ফেলে (fallow) রেখে আবার নতুন জমিতে চাষ আরম্ভ করে। এভাবে ঝুম চাষ করার ফলে বনভূমি ধ্বংস হয় কিন্তু সেই সব অঞ্চলে নতুন করে বনভূমি প্রায়ই গড়ে ওঠে না। তাই ঐ সকল উন্মুক্ত পাহাড়ি অঞ্চলে শীঘ্রই ক্ষয়ীভূত হয়ে থাকে।

3. পশুজাত দ্রব্যের চাহিদা এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের জীবিকা অর্জনের জন্য পশুচারণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পশুচারণ অনেকাংশেই অসংরক্ষিত ভাবে হয় বলে পশুদের পায়ের চাপে যেমন ছোটো ছোটো চারাগাছগুলি নষ্ট হয়, আবার পশুদের খাদ্য সরবরাহের জন্যও বনভূমির ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। আবার পাহাড়ি অঞ্চলে পশুদের চলাচলের ফলেও মৃত্তিকা ক্ষয় ও বনভূমি ধ্বংস হয়ে চলেছে।

4. কৃষকদের জমিতে বিভিন্ন যন্ত্র যেমন, ট্রাক্টর, হারভেক্টর ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে ভূমিভাগের মৃত্তিকা সহজেই আলগা হয়ে মৃত্তিকা ত্বরান্বিত করছে। এর সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জমিতে নানাপ্রকার কীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির ব্যবহারও মৃত্তিকার ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে, ফলে মৃত্তিকার গঠন ও গ্রথন বিঘ্নিত হয় এবং মৃত্তিকা সহজে ক্ষয় হয়ে যায়। মোহনায় নদীর গভীরতা বাধাপ্রাপ্ত হলে মোহনায় গড়ে ওঠা বন্দরে জাহাজ চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। আবার অধিক মৃত্তিকাক্ষয় পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। অতএব মৃত্তিকাক্ষয় যে ভাবেই হোক না কেন তা মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর। তাই মৃত্তিকাক্ষয় রোধে বিভিন্নভাবে (তা সরকারী হোক আর বেসরকারী হোক) সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ (Soil Conservation)

ভূমি প্রকৃতির দান এবং মৃত্তিকা ভূমিভাগের ওপরের স্তর। পৃথিবীতে যত উদ্ভিদ রয়েছে তাদের শিকড় মৃত্তিকাকে ধরে বেঁচে আছে। মানুষ তার বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করে এই মৃত্তিকার ওপর। মৃত্তিকার চাষযোগ্য ভূমি মানুষের খাদ্যের যোগান দেয়। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে এই জাগতিক জীবন মৃত্তিকাকে নির্ভর করেই বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও সেই সঙ্গে মৃত্তিকা সংরক্ষণের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালন পদ্ধতি মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাত্রার প্রধান অন্তরায়। তাই মৃত্তিকা সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে ও সুষ্ঠু পরিচালন পদ্ধতির সহায়তার মাধ্যমে মৃত্তিকার সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। মৃত্তিকা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে সব দিকগুলির দিকে নজর দিতে হবে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

(a) বনভূমি সৃষ্টি (Afforestation) : উদ্ভিদের শিকড় একদিকে যেমন মৃত্তিকাকে ধরে রাখতে পারে তেমনি উদ্ভিদ মৃত্তিকার ওপর আচ্ছাদনের কাজ করে বলে বৃষ্টিপাতেব ধারার গতিরোধ করতে পারে। ফলে বৃষ্টিপাত

বা বায়ুপ্রবাহ জনিত মৃত্তিকা ক্ষয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার বনভূমি বৃষ্টিপাতকে আকর্ষণ করে। তাই যে সব অঞ্চলে অরণ্য কম সেই সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতও অনেক কম। এসব কারণে বনভূমি নষ্ট না করে প্রয়োজন মতো নতুন চারা গাছ লাগিয়ে বনভূমি সৃষ্টি করলে মৃত্তিকা ক্ষয়কে প্রতিহত করা যায়।

(b) ধাপ চাষ (Terracing) : পাহাড়ি অঞ্চলে ধাপ কেটে চাষ আবাদ করা একটি পুরনো পদ্ধতি। ধাপ চাষের ক্ষেত্রে বর্তমান ভূমির সঠিক ঢাল নির্ণয় করে মাটি বা ছোটো ছোটো পাথর দিয়ে বাঁধ তৈরি করে চাষ আবাদ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির ঢালের আড়াআড়িভাবে ধাপগুলি তৈরি করা হয় এবং ফসলের সারিও অনুরূপভাবে আড়াআড়ি করে লাগানো হয়। ধাপগুলি দেখতে অনেকটা অর্ধাচন্দ্রাকৃতি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে জল সরাসরি গড়িয়ে পড়তে পারে না বলে ক্ষয়ের পরিমাণও কম হয়।

চিত্র 3.34 ঃ খাড়া পাহাড়ী ঢালকে দু'ভাগে ধাপভূমিতে পরিণত করে দেখানো হয়েছে।

(c) ফালি চাষ (Strip Cropping) : পাহাড়ি অঞ্চলে ছোটো ছোটো পাহাড়ি ঢালের মাটিতে পাহাড়ের ঢাল অনুসারে কয়েক সারি শস্যের অন্তর অন্তর ঢালের বরাবর আড়া-আড়ি ভাবে একখণ্ড জমিতে শষ্য লাগানোর নামই **ফালি চাষ**। যে সব পাহাড়ি অঞ্চলে জমির ঢাল অনেক বেশি এবং ঢাল সমভাবে একই দিকে বিস্তৃত সেই সকল অঞ্চলে এভাবে ফালি চাষ মৃত্তিকা রোধের এক উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ, এভাবে চাষ করলে জলের গতি প্রতিহত হয় এবং মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ হয়।

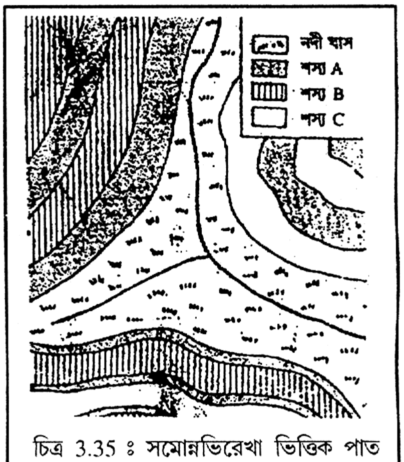

চিত্র 3.35 ঃ সমোন্নভিরেখা ভিত্তিক পাত

(d) উচ্চতা অনুসারে চাষ (contour farming) : এই পদ্ধতি হলো ভূমির ঢাল অনুসারে ভূমি চাষ, বীজ বপন এবং শস্য উৎপাদন করা। এরূপ ক্ষেত্রে বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে উঁচু নিচু এলাকার সমান উচ্চতা সম্পন্ন বিন্দুগুলি যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে সমঢাল রেখা বলে। ঐ রেখা বরাবর 8–9 ফুট উঁচুতে এমনভাবে বাঁধ দেওয়া হয় যাতে দুটো বাঁধের মধ্যবর্ত্তী জমি হতে জল বের হতে পারে না। এভাবে বাঁধ দেওয়ার ফলে মৃত্তিকার ক্ষয় ব্যাপক ভাবে রোধ করা সম্ভব এবং এই পদ্ধতিতে চাষকে বলে **উচ্চতা অনুসারে চাষ**।

(e) গালিক্ষয় নিবারণ : যে সব এলাকার মাটি নরম এবং হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে বৃষ্টিপাত হয় সেইসব এলাকায় নালি ক্ষয় সর্বাধিক হয়। এই নালিক্ষয় রোধের জন্য নানাপ্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় ঃ

(i) খাত বরাবর জল প্রবাহ রোধে বাঁধ নির্মাণ।

(ii) খাতের সর্বোচ্চ অঞ্চলে ক্ষয় রোধ করার জন্য মাটির দেওয়াল তৈরী।

(iii) মৃত্তিকা ক্ষয়ে বিভিন্ন ঝোপঝাড়, লতাপাতা ইত্যাদি নির্মাণ করলে বা নালিক্ষয় অঞ্চলে বাঁধের পাশে পাশে চারা গাছ লাগালে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ সম্ভব হয়। জোয়ার, বাজরা, প্রভৃতি শস্য যা ভূমিক্ষয় প্রতিরোধে সাহায্য করে সেইরূপ শস্য চাষ করা উচিত।

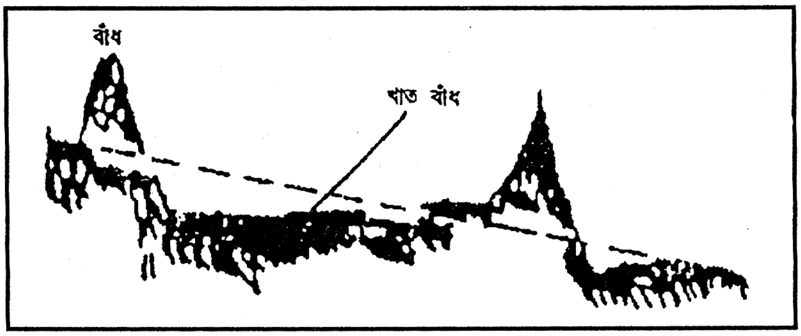

চিত্র 3.36 ঃ গালিক্ষয় নিবারণ

(f) নদী তীরের ক্ষয় রোধ (Conservation of river bank) : নদীর স্রোত ও ঢেউয়ের আঘাতে সর্বদাই নদী তীরবর্তী মাটি নরম হয়ে ক্ষয় হয়। তাই মৃত্তিকার গ্রথনকে দৃঢ় করতে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে মাটির বাঁধ বা কংক্রিটের বাঁধ দিলে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করা সম্ভব।

(g) শেল্টার বেল্ট (Shelter belt) : বিভিন্ন প্রকার গাছ সমান্তরালভাবে রোপন করলে অতি শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহের গতিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়, যা ভূমির উপরিভাগের মৃত্তিকা ক্ষয়ের পরিমাণ রোধ করে, আবার এই বৃক্ষগুলি বালুকার বিস্তরও রোধ করতে সমর্থ হয়।

(h) অগভীর নালা কাটা (Furrow) : বাতাসের কার্যকরী শক্তি যেখানে বেশি সেই সব অঞ্চলে ভূমিক্ষয় কমাতে হলে বাতাসের গতির আড়াআড়িভাবে জমিতে নালা কেটে রাখলে ভূমিক্ষয় যেমন রোধ করা সম্ভব, তেমনি বাতাস দ্বারা বাহিত মাটি বহন রোধ করা সম্ভব হয় (কারণ মাটি নালায় পরে তা ভরাট করে দেয়)। এর ফলে মৃত্তিকা জমি হতে দূরে যেতে পারে না। এভাবে জমিতে নালি কেটে বাতাসের দ্বারা ভূমিক্ষয়কে রোধ করা যায়।

(i) বন্যা নিয়ন্ত্রণ (Flood Control) : বন্যার সময়ে জলের প্রবাহের ফলে মৃত্তিকা নরম ও আলগা হয়ে বন্যার জলের সঙ্গে বাহিত হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক বিজ্ঞানভিত্তিক বন্যা নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

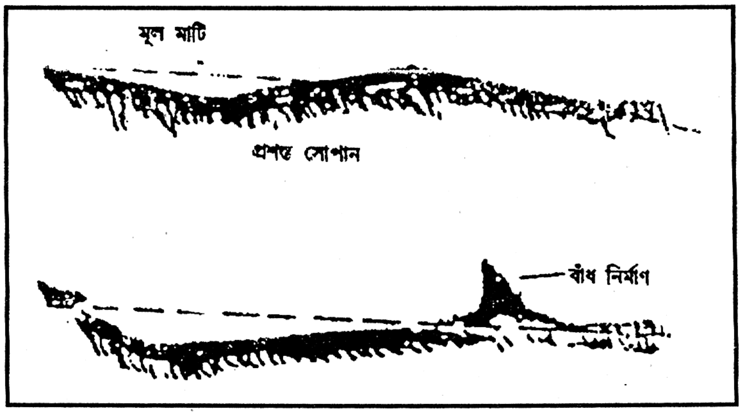

(j) শস্যাবর্তন (Crop Rotation) : পর্যায়ক্রমে একই জমিতে বিভিন্ন শস্যের চাষ করা হলে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা যায়। কারণ এর ফলে জমি কখনও খালি পড়ে থাকে না। আবার বিভিন্ন ঋতুতে নানা প্রকার ফসল চাষের ফলে মৃত্তিকার দৃঢ়তাও বৃধ্বি পায় আর মৃত্তিকা ক্ষয় অনেকাংশে রোধ হয়।

সুতরাং মৃত্তিকা ক্ষয় অবরোধের পদ্ধতিগুলি হলো—

(i) বহুল পরিমাণে বৃক্ষরোপন।

(ii) সুষ্ঠ পশুচারণ ব্যবস্থা

(iii) বন্যা নিয়ন্ত্রণ

(iv) পরিবর্তনশীল কৃষিব্যবস্থা

(v) সঠিক ভূমির ব্যবহার

(vi) মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় রাখা

(vii) মৃত্তিকার পুনর্গঠন

(viii) মৃত্তিকা পরিচালনার জন্য সঠিক পরিচালন পদ্ধতি

(ix) প্রাকৃতিক দুর্যোগের পুর্বাভাস এবং

(x) মৃত্তিকা সংরক্ষণে জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন।

উপরিউ ব্যবস্থাগুলি সঠিকভাবে গ্রহণ করা হলে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

3.1.5 স্বাভাবিক উদ্ভিদ (Natural Vegetation)

❑ ভূমিকা

যে সমস্ত গাছ বা উদ্ভিদ কোন স্থানের জলবায়ু ও মৃত্তিকাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই জন্মায় ও বড় হয়, তাদের ঐ স্থানের **স্বাভাবিক উদ্ভিদ** বলে। যদিও ভারতের উদ্ভিদজগৎকে (Flora) এককথায় 'ক্রান্তীয় মৌসুমী' বা 'Tropical Monsoonal' বলা যেতে পারে, তবে বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা, বায়ুর আর্দ্রতা, ভূ-

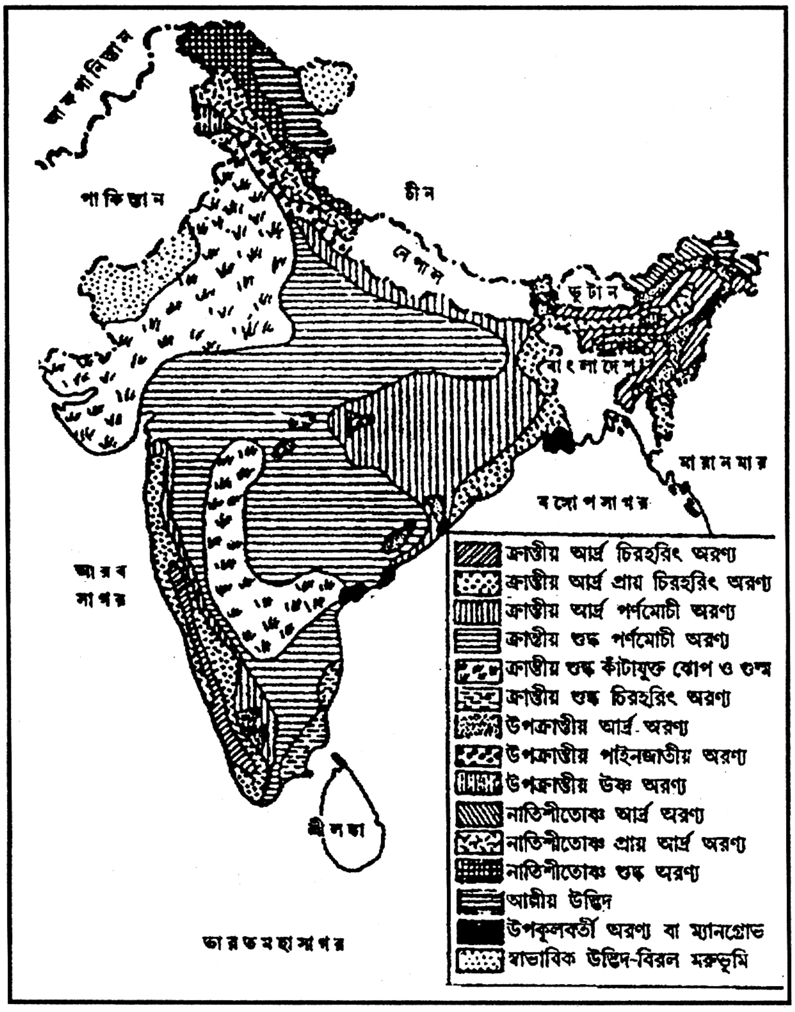

চিত্র 3.38 ঃ ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ

প্রকৃতি, মাটি প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়। ভারতে প্রায় 30,000 প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায়। ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদকে কয়েকটি উদ্ভিদ অঞ্চলে (Floristic Region) প্রথম বিভক্ত করেন Hooker এবং Thomson 1855 সালে। এরপর C.B. Clarke (1898)। এশিয়ার অংশকে 6টি উদ্ভিদ অঞ্চলে ভাগ করেছেন। 1937 সালে C.C. Calder ভারতে 6টি উদ্ভিদ অঞ্চলকে চিহ্নিত করেন ঃ

(1) উত্তর-পশ্চিম হিমালয় (2) পূর্ব-হিমালয় (3) সিন্ধু সমভূমি (4) গঙ্গা সমভূমি, (5) দাক্ষিণাত্য এবং (6) মালাবার অঞ্চল। ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের একটা সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করা খুব কঠিন কাজ। বিভিন্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানী (Botanists) ও পরিবেশ বিজ্ঞানী (Ecologists) বহুভাবে এর শ্রেণীবিভাগ করেছেন। H.G. Champion (1936) ভারতে 116 রকমের স্বাভাবিক উদ্ভিদের শনাক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে কতকগুলির উপবিভাগও রয়েছে। Champion-র এই শ্রেণীবিভাগের সরলীকরণ করেছেন। G. S. Puri (1960), Legris (1963), Champion & S. K. Seth, (1968), এবং S. S. Negi (1990) এইসমস্ত বিশেষজ্ঞদের শ্রেণীবিভাগের ওপর নির্ভর করে ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদকে 5টি প্রধান ভাগে এবং 16টি উপবিভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল নিম্নরূপ—

A. আর্দ্র ক্রান্তীয় অরণ্য (Moist Tropical Forests) ঃ

1. ক্রান্তিয় আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্য (Tropical Wet Evergeen)
2. ক্রান্তিয় অব-চিরহরিৎ অরণ্য (Tropical Semi-evergreen)
3. ক্রান্তীয় আর্দ্র-পর্ণমোচী অরণ্য (Tropical Moist-Deciduous)
4. উপকূলবর্তী ও জলাভূমি (Littoral and Swamp)

B. শুষ্ক ক্রান্তীয় অরণ্য (Dry Tropical Forest) ঃ

5. ক্রান্তীয় শুষ্ক চিরহরিৎ অরণ্য (Tropical Dry Evergreen)
6. ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য (Tropical Dry Deciduous)
7. ক্রান্তীয় কাঁটা ঝোপ (Tropical Thorn)

C. পার্বত্য উপ-ক্রান্তীয় অরণ্য (Montane Sub-tropical Forests) ঃ

8. উপ-ক্রান্তীয় প্রশস্ত পত্রযুক্ত অরণ্য (Sub-troical Broad Leaved)
9. উপ-ক্রান্তীয় আর্দ্র পাহাড়ী (পাইন) অরণ্য (Sub-tropical moist hill (pine)
10. উপ-ক্রান্তীয় শুষ্ক চিরহরিৎ অরণ্য (Sub-tropical Dry Evergreen)

D. পার্বত্য নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি (Montane Temperate Forests) ঃ

11. পার্বত্য আর্দ্র-নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য (Montane Wet temperate)
12. হিমালয়ের আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য (Himalayan Moist temperate)
13. হিমালয়ের শুষ্ক নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য (Himalayan Dry Temperate)

E. Alpine Forests (আল্পীয় অরণ্য) ঃ

14. উপ-আল্পীয় অরণ্য (Sub-Alpine)
15. আর্দ্র-আল্পীয় ঝোপ ও গুল্ম (Moist Alpine Scrub)
16. শুষ্ক-আল্পীয় ঝোপ ও গুল্ম (Dry Alpine Scrub)

A. আর্দ্র-ক্রান্তীয় অরণ্য (Moist Tropical Forests) ঃ

1. ক্রান্তিয় আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্য (Tropical Wet Evergreen Forests) : এই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৃষ্টি অরণ্য সেই সমস্ত অঞ্চলে জন্মায় যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণে 250 সেমির বেশী, বার্ষিক উষ্ণতা প্রায় 25^0–27^0C এবং বার্ষিক গড় আর্দ্রতা 77%-র বেশী এবং শুষ্ক ঋতু সুস্পষ্টভাবে ছোট। অত্যাধিক উষ্ণতা ও আর্দ্রতায় এই অরণ্যের গাছের পাতাগুলি একসঙ্গে ঝরে পড়ে না। এই বনভূমির নাম চিরহরিৎ বা চিরসবুজ বা

Evergreen অরণ্য। এই অরণ্যের গাছগুলি দীর্ঘ, খুব ঘন, বহুস্তরযুক্ত ও মেসোফাইটিক (Mesophytic) প্রজাতির হয়। এই গাছগুলি 45 মিটার আবার কখনো 60 মিটারের ও বেশী দীর্ঘ হয়। সূর্যের আলো দিনের বেলাতেও এই অরণ্যের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না বলে ঘনছায়ায় মাটির ওপর বেত, বাঁশ, ফার্ণ প্রভৃতি গাছ জন্মায়। বিভিন্ন প্রকারের অর্কিড (Orchids) বড় গাছগুলির ওপর জন্মায়।

ভারতে ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্য দেখা যায় পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিমঢালে (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 500–1370 মিটার উচ্চে), অরুণাচল প্রদেশ, Upper Assam, Nagaland, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। ভারতের প্রায় 8% বনভূমি এই প্রকৃতির।

এই অরণ্যের গাছগুলির কাঠ খুব শক্ত, ভারী ও মজবুত বলে এর বাণিজ্যিক মূল্য খুব বেশী। এই অরণ্যে শিশু, গর্জন, রোজউড, মেহগনি, চাপলাস, আবলুস, রাবার, পুন, তুন, বিশপউড, আয়রণ উড, বাঁশ, বেত প্রভৃতি জন্মায়।

2. ক্রান্তীয় অব-চিরহরিৎ অরণ্য (Tropical Semi-Evergreen Forests) : এই ধরনের অরণ্য সে সমস্ত অঞ্চলে দেখা যায় যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত 200–250 (ক্রান্তীয় অব-চিরহরিৎ অরণ্য সেমি, বার্ষিক গড় উষ্ণতা 24^0C – 27^0C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 75%। এই ধরনের অরণ্য ভারতের পশ্চিম উপকূল, আসাম, পূর্ব হিমালয়ের নিম্ন ঢাল, ওড়িশা, এবং আন্দামানে দেখা যায়। ভারতের প্রায় 4% বনভূমি এই প্রকৃতির।

ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য তুলনামূলক ভাবে কম ঘন, কিন্তু এই অরণ্যের গাছগুলি বেশী সঙ্গলিপ্সু (বিশেষত আসামে)। কোন কোন জায়গায় চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্রণ দেখা যায়। এই অরণ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি হল শক্ত কাণ্ড, খসখসে ও পুরু গাছের ছাল, ঘন লতানো গাছ। এখানে প্রচুর পরিমাণে এপিফাইট (Epiphytes) প্রজাতির গাছ জন্মায়। এই অরণ্যের বিভিন্ন প্রকার গাছগুলি হল শিমুল, রোজউড, কদম, লরেল, কুসুম, বাঁশ প্রভৃতি যা পশ্চিমঘাট, পর্বতে দেখা যায় এবং সাদা সীডার ভারতীয় চেষ্টনাট, চাঁপা, আমগাছ প্রভৃতি হিমালয় অঞ্চলে দেখা যায়।

3. ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য (Troical Moist Deciduous Forests) : এই ধরনের অরণ্য মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে (বার্ষিক 100–200 সেমি), বার্ষিক গড় উষ্ণতা প্রায় 27^0 সে এবং বার্ষিক আপেক্ষিক গড় আর্দ্রতা 60–75% যুক্ত অঞ্চলে দেখা যায়। এই ধরনের অরণ্য পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিম ও পূর্ব ঢালে, তরাই ও ভাবর সহ শিবালিক অঞ্চল (77^0E–88^0E) মণিপুর ও মিজোরাম, পূর্ব মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশ, ছোটনাগপুর মালভূমি, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। ভারতের প্রায় 37 বনভূমি এই প্রকৃতির।

এই অরণ্যের গাছের পাতাগুলি বসন্তের শেষে ও গ্রীষ্মের শুরুতে 6–8 সপ্তাহের জন্য ঝরে যায়, কারণ এই সময় আবহাওয়া শুষ্ক থাকে। এই সময় ভৌমজলস্তরও নেমে যায়। বর্ষাকাল শুরুর সাথে সাথে এই গাছগুলির সবুজ পাতা আবার গজিয়ে ওঠে। এই অরণ্যের বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রজাতির বহুস্তরযুক্ত বৃক্ষের সমন্বয়।

এই অরণ্য খুবই মূল্যবান, কারণ এর কাঠ ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্যের বাণিজ্যিক মূল্য বেশী। এই অরণ্যের প্রধান গাছগুলি হল শাল, সেগুন, বাদাম, ধূপ, কোকো, রোজউড, শিমুল, আমলকী, অর্জুন আবলুস, চন্দন, জাম, বাঁশ প্রভৃতি। এই অরণ্য থেকে কাঠ সংগ্রহ করা সহজ কারণ একই প্রজাতির বৃক্ষ পাশাপাশি জন্মায়। এই অরণ্য চিরহরিৎ অরণ্য অপেক্ষা বেশী অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছে কিন্তু বর্তমানে এই অরণ্যের অনেকটা অঞ্চল কৃষিকাজের জন্য পরিষ্কার করা হয়েছে।

4. উপকূলীয় বনভূমি (Littoral and Swamp Forests) : এই ধরনের অরণ্য ব-দ্বীপ, খাঁড়ি, জোয়ার প্রভাবিত অঞ্চলে দেখা যায়। তাই এই অরণ্যের নাম Delta বা Tidal Forest। উপকূলীয় বনভূমি সমুদ্র উপকূল

(Swamp) বরাবর গড়ে উঠেছে। এই বনভূমি গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং কাবেরী-র ব-দ্বীপ এলাকায় গড়ে উঠেছে। এখানকার গাছগুলি মিষ্টি ও নোনা জলে বৃদ্ধি পায়। ঘন ম্যানগ্রোভ (Mangroves) অরণ্য, উপকূলরেখা বরাবর আবৃত খাঁড়ি (backwaters, লেগুন), নোনা জলাভূমি এই সব অঞ্চলে গড়ে উঠেছে এবং মোট 6,740 বর্গকিমি এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে যা পৃথিবীর ম্যানগ্রোভ অরণ্যের প্রায় 7%। ভারতের প্রায় 0.6% বনভূমি এই প্রকৃতির। এই অরণ্যের কাঠ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ও ঘনতম ম্যাগগ্রোভ। ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ও ঘনতম ম্যানগ্রোভ অরণ্য হল সুন্দরবন (Sunderban) যা গঙ্গা ব-দ্বীপে সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গাছ হল সুন্দরী যা সুন্দরবনে প্রচুর পরিমানে জন্মায়। এই অরণ্যের কাঠ শক্ত ও মজবুত যা গৃহনির্মাণ ও নৌকা তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এই অরণ্যের প্রধান গাছগুলি হল সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া, ক্যাওড়া, হোগলা, গোলপাতা প্রভৃতি। তাছাড়া এই বনভূমিতে মধু ও মোম পাওয়া যায়।

B. শুষ্ক ক্রান্তীয় অরণ্য (Dry Tropical Forest) :

5. ক্রান্তীয় শুষ্ক চিরহরিৎ (Tropical Dry Evergreen Forests) : এই ধরনের বৈশিষ্ট্য যুক্ত অরণ্য গড়ে উঠেছে তামিলনাড়ু উপকুল বরাবর যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 100 সেমি এবং বেশীরভাগ বৃষ্টিপাত উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর দ্বারা অক্টোবর-ডিসেম্বরের মধ্যে সংগঠিত হয়। এখানকার বার্ষিক গড় উষ্মতা 28^0C এবং বার্ষিক গড় আর্দ্রতা 75%। এই অঞ্চল ক্রান্তীয় শুষ্ক চিরহরিৎ অরণ্য দ্বারা আবৃত। এই অরণ্য গড়ে ওঠার জন্য ঋতুগত বৃষ্টিপাতের বণ্টনই দায়ী। এখানে বেশীরভাগ বৃষ্টিপাত শীতকালে হয়। এই অরণ্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট গাছ যা সাধারণত 12 মিটার উচ্চ এবং সম্পূর্ণ চাঁদোয়ার মত আবৃত, বাঁশ ও ঘাসের দুর্লভ উপস্থিতি ইত্যাদি। এই অরণ্যের প্রধান গাছ হল জাম, কোকো, রিঠা, তেঁতুল, নিম, মুকুন্দ, তাল, গামারী, বেত ইত্যাদি। ভারতের প্রায় 2.2% অরণ্য এই প্রকৃতির। এই অরণ্যের বেশীর ভাগ অঞ্চল কৃষিকাজে এবং কাজুবাদাম চাষের জন্য পরিষ্কার করা হয়েছে।

6. ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য (Tropical Dry Deciduous Forests) : এই ধরনের অরণ্য আর্দ্র, পর্ণমোচী অরণ্য সদৃশ্য এবং শুষ্ক ঋতুতে গাছের পাতা ঝরে যায়। এই দুই অরণ্যের মধ্যে পার্থক্য হল ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষ অরণ্যের গাছগুলি তুলনামূলকভাবে কম বৃষ্টিযুক্ত (বার্ষিক 100–150 সেমি) অঞ্চলে জন্মায়। এই অরণ্য অনেকটা মিশ্র প্রকৃতির—আর্দ্র ঋতুতে এটি আর্দ্র পর্ণমোচী হিসাবে এবং শুষ্ক ঋতুতে কাঁটা ঝোপের আকার ধারণ করে। এই অরণ্যের বৈশিষ্ট্য হল ঘনসন্নিবন্ধ গাছের অবস্থান ও অসমান চাঁদোয়া, বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের মিশ্রণ এবং উচ্চতা 20 মিটার ও তার বেশী। অরন্যের ভিতরে ভূমিতলে যথেষ্ট সুর্যালোক পৌঁছায় বলে বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস ও লতানো গাছের বিকাশ ঘটে। ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য ভারতের এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে বণ্টিত হয়েছে। রাজস্থান, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া এই অরণ্য উত্তর থেকে দক্ষিণে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অরণ্যের প্রধান গাছগুলি হল সেগুন, রোজউড, শিরীশ, বাঁশ ইত্যাদি।

কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে এই অরন্যের একটা বিশাল অংশ পরিষ্কার করা হয়েছে এবং এই অরণ্য কিছু সমস্যার যেমন— বৃক্ষচ্ছেদন, অতিরিক্ত পশুচারণ এবং দাবানলের সম্মুখীন।

7. ক্রান্তীয় কাঁটা ঝোপের অরণ্য (Tropical Thorn Forests) : যে সমস্ত অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম (75 সেমির কম), আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ কম (50%-র কম) এবং উষ্মতা খুব বেশী (25^0C – 30^0C), সেখানে ঘন অরণ্য গড়ে ওঠার সুযোগ খুব কম বলে ক্রান্তীয় কাঁটা জাতীয় ঝোপ দেখা যায়। এখানকার

গাছগুলির উচ্চতা কম (6–10 মিটার উচ্চতা সর্বাধিক) এবং প্রশস্তভাবে ও বিক্ষিপ্তভাবে জন্মায়। বাবলা জাতীয় গাছ এখানকার প্রধান বৃক্ষ। ইউফরবিয়াস গাছও (Euphorbias) উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় বন্য খেজুর গাছ সাধারণত আর্দ্র নীচু জায়গায় জন্মায়। বর্ষাকালে কিছু ঘাসও জন্মায়।

প্রধানত দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে যথা— রাজস্থান, দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাব, পঃ হরিয়ানা, কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের কিছু অংশে এই অরণ্য দেখা যায়। থর মরুভূমিতে এই অরণ্য মরু সাদৃশ্য অরণ্যে রূপান্তরিত হয়। এই অরণ্য পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর এক বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে। এই অরণ্য ভারতের প্রায় 2.6% এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে। এই অরণ্যের প্রধান গাছগুলি হল খয়ের, নিম, বাবলা, ফণিমনসা, কাজু, বুনো খেজুর, তাল, বেরি, পলাশ ইত্যাদি।

C. পার্বত্য উপ-ক্রান্তীয় অরণ্য (Mountain Sub-tropical Forests) :

8. উপ-ক্রান্তীয় প্রশস্ত পত্রযুক্ত অরণ্য (Sub-tropical broad leved forests) : এই অরণ্য পূর্ব হিমালয়ে 88^0 পূর্ব দ্রাঘিমারেখায় 1000 মি. - 2000 মি. উচ্চতায় অবস্থান করছে যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতে 75–125 সেমি., বার্ষিক গড় উষ্ণতা $18–21^0$ সে. এবং বার্ষিক গড় আর্দ্রতা 80%। এই অরণ্যে চিরহরিৎ প্রজাতির গাছের সমৃদ্ধি দেখা যায় এবং গাছগুলি দীর্ঘ (20–30 মিটার) ও ঘন হয়। অ্যাশ ও বীচসহ চিরহরিৎ ওক এবং চেষ্টনাট এখানকার প্রধান বৃক্ষ। পাহাড়ের নীচে শাল ও উপরে পাইন গাছ জন্মায়। লতানো গাছ এবং পরগাছা প্রজাতির বৃক্ষও এখানে দেখা যায়।

এই অরণ্য দক্ষিণ ভারতে ততটা বিস্তার লাভ করেনি। তবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1070–1525 মিটার উচ্চতায় নীলগিরি ও পালনি পাহাড়ে এই অরণ্য দেখা যায়। এই অরণ্য ভারতের প্রায় 0.4% এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে, যদিও এই অরণ্য খর্বাকৃতি আর্দ্র অরণ্য এবং ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যের মত ততটা সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। পশ্চিমঘাট পর্বতের উচ্চ অংশে যথা— মহাবালেশ্বর, সাতপুরা ও মহাকাল পর্বত, বস্তারের উচ্চভূমি এবং আরাবল্লী পর্বতের মাউন্ট আবুতেও এই অরণ্য দেখা যায়।

9. উপ-ক্রান্তীয় আর্দ্র পাইন অরণ্য (Sub-tropical Moist Pine Forests) : পশ্চিম হিমালয়ে 73^0E–88^0E দ্রাঘিমারেখায় পার্বত্য আর্দ্র অরণ্যের সমান উচ্চতায় এই অরণ্য দেখা যায়। অরুণাচল প্রদেশের কিয়দংশ, মণিপুর, মেঘালয়, নাগা ও খাসি পাহাড়-র একই উচ্চতায় এই অরণ্য দেখা যায়। চির বা চিল (Chir or Chil) এই অরণ্যের প্রধান গাছ যার কাঠ খুব শক্ত। এই মূল্যবান কাঠ আসবাবপত্র, বাক্স, বাড়িঘর, এবং রেলের স্লিপার তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এই গাছ রেজিন ও তার্পিন তেল তৈরীর জন্যও ব্যবহৃত হয়। ভারতে প্রায় 6.6% এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে এই অরণ্য।

10. উপ-ক্রান্তীয় শুষ্ক চিরহরিৎ অরণ্য (Sub-tropical Dry Evergren Forests) : এই অরণ্য ভাবর, শিবালিক পর্বতশ্রেণী এবং হিমালয় পবতের পশ্চিমাংশে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1000 মিটার উচ্চতায় অবস্থান করছে। এখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 50–100 সেমি। বৃষ্টিপাত ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে হয়। গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত উষ্ণতা পায়। শীতকালে উষ্ণতা মাঝে মাঝে হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়ে তুষারপাতে হয়। ক্ষুদ্রকার চিরহরিৎ বৃক্ষ ও ঝোপ, কাঁটাগাছ, ঔষধি এবং ঘাসসহ এই অরণ্য প্রধানত গুল্মময়। এই অরণ্যের প্রধান গাছ হল জলপাই, খেজুর প্রজাতির গাছ। এই অরণ্য দেশের প্রায় 2.5% এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে।

D. পার্বত্য নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি (Montane Temperate Forests) :

11. পার্বত্য আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি (Montane wet temperate Forest) : এই ধরনের অরণ্য সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1800 মি.–3000 মি. উচ্চতায় দেখা যায়। যেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 150 সেমি. 300 সেমি.,

বার্ষিক গড় উষ্মতা 11°C–14°C এবং আপেক্ষিক গড় আর্দ্রতা 80%-র বেশী। এই অরণ্য প্রধানত তামিলনাড়ু ও কেরালার উঁচু পাহাড়গুলিতে, পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে (88°E দ্রাঘিমার পূর্বে) বিশেষকরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম,

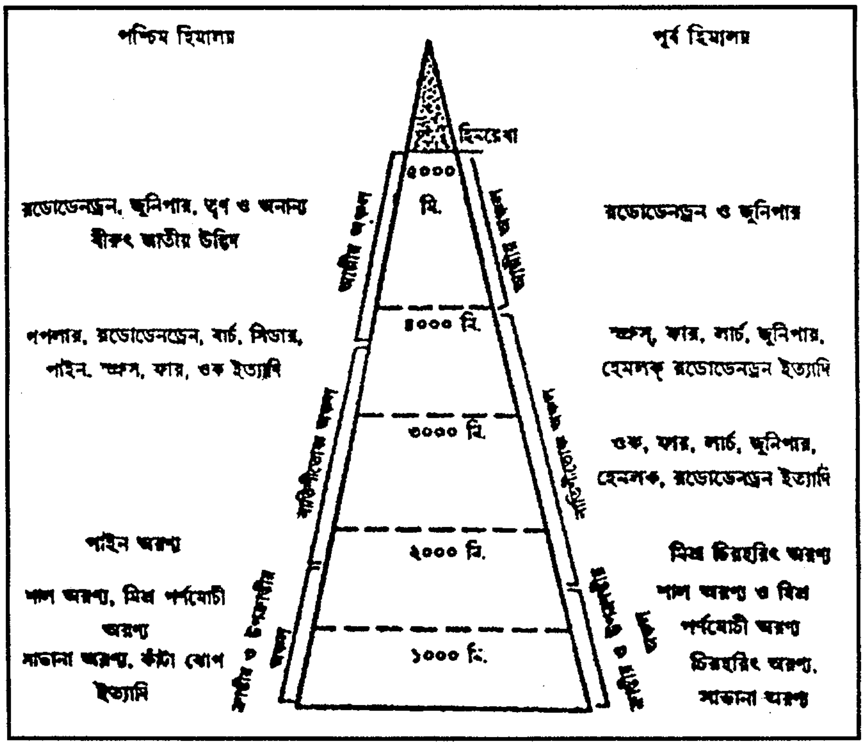

চিত্র 3.39 ঃ পশ্চিম ও পূর্ব হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় প্রধান প্রধান উদ্ভিদ

অরুণাচল প্রদেশ, সিমিক, নাগাল্যাণ্ড-র পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়। এই অরণ্যের গাছগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, কাণ্ডগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং কাণ্ডগুলির বেড় বেশী হয়। পাতাগুলি ঘন ও গোলাকার হয়। শাখা-প্রশাখাগুলি মস, ফার্ণ এবং অন্যান্য পরগাছা প্রজাতির বৃক্ষ দ্বারা আবৃত থাকে। লতানো গাছগুলি সাধারণত কাষ্ঠল হয়। গাছগুলির উচ্চতা 6 মিটারের বেশী হয় না। প্রধান গাছ হল দেবদারু, ভারতীয় চেষ্টনাট, বার্চ, তাল, নীল পাইন, ওক, হেমলক ইত্যাদি। এই অরণ্য ভারতের প্রায় 3.6% এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে।

12. হিমালয়ের আদ্র নাতিশীতোষ্ম অরণ্য (Himalayan Moist Temperate Forests) : হিমালয় পর্বতের নাতিশীতোষ্ম বলয়ে 1500–3300 মিটার উচ্চতায় যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 150–250 সেমি. সেখানে এই অরণ্য দেখা যায়। এই অরণ্য কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, দার্জিলিং এবং সিকিম হিমালয়ে বিস্তৃত। এই অরণ্যে প্রধানত সরলবর্গীয় প্রকৃতির বৃক্ষ দেখা যায় যার বেশীর ভাগই 30–50 মি. দীর্ঘ হয়। আর্দ্রতার পূর্বদিকে প্রধানত প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের সাথে সরলবর্গীয় বৃক্ষের মিশ্রণ দেখা যায়। প্রধান বৃক্ষ হল পাইন, সিডার, রূপালী ফার, স্প্রুস ইত্যাদি। গাছগুলি লম্বা এবং উন্মুক্ত জঙ্গল হলেও ভূমতল গুল্মময় হয় এবং ওক, রোজোড্রেনড্রন, লরেল এবং বাঁশগাছ জন্মায়। তুলানামূলকভাবে শুষ্কতর পশ্চিমাংশে যেখানে বৃষ্টিপাত 115–180 সেমি বিশেষত 80°E দ্রাঘিমার পশ্চিমে দেবদারু প্রধান বৃক্ষ (যার কাঠ শক্ত ও মজবুত) দেখা যায়। এই কাঠ

প্রধানত নির্মাণকার্যে, ও রেলের স্লিপার তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এই অরণ্য দেশের 3.4% এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে।

13. হিমালয়ের শুষ্ক নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য (Himalayan Dry Temperate Forests) : জাঙ্গল গুল্মসহ এই অরণ্য প্রধান সরলবর্গীয় প্রকৃতির। এখানকার প্রধান বৃক্ষ হল— দেবদারু, ওক, অ্যাশ, ম্যাপেল, জলপাই, সিডার ইত্যাদি। এই অরণ্য হিমালয় পর্বতশ্রেণীর শুষ্ক বলয়ে গড়ে উঠেছে যেখানে দক্ষিণ—পশ্চিম মৌসুমী বায়ু খুব দুর্বল ও অস্পষ্ট এবং বার্ষিক অধঃক্ষেপনের পরিমাণ ১০০ সেমির কম। এই অরণ্য প্রধানত লাডাক, লাহুল, ছাম্বা, কিন্নর, গাড়োয়াল ও সিকিম হিমালয়ে দেখতে পাওয়া যায়। এই অরণ্য দেশের 0.3% এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে।

E. আল্পীয় অরণ্য (Alpine Forests) : আল্পীয় অরণ্য হিমালয় পর্বতশ্রেণীর 2900–3500 মিটার, এমনকি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3800 মিটার উচ্চতায় দেখা যায়। অবস্থান ও প্রজাতির বিভিন্নতার ওপর নির্ভর করে এই অরণ্যকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (i) Sub-alpine (অব-আল্পীয়) (ii) Moist alpine scrub (আর্দ্র আল্পীয় ঝোপ ও গুল্ম) এবং (3) Dry alpine scrub (শুষ্ক আল্পীয় ঝোপ ও গুল্ম)। উপ-আল্পীয় (subalpine) অরণ্য বৃক্ষ অরণ্যের ঊর্ধ্বসীমায় আল্পীয় ঝোপ গুল্ম এবং তৃণভূমির পাশেই অবস্থান করে। সরলবর্গীয় বৃক্ষসহ বড় বড় ঝোপ এবং ছোট ছোট গাছ এই অরণ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই অরণ্যে সরলবর্গীয় ও বৃহৎ পত্রযুক্ত অরণ্যের মিশ্রণ দেখা যায়। এই অরণ্যে সরলবর্গীয় বৃক্ষগুলির উচ্চতা প্রায় 30 মিটার এবং বৃহৎপত্রযুক্ত গাছগুলির উচ্চতা 10 মিটারের মতো হয়। এই অরণ্যের উল্লেখযোগ্য গাছ হল ফার, স্প্রুস, রোডোড্রেনড্রন, তাল ইত্যাদি।

রোডোড্রেনড্রন, বাঁচ, পুষ্পলতা প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের ঘন বিকাশ আর্দ্র আল্পীয় অরণ্যে ঘটে থাকে। এই অরণ্য সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3000 মিটার উচ্চতা থেকে হিমরেখা পর্যন্ত দেখা যায়।

শুষ্ক আল্পীয় অরণ্য-সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 3000 মি.-এর বেশী উচ্চতায় এই অরণ্য হিমালয়ের শুষ্ক বলয়ে দেখা যায় যেখানে জাঙ্গল উদ্ভিদ, খর্বাকৃতি ঝোপ দেখা যায়। এই অরণ্যের প্রধান বৃক্ষ হল জুনিপার, পুষ্পলতা ইত্যাদি।

অরণ্যচ্ছেদন ও পরিবেশের ওপর তার প্রভাব
(Deforestation and Its impact on Environment)

পল্লীপ্রকৃতির অরণ্যদেবতা নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন "মানুষ অমিতচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান প্রদান, ক্রমে সে নগরবাসী হল, তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল, যে তার প্রথম সুহৃদ, দেবতার আতিথ্য যে তাকে বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করল ইঁট-কাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য.......লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে। বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার ওপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে।" বনভূমির এই যথেচ্ছ ধ্বংসের ফলে শুধুমাত্র বায়ু দূষিত হয়েছে, কিংবা মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে তাই নয়, বন্যা, অনাবৃষ্টি, খরা, পশুপক্ষীর খাদ্যাভাব, কাঠের সংকুচিত যোগান ইত্যাদি হাজারো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।"

অরণ্যের উপকারিতা ঃ

কবিগুরুর উপদেশ স্মরণ করে আমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করে অরণ্য আমাদের কি কি উপকার করে? অরণ্যের অবদানকে দু'ভাবে ভাগে ভাগ করা চলে ঃ প্রত্যক্ষ উপকার ও পরোক্ষ উপকার। প্রথমটিতে রয়েছে

অরণ্য থেকে পাওয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাপ্ত কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য, যেমন কাঠ, মূল, ফুল, নির্যাস প্রভৃতি।

অরণ্যের প্রত্যক্ষ অবদান হল কাঠ যাকে আমরা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করতাম। এখনও পাহাড়ী এলাকায় গ্রামের গরীব মানুষেরা কাঠকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। গৃহস্থালীর জ্বালানী ছাড়াও কল-কারখানায় কাঠ ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের দেশের প্রথম লোহা ও ইস্পাত কারখানাটিতে শক্তি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হত। যে সব দেশে খনিজ তেল বা কয়লার অভাব রয়েছে, সেই সব দেশে কাঠ পুড়িয়ে কাঠ কয়লা (Charcol) তৈরী করা হয়। ঐ কাঠকয়লার সাহায্যে ধাতম খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।

শিল্পকাঠ দ্রব্য ঃ আসবাবপত্র, কাঠের বাড়ীঘর, নৌকা, পাতলা তক্তা, প্লাইউড, ফাইবার বোর্ড তৈরীর প্রধান কাঁচামাল হল কাঠ।

কাগজ শিল্পের কাঁচামাল হল কাঠ। কাঠ দিয়ে কাগজ মণ্ড তৈরী হয় যা কাগজ তৈরীর প্রধান উপকরণ। এচাড়া কাঠের মণ্ড থেকে সেলুলোজ তৈরী হয়। রেয়ন, অ্যাসিটেট প্রভৃতি তন্তুজ দ্রব্য তৈরী করতে সেলুলোজ লাগে।

অরণ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বনজ দ্রব্যগুল হল—

(i) **রবার ও অন্যান্য আঠা** — ব্রাজিলের আমাজন অববাহিকায় হেভিয়া ব্রাসিলিনসিয়া গাছ থেকে আঠা তৈরী হয়। মধ্য আমেরিকার অরণ্যের গাছের আঠা থেকে চিকল ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অরণ্যের গাছ থেকে জেলুটোং পাওয়া যায়। এগুলি থেকে চুইংগাম তৈরী হয়।

(ii) **রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল** — সরলবর্গীয় গাছের রস থেকে পীচ, টার, রজন (Resin) ও তারপিন উৎপন্ন হয়। আসামের লখিমপুর ও শিবসাগর জেলায় ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্যের ধুনাগাছের রস থেকে ধুনা ও অগুরু গাছের রস থেকে অগুরু তৈরী হয়।

দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় কুইয়ারকাল সুবার গাছের ছাল থেকে কর্ক তৈরী হয়।

ওক গাছ ছাড়াও হেমলক, চেষ্টনাট, ওয়াটল, কুইব্রাচো গাছের ছাল থেকে **ট্যানিন** অ্যাসিড তৈরী হয়, যা চামড়া পাকা করতে, রঙ করতে বা কালি তৈরী করতে ব্যবহার হয়।

ভেষজ উদ্ভিদ — সিঙ্কোনা গাছের ছালের রস থেকে কুইনিন, কর্পূর গাছের রস থেকে কর্পূর পাওয়া যায়। আবার কোকেন, মরফিল, হিরোইন ও আফিমের মত নেশার দ্রব্য পাওয়া যায়।

এছাড়া অরণ্য থেকে দারচিনি, ছোট এলাচ ও বড় এলাচ-এর মত প্রধান প্রধান মশলা পাওয়া যায়।

খাদ্য দ্রব্য ঃ অনেক উদ্ভিদের ফুল, ফল, পত্র, মূল ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অরণ্য হতে প্রাপ্ত ফলগুলি হল আম, বেল, জাম, আমলকী, বহেড়া প্রভৃতি। শাঁসযুক্ত ফলগুলির মধ্যে চীনাবাদাম, আখরোট, নারিকেল ইত্যাদি। আমলকী, তেঁতুল, ব্যাঙের ছাতা ইত্যাদিও বিভিন্নভাবে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাল, খেজুর, মহুয়া থেকে সুরা প্রস্তুত করা হয়। রন্ধনকার্যে সুগন্দীকারক হিসাবে তেজপাতা ব্যবহৃত হয়।

পত্র ঃ বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত নানা ধরনের পত্র বহুভাবে ব্যবহৃত হয়। তেণ্ডু গাছের পাত তামাক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। আবার শাল গাছের পাতা থালা, গ্লাস, কাপ তৈরীতে কাজে লাগে।

তৃণ, বাঁশ ও বেত ঃ তৃণভূমি ও অরণ্য থেকে প্রাপ্ত নানা প্রজাতির তৃণ গবাদি পশুর খাদ্য, গৃহাদির ছাদ তৈরীর উপাদান এবং কাগজ তৈরীর কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সাবাই, ভাবর, এলিফ্যান্ট ইত্যাদি তৃণগুলি কাগজ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া খুস তৃণ খসখস তৈরীতে; মুঞ্জ তৃণ চেয়ার, টুল ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহার হয়।

বাঁশের ব্যবহার অনেক রকমের। বাড়ীর ছাদ, মেঝে, দেওয়াল, মাদুর, বিভিন্ন ধরনের পাত্র, দড়ি প্রভৃতি তৈরীর

সস্তা কাঁচামাল হিসাবে বাঁশের ব্যবহার প্রচলিত। এছাড়া বাঁশের নরম কাণ্ড এবং বীজ খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে। বাঁশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হল—কাগজ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে।

বেত একটি উল্লেখযোগ্য অরণ্যজাত উপকরণ যা দড়ি, কাছি, মাদুর, ব্যাগ, ঝুড়ি, আসবাবপত্র, ছড়ি, ছাতার হাতল, খেলার সরঞ্জম ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

প্রাণীজ দ্রব্য ঃ অরণ্য থেকে প্রাপ্ত প্রাণীজ দ্রব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লাক্ষা। পলাশ, পিপুল, শিশু, শিরীষ, কুল, বেড়, গুলার, কলা ইত্যাদি গাছে লাক্ষা নামে একপ্রকার কীট জন্মে যার দেহ নিঃসৃত এক জাতীয় রসই হল লাক্ষা। পৃথিবীর মোট লাক্ষা উৎপাদনের প্রায় 85% ভারতে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে ঔষধ, প্লাসটিক, রঙ, রেশম, গালা, চামড়া, কাঠের পালিশ ইত্যাদি তৈরীতে লাক্ষা ব্যবহার করা হয়।

অন্যান্য প্রাণীজ দ্রব্যগুলির মধ্যে মধু, মোম, মথ, রেশম, শিং, হাতীর দাঁত, হরিণের শিং উল্লেখযোগ্য।

মনে রাখতে হবে উপরিউক্ত অরণ্যজাত দ্রব্যগুলি কোনও দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের প্রায় 35 লক্ষ লোক অরণযভিত্তিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত এবং সরকারী আয়ের প্রায় 2 শতাংশ অরণ্য থেকেই আসে।

বনভূমির পরোক্ষ অবদান ঃ বনভূমি পরোক্ষভাবে মানুষের তথা বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। বস্তুতপক্ষে, অরণ্যের পরোক্ষ অবদান অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। বনভূমির পরোক্ষ অবদানগুলি হল ঃ

ভূমিক্ষয় রোধ ঃ বনভূমির গাছপালা মাটিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে বলে বৃষ্টিপাত বা অন্যান্য কারণে মাটি সহজে ধুয়ে যেতে পারে না। ফলে ভূমিক্ষয় রোধ হয়ে থাকে। বনভূমির বৃক্ষের শিকড়ে বৃষ্টির জল প্রতিহত হয় বলে হঠাৎ নদীর জলবৃদ্ধি হয় না এবং বন্যার গতিবেগ কমে আসে।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ঃ বৃষ্টির জল ভূমিভাগের উপরিভাগের উর্বর মৃত্তিকাকে ধুইয়ে বনভূমির বাইরে নিয়ে যেতে পারে না কারণ মাটি ধুয়ে গাছের শিকড়ে আটকে যায়। এছাড়া গাছের পাতা ইত্যাদি মাটিতে পড়ে ও পচে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ায়।

জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ঃ উষ্ম ও শীতল উভয় প্রকার বায়ুপ্রবাহের তীব্রতাকে অরণ্য প্রশমিত করতে সাহায্য করে। অরণ্য বায়ু প্রবাহের সাথে তাড়িত (blown) ধুলোবালির হাত থেকে ক্ষেতের ফসলকে রক্ষা করে। মরুভূমির প্রসার রোধ করে। অরণ্যকে বলা হয় প্রাকৃতিক স্পঞ্জ (natural sponge)। অধিক বৃষ্টিপাতের সময়ে গাছেরা অতিরিক্ত জল ধরে রাখতে পারে এবং বৃষ্টিহীন সময় ঐ ধরে রাখা জলের সাহায্যে গাছ আশেপাশের আবহাওয়ার শুষ্কতা দূর করতে সাহায্য করে। অরণ্য আবহাওয়াকে সমভাবাপন্ন রাখতে সহায়তা করে।

গাছপালার অধিক জল ধারণ ক্ষমতা আছে বলে অরণ্য প্লাবন রোধ করতে পারে ও প্লাবনের তীব্রতা কমাতে সক্ষম হয়।

অরণ্য জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহের ঘনীঘবন করে বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে।

মরুভূমির বিস্তার রোধ করা ঃ মরু অঞ্চলের বালুকাকণাগুলি বায়ুতাড়িত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত পরিবাহি হয়। এইভাব মরুভূমি বিস্তার লাভ করে। উদ্ভিদের মূল বালুকণাগুলিকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখে এবং বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে অন্যত্র পরিবহণে বাধা প্রদান করে। সুতরাং অরণ্য মরুকরণ (desertification) প্রক্রিয়াকে মন্দীভূত করে তাছাড়া দীর্ঘকাল ধরে অরণ্যের অবস্থানের ফলে বায়ুমণ্ডল জলীয়বাষ্প যুক্ত হয় এবং মরু অঞ্চলের আবহাওয়ার শুষ্কতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

পরিবেশ দূষণ রোধ ঃ পরিবেশ দূষণের হার থেকে রক্ষা পেতে গেলে অরণ্য অপরিহার্য। বর্তমান নগর

সভ্যতার কুফলে আমাদের চারপাশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ, অতিমাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে। অধিক সংখ্যা গাছ লাগালে এই অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইডের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

পশুর আবাস ঃ অরণ্য পশুর আবাস। অরণ্যের পশু-পাখি অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। মানুযের খাদ্য, পোশাক প্রভৃতি তৈরি করার ক্ষেত্রে পশু সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। অরণ্যে পশুশিকার মানুযের অন্য পেশা ও নেশা। বর্তমানে গড়ে তোলা অভয়ারণ্যে পশুশিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অভয়ারণ্যগুলি প্রচুর পর্যটক আকর্ষণ করে। পর্যটকদের কাছ থেকে সরকার প্রচুর রাজস্ব আদায় করে থাকে।

আদিবাসীদের আবাস ঃ ভারতের প্রায় লক্ষ আদিবাসী অরণ্যে বসবাস করে। জাইরে অববাহিকা, আমাজন অববাহিকার অরণ্যে অনেক আদিম অধিবাসী বাস করে।

আধ্যাত্মিক পরিবেশ ঃ প্রকৃতির সঙ্গে লাভ করে মানুয এক সহজাত আনন্দ পায়। তাই অরণ্যের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী, বায়ু ও কোলাহল মুক্ত আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেশ বিদেশের সৌন্দর্য পিপাসুদের মানসিক ক্ষুধা নিবারণ করে। অরণ্যের সান্নিধ্যে মানুযের জীবনীশক্তি বাড়ে। এইজন্য স্বাস্থ্য নিবাস (Sanitorum), পর্যটক কেন্দ্র (tourists centre) প্রভৃতি অভয়ারণ্যগুলিতে গড়ে উঠেছে।

অরণ্য নিধন (Deforestation)

ভারতবর্ষে একদা (খ্রিস্টপূর্ব 3000 বৎসর) সমগ্র ভূমির 80% জুড়ে অরণ্যাঞ্চল বিরাজ করত আর 1995–98 সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র 19.39%-এ। জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি, সেইসঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাথাপিছু সম্পদের চাহিদার সম্মিলিত ফলেরই একটি প্রকাশ এই অরণ্যনিধন। 1900 থেকে 1980 সাল পর্যন্ত সময়ে ভারতবর্ষের 1,22,000 বর্গ কিমি. (এর মধ্যে 25000 বর্গ কিমি. ম্যানগ্রোভ) অরণ্য ধ্বংস হয়েছে। সেইসঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এদেশের অধিকাংশ তৃণভূমিই (IUCN, 1980)। ভারতে মাথাপিছু অরণ্যভূমির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। পৃথিবীতে মাথাপিছু অরণ্যভূমির পরিমাণ গড়ে 1 হেক্টর, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ মাত্র 0.10 হেক্টর। আবার কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু গড় অরণ্যভূমির পরিমাণ যথাক্রমে 14.2, 7.6, এবং 7.30 হেক্টর। ভারতে প্রতি বছরে গড়ে 15 লক্ষ হেক্টর অরণ্যাচ্ছদন বিনষ্ট হয়ে পড়বে। ভারতের মোট ভূ-ভাগের প্রায় 1 শতাংশ ভূমি প্রতি বছর বন্ধ্যা ভূমিতে পরিণত হয়।

আমাদের দেশে অরণ্য নিধনের প্রধান প্রধান কারণগুলি হল ঃ ঝুমচায (Jhoom Cultivation), উন্নয়ন প্রকল্প (Development projects), জ্বালানি কাঠের চাহিদা (Demand for Firewood), শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে কাঠের চাহিদা (Demand for wood for industry and commercial purposes) ও অন্যান্য কারণ (other causes)।

পাহাড়ী অঞ্চলে ঝুমচায ঃ পাহাড়ী অঞ্চলের মানুযেরা তাদের প্রয়োজনে বনের কিছু কিছু অঞ্চল আগুনে পুড়িয়ে পরিষ্কার করে কয়েক বছর যাবৎ চায আবাদ করে। জমির উর্বরতা কমে গেলে সেই জমি পতিত রেখে আবার নতুন জমির সৃষ্টি করে। এভাবে ঝুমচাযের ফলে যে বনভূমি ধ্বংস করা হয় সেখানে নতুন করে বনভূমি প্রায়ই গড়ে ওঠে না। এইরূপে ব্যাপকভাবে অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম, মেঘালয়, মনিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা, অরুণাচলপ্রদেশ, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে ব্যাপকভাবে স্থানান্তর কৃষি করা হয়ে থাকে। এক সমীক্ষা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ভারতে এ পর্যন্ত প্রায় 43 লক্ষ 50 হাজার হেক্টর জমি স্থানান্তর কৃষির মাধ্যমে চায হয়, অবশ্য এদেশে প্রায় 6 লক্ষ 22 হাজার পরিবার স্থানান্তর কৃষির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেন।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে।

অরণ্যকে শোষণ করা আরম্ভ হয়েছে। বন থেকে কাঁচামাল নেওয়া তো পরের কথা, উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রূপায়িত হওয়ার আগে থেকেই অরণ্যবিনাশের কাজ শুরু হয়ে যায়। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, বড় বাঁধ, জলাধার, রেললাইন পাতা, রাস্তাঘাট ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই প্রতিটি কর্মকাণ্ডেই পরিবেশের সমস্যার সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে প্রধান হল ব্যাপকভাবে অরণ্যনিধন। এই সমস্ত প্রকল্পে পরিকাঠামো গঠনের

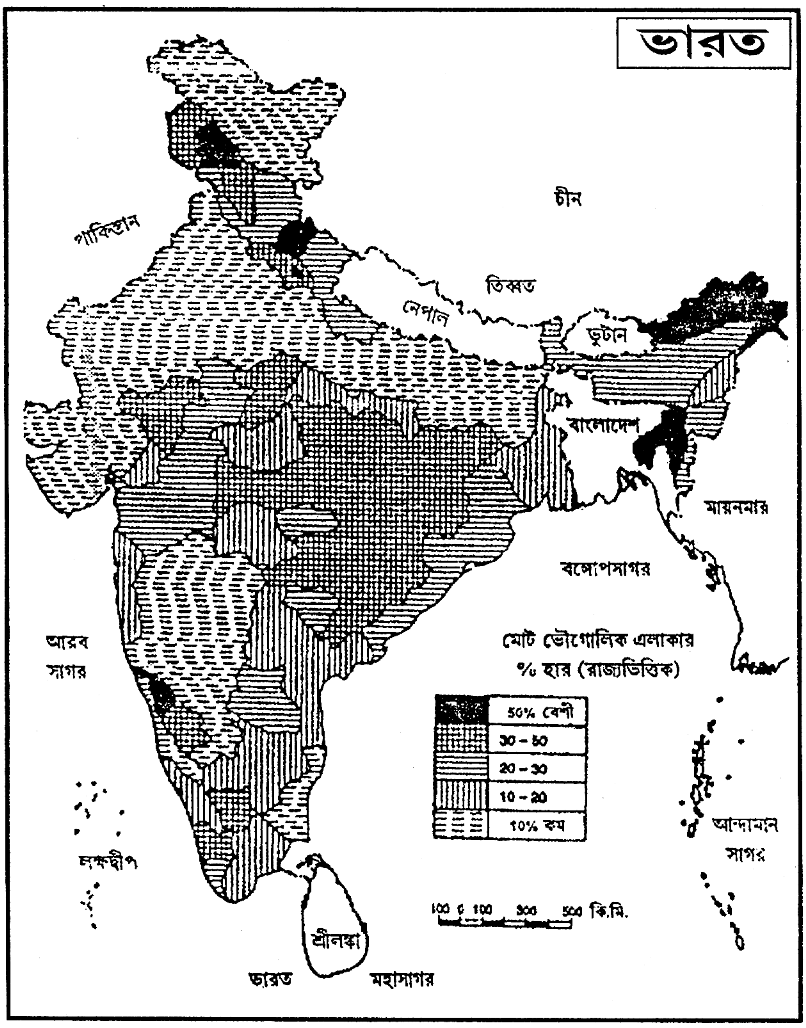

চিত্র 3.40 ঃ ভারতের অরণ্য এলাকা

সাথে সাথেই শুরু হয় ধ্বংসযজ্ঞ। কর্মী আবাসন, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তো আছেই, সেইসঙ্গে থাকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবহার যার সামগ্রিক ফলে অরণ্যের সমূহ ক্ষতি হয়।

জ্বালানীর চাহিদা ঃ উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকাংশ গ্রামে জ্বালানী হিসেবে কাঠের প্রচলন আছে। আর এজন্য

বহুগাছপালা কেটে ধ্বংস করা হয়েছে। বিশ্বের কাঠ উৎপাদনের 54%-ই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উন্নত দেশগুলি তাদের ব্যবহৃত কাঠের মাত্র 10% জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে এই পরিমাণ 82%। আমাদের দেশে বছরে 30-33 কোটি মেট্রিক টন জ্বালানি কাঠ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই বিপুল চাহিদার 70%-ই গ্রামাঞ্চলের, কারণ গ্রামাঞ্চলে কাঠের বিকল্প কোন উৎসের অভাব রয়েছে। জ্বালানি কাঠের ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা মেটাতে অরণ্যাঞ্চলের ওপর ক্রমাগত চাপ পড়ছে।

শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে কাঠের চাহিদা (Demand of wood for Industry and commercial purpose) ঃ বাক্স, প্যাকিং বাক্স, আসবাবপত্র, দেশলাই-এর খাপ, কাগজ ও মণ্ড, প্লাইউড তৈরীতে ব্যাপকহারে কাঠ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের প্রয়োজনে এদেশে কম করেও 3000 বর্গকিমি বনাঞ্চল সাফ করে ফেলা হয়েছে। অরণ্যের আশপাশে, শহরাঞ্চলের কাঠগোলার কাছাকাছি এমনকি অভয়ারণ্যের ভেতরেও ট্রাকভর্তি গাছের গুঁড়ি বা চোরাই কাঠের দৃশ্য আজ অতি সাধারণ দৃশ্য। আমাদের দেশের কাগজ শিল্পে 2% (দুই শতাংশ) কাঠ ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, মূলতঃ চা শিল্পে ব্যবহৃত বাক্সের যোগান দিতে বর্তমানে সমগ্র অসমের অরণ্যাঞ্চল থেকে এই সমস্ত থেকে সংগ্রহীত কাঠের 22% ব্যবহার করা হচ্ছে। বাকী কাঠ আসছে মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড ও অরুণাচল প্রদেশের বনাঞ্চল থেকে। রজন, গঁদ, রাবার, ক্ষারজাতীয় পদার্থ, ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিও অরণ্য হতে তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আহরণ করে। এই সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে আমাদের অরণ্যসম্পদ আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ ঃ পশুজাত দ্রব্যের চাহিদার জন্য এবং পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষের জীবিকা অর্জনের জন্য পশুচারণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসংরক্ষিত ভাবে পশুচারণের ফলে বনাঞ্চলের চারাগাছগুলি ধ্বংস হচ্ছে এবং উচ্চ পাহাড়ী অঞ্চলে পশুদের চলাচলের ফলে ভূমিক্ষয় ও বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক। উত্তরাঞ্চলের আল্পীয় অঞ্চলে প্রায় 12 লক্ষ ভেড়া এবং ছাগল রয়েছে। এছাড়া এ অঞ্চলে বছরে প্রায় 2500 যাযাবর পশুচারকের আগমন ঘটে। ভেড়া ও ছাগল ছাড়া গুজ্জর উপজাতিভুক্ত পশুচারকগণ প্রায় 5000–7000 মহিষ পালন করে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণের ফলে এই জঙ্গলে মাথাপিছু অরণ্যের পরিমাণ 13.79 ঘন মি. (1981) থেকে কমে 2.66 ঘন মি. (2001) হয়েছে এবং বার্ষিক পশুখাদ্য প্রাপ্যতা 2.60 টন (1981) থেকে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে মাত্র 0.90 টন (2001) দাঁড়িয়েছে (দে ও চট্টোপাধ্যায়, 2002)

অবৈজ্ঞানিকভাবে গাছ কাটা ঃ কাঠ ব্যবসায়ীরা অনেক সময়েই বনভূমি থেকে কাঠ আহরণের সময় সাবধানতা অবলম্বন করে না। ফলে বহু চারাগাছ ও অপরিণত গাছের ক্ষতি হয়।

পরিবেশ দূষণের প্রভাব ঃ পরিবেশ দূষণের প্রভাবও বনভূমিকে প্রভাবিত করেছে। শিল্পায়নের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে শিল্পোদ্ভব বিভিন্ন গ্যাসের প্রভাবে প্রকৃতির গ্রিন হাউস প্রভাবিত হচ্ছে, এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অ্যাসিড বৃষ্টি। এর ফলে বনভূমির গাছপালা প্রভাবিত হয় এবং বনভূমির ক্ষতি হচ্ছে।

অরণ্য অবক্ষয়ের প্রাকৃতিক কারণগুলি নিরূপণ ঃ

(1) ভূমি ধস ঃ পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি ধসের ফলে প্রায়ই অরণ্যের বিনাশ ঘটছে। ভূমিধস অঞ্চলের অরণ্য সমূলে উৎপাদিত হয়।

(2) দাবানল ঃ অরণ্যভূমি অঞ্চলে গাছের সঙ্গে গাছের ঘর্ষণের ফলে যে আগুনের সৃষ্টি হয় তাকে বলে দাবানল। এই দাবানলের আগুনে মাইলের পর মাইল অরণ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

(3) ঝড়ঝঞ্ঝা ঃ প্রবল ঝড়ে অরণ্যের ব্যাপক ক্ষয় হয়। অরণ্যের বিভিন্ন বনানী উৎপাদিত হয়। ভূমিতে ধস নামে। এইভাবে ঝড়ের ফলে অরণ্যের ক্ষতি হয়।

(4) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঃ আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে অগ্নুৎপাতের ফলে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে অরণ্যের ধ্বংস হয়।

(5) রোগ পোকার আক্রমণ ঃ অরণ্যভূমি অঞ্চলে নানা প্রকারের রোগ পোকার আক্রমণে বা পঙ্গপালের আক্রমণে অরণ্যের ক্ষতি হয়ে থাকে।

এইসব বিভিন্ন কারণে বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যার ফলস্বরূপ পরিবেশের অবনমন ঘটে চলেছে। বনভূমি বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে থাকে। বনভূমি কমে যাবার ফলে আবহাওয়া জগতেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতএব দেখা যাচ্ছে বনভূমি মানুষের যেমন নানাপ্রকার চাহিদা মেটাতে সাহায্য করছে তেমনি পরিবেশের অবক্ষয় রোধে এবং পরিবেশতন্ত্রকে অটুট রাখছে। তাই বনভূমি সংরক্ষণের একান্ত প্রয়োজন।

অরণ্য ধ্বংসের প্রভাব ঃ

অরণ্য নিধন পরিবেশের উপর কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করছে এবার তার বিস্তার আলোচনায় আসা যাক।

(i) উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের ফলে বিপুল অক্সিজেন বাতাসে যোগ হয়। বলা হয়ে থাকে একটা গল্‌ফকোর্সের মতো বড় অরণ্য ছয় থেকে আট হাজার মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু এই সালোকসংশ্লেষের সময় সবুজ উদ্ভিদ প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাস থেকে গ্রহণ করে থাকে। বনভূমি ধ্বংস হলে এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসেই জমবে। এর ফলে গ্রীন হাউস এফেক্ট বা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়তে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করবে। তাছাড়া ঐ অরণ্যের কাঠ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করলে তা থেকেও বিপুল পরিমানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়ে গ্রীন হাউস এফেক্ট-এর মাত্রা বাড়াবে।

F.A.O.-এর এক হিসেবে (1998–99) দেখা যাচ্ছে যে 1976 সালে পৃথিবীতে মোট অরণ্যের পরিমাণ ছিল 423 কোটি হেক্টর, 1998–99 সালে তা দাঁড়িয়েছে 419.71 কোটি হেক্টর। অর্থাৎ বিগত বাইশ বছরে অরণ্যের পরিমাণ 3.3 কোটি হেক্টর কমেছে। এ প্রসঙ্গে ভারতের চিত্রটি দেখা যাক (চিত্র 3.91) এতে দেখা যাচ্ছে ভারতের 1/3 অংশের বেশী স্থানে 10%-র কম অরণ্য রয়েছে।

এখন প্রশ্ন পৃথিবীতে অরণ্যচ্ছেদন কেন হচ্ছে?

জেম্‌স উইনকিনসনের হিসেব অনুযায়ী বলা যায় সারা বিশ্বে অরণ্যের কাঠ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের ফলে একমাত্র 1989 খ্রিস্টাব্দে 140 কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশেছে, এটা তার দশবছর আগে 1979 খ্রিস্টাব্দে যা ছিল তার থেকে শতকরা অন্তত 75 ভাগ বেশি।

সার পৃথিবীতে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, কেরোসিন, ডিজেল প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়াবার ফলে যত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে যোগ হয়, তার এক তৃতীয়াংশ শুধু অরণ্যের কাঠ পুড়িয়েই সৃষ্টি হয়ে থাকে। বনভূমি ধ্বংস হলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়বে। ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে শুধু যে তাপ বেড়ে চলবে তাই নয়, মেরু অঞ্চলে জমে থাকা হিমবাহ বেশি গলতে শুরু করবে। উপকূলবর্তী নিচু জায়গা তার ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়বে। বন্দর, পোতাশ্রয়, উপকূলবর্তী জনপদ, কৃষিজমি ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হবে। বর্তমান পৃথিবীতে এই সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করেছেন আগামী শতাব্দীতে এর পরিমাণ 140 কোটি টন থেকে বেড়ে 500 কোটি টনে গিয়ে দাঁড়াবে এবং তারপর এর পরিমাণ নাটকীয়ভাবে হঠাৎ কমে যাবে,—কারণ পৃথিবীতে তখন পোড়াবার মতো আর কোনো বনভূমি অবশিষ্ট থাকবে না।

(ii) পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বাস করে ক্রান্তীয় অরণ্যে। এই ক্রান্তীয় অরণ্য ধ্বংস হলে, বলা বাহুল্য, অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটবে।

(iii) অরণ্য নিধনের ফলে ভয়ঙ্কররূপে ভূমিক্ষয় এবং ভূমিস্খলন দেখা যায়। একটি হিসেবে দেখা গেছে যে

প্রতিবছর ভারতবর্ষে প্রায় 600 কোটি টন মাটি ক্ষয় হচ্ছে। মাটিকে উর্বরতা যোগায় যে খনিজ ও জৈব পদার্থগুলি সেগুলিও একই সাথে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। ফলে জমি রিক্ত হয়ে উঠছেই। অনুর্বর জমিকে চাষযোগ্য করার সমস্যা

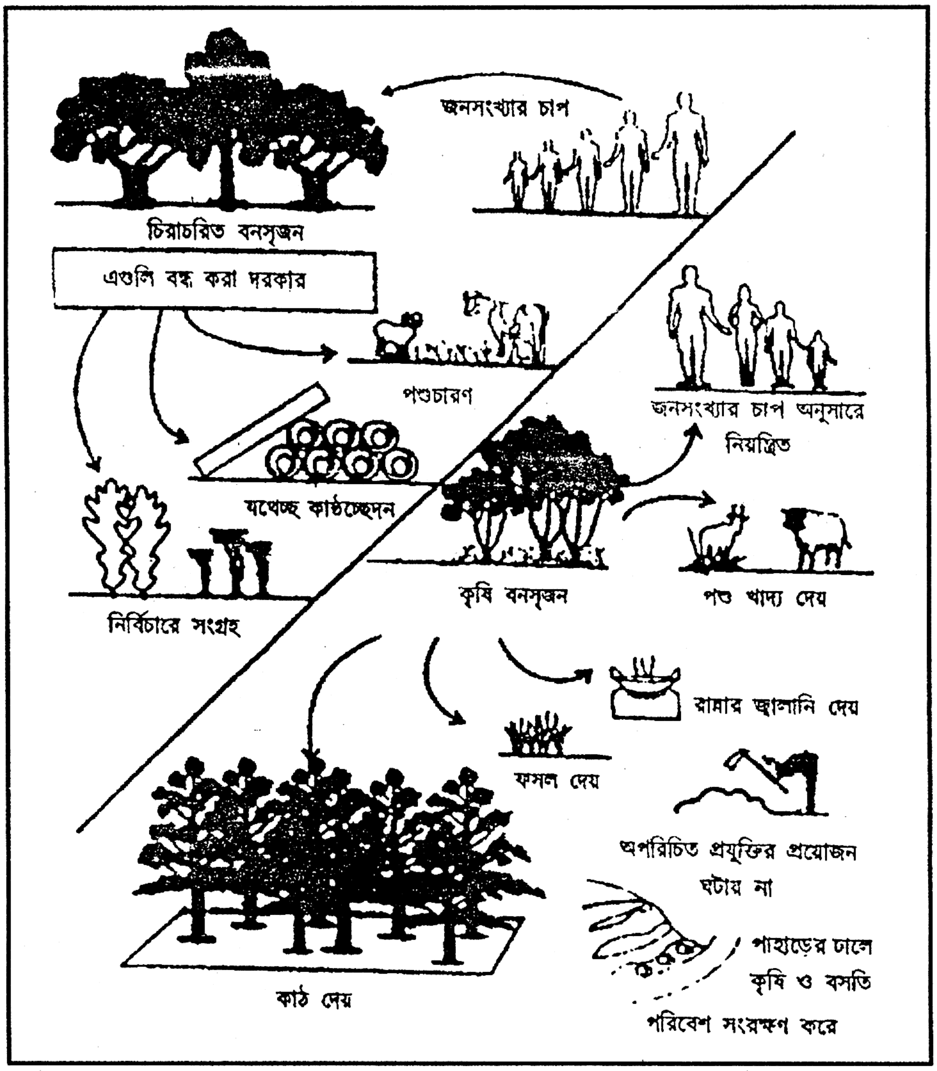

চিত্র 3.41 ঃ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা অনুসারে বনভূমি পরিচালনা (লাহিড়ী দত্ত অবলম্বনে)

উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। মাটির এই ব্যাপক ক্ষয়ের পেছনে রয়েছে খেয়াল খুশিমতো গাছপালা কেটে ফেলার মত অদূরদর্শী কাজ।

বন্যা ও খরার প্রকোপ বৃদ্ধি ঃ বনভূমি বিনষ্ট হলে নদীখাতে অতিরিক্ত পলি জমা হয়। ফলে নদীর গভীরতা কমে যায়। বর্ষার অতিরিক্ত জল তখন নদীর পক্ষে আর বহন করা সম্ভব হয় না। নদীতে বন্যা দেখা দেয়। অনুমান করা হয় প্রাচীন হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হল জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য বনভূমির বিনাশ

ও তার ফলে সৃষ্ট বন্যা। অন্যদিকে বনভূমি বাতাসে যে জলীয় বাষ্প যোগান দেয়, বনভূমি ধ্বংস হলে, সেই যোগান ব্যাহত হয়, বৃষ্টির পরিমাণ কমে যায়, খরা দেখা দেয়।

মরুভূমির প্রসার ঃ বাতাস ও মাটিতে গাছপালা যে আর্দ্রভাব বজায় রাখে, গাছপালার বিহনে সেই আর্দ্রতা লুপ্ত হয়। মরু সংলগ্ন অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে মরুভূমির আয়তন প্রসারিত হয় বা অন্যান্য জায়গায় অনাবৃষ্টির প্রভাবে মরুকরন (Desertification) অবস্থার সৃষ্টি হয়।

অরণ্য নিধনের ফলে প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে প্রায় এক শতাংশ ভূমি বন্ধ্যারূপে পরিবর্তিত হয়। হিমালয় অঞ্চলে ইতিমধ্যেই 3–4 শতাংশ বৃষ্টিপাত হ্রাস পেয়েছে।

আমরা জানি গাছপালা মাটিকে ঢেকে রাখে বলে সরাসরি বৃষ্টি কণাগুলি মাটিকে আঘাত করতে পারে না। এছাড়া বৃষ্টির কণাগুলির গতিশক্তি কম হয়। গাছকাটার ফলে মাটির কণাগুলি পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায় ও সহজেই বৃষ্টির জলের সাথে অন্যত্র পরিবাহিত হয়। এভাবে মাটি দ্রুত ক্ষয় হয়।

বনাঞ্চলে মাটির ওপরস্তরে সঞ্চিত জৈব বিশেষ (লতা, শাখা-প্রশাখা, মূল, কাণ্ড, মুকুল ইত্যাদি) বৃষ্টির জল ধরে রাখতে সাহায্য করে। তাই যথেষ্ট জল মাটির ভেতর প্রবেশ করে। কিন্তু উন্মুক্ত মাটিতে ধাবধারার (Run off) পরিমাণ বেশি হওয়ায় ঐ সব স্থানে শীট (Sheet) ক্ষয়, নালী (gully) ক্ষয় ও খাত (Ravine) ক্ষয় বেশি হয়। শান্তিনিকেতনের খোয়াই বা চম্বলের "বেহেড়' এলাকায় এজন্য ভূমিক্ষয় বেশি।

আর্থ-সামাজিক পরিবেশের ওপর প্রভাব ঃ

(i) অবৈজ্ঞনিকভাবে গাছ কাটার ফলে অদূর ভবিষ্যতে কাঠের যোগান কমে যাবে এবং কাগজ ও কাঠশিল্প সমস্যার সম্মুখীন হবে।

(ii) প্লাস্টিক, পলিথিন প্রভৃতি জৈব পচন বিমুখ পদার্থের উপর চাপ বাড়বে ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়বে।

(iii) পরিবেশ দূষণ বাড়বে।

অরণ্য সংরক্ষণের উপায়

পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী রাখতে হলে অরণ্যের সবুজকে আবার ফিরিয়ে আনা দরকার। বিভিন্ন দেশে অরণ্য সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর এ কাজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো হল—

(1) **দাবানল প্রতিরোধ ঃ** কানাডা ও রাশিয়া ফেডারেশনের বনাঞ্চলে মাঝে মাঝেই দাবানল সৃষ্টি হয়। কানাডার বনগুলোতে অল্প দূরত্বের ব্যবধানে দাবানল রোধ করার জন্য প্রহরাকেন্দ্র (watch centre) আছে। এইসব প্রহরাকেন্দ্রে খবরাখবর দেবার আধুনিক ব্যবস্থা এবং অগ্নিনিবারক যন্ত্রাদি রয়েছে।

(2) জীবজন্তু সংরক্ষণের জন্য বাস্তুতন্ত্রের (ecology) খুব প্রয়োজনীয়তা আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার জাতীয় পার্কগুলোতে অরণ্য ও পশু সংরক্ষণ করা হয়। ভারতেও সংরক্ষিত বনভূমি, অভয়ারণ্য, মৃগদাব গড়ে তুলে অরণ্য ও পশু সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যদিও এইসব অরণ্যে সংরক্ষনের ব্যবস্থা যথোপযুক্ত নয়।

(3) পতিত জমিতে বৃক্ষচ্ছেদনের কারণে কৃষিজমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। সেখানে বনসৃজন করে ভাল ফল পাওয়া যায়। এতে করে একদিকে যেমন ঐ জমির ভূমিক্ষয় রোধ করা যায় অন্যদিকে তেমনি বৃক্ষ রোপণ করে ভবিষ্যতে কৃষকের লাভ হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়াতে এইভাবে অনেক জমিকে বনভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। ভারতের রাজস্থানেও এইভাবে বনভূমি সৃষ্টি করে মরু বিজয়ের কেতন শূন্যে

উড়াবার চেষ্টা কিছুটা সফল হয়েছে। এছাড়া, সামাজিক বনসৃজন (social forestry) প্রকল্পে ভারতের অনেক স্থানে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করে আবহাওয়া নির্মল করার চেষ্টা হয়েছে। উপরন্তু পুরোনো অরণ্যের বদলে নতুন অরণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এইসব অরণ্যের গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে, আর তাই বিক্রী করে কৃষকরা লাভবান হয়।

(4) **নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ ঃ** ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি চরানোর জন্য নির্দিষ্ট পশুচারণভূমি থাকা দরকার। অন্যথায় পশুদের খুরে খুরে ভূমিক্ষয় হবেই। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে চারাগাচের বনভূমিতে আইন করে পশুচারণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া বনভূমি সংরক্ষণে—

(5) পরিত্যক্ত খনি এলাকায় বনভূমি সৃষ্টির কাজে হাত দেওয়া।

(6) অপরিণত গাছ যাতে না কাটা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

(7) কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ।

(8) আইন প্রণয়ন ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও আইন লঙ্ঘনকারীর শাস্তি বিধান।

(9) আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃক্ষছেদন, যাতে করে আশেপাশের গাছের কোনরকম ক্ষতি না হয়, এবং

(10) সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো দরকার। অন্যথায় ব্যথিত কবির মতো আমরা ও আক্ষেপ করব এই বলে— "আমরা সবুজকে হলুদ করি আবার ধুসরকে বলি সজল হতে"—সুনিল গঙ্গোপাধ্যায়।

সামাজিক বনসৃজন (Social Forestry) :

জনগণের সহায়তায় গ্রামাঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের উন্নতির উদ্দেশ্যে বনভূমি সংরক্ষণ ও নতুন বনভূমি স্থাপন করাকে **সামাজিক বনসৃজন** (Social Forestry) বলা হয়।

উদ্দেশ্য ঃ (1) চাহিদা অনুযায়ী নতুন বনভূমি রোপণ ও আদি বনভূমির সংরক্ষণ।

(2) পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে জমি ব্যবহারের ধরনকে উন্নতি করা।

(3) পশুখাদ্যের জোগানকে সুনিশ্চিত করা।

(4) রোপন করা বৃক্ষ থেকে ফল, কাঠ ও জ্বালানী সংগ্রহ করা।

(5) কাগজ, প্লাইউড প্রভৃতি শিল্পে কাঠের জোগান সুনিশ্চিত করা।

(6) গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে তাদের কাজে লাগানো।

(7) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশের উন্নতি সাধন করা, প্রভৃতি।

স্থান ঃ বিদ্যালয় কলেজ প্রাঙ্গন, রাস্তা, রেলপথের দুই পার্শ্ব, পুকুরপাড়, পতিত জমি, শিল্পাঞ্চলের পতিত ফাঁকা জমি প্রভৃতি।

উপযুক্ত বৃক্ষ ঃ বাবলা, মহুয়া, ইউক্যালিপটাস, সোনাঝুরি, নারকেল, তাল, আম, জাম, আমড়া, নিম, পাইন প্রভৃতি।

বর্তমানে ভারতে এই প্রকার বনসৃজনের জনপ্রিয়তা ও ব্যবহার খুবই দ্রুতহারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

3.2 ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূগোল

3.2.1 শক্তি সম্পদ (Power Resources)

❑ ভূমিকা

কাজ করার ক্ষমতাকে বলে শক্তি। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে মানুষ তার কর্মশক্তিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে সম্পাদন করে। যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ হতে এই শক্তি উৎপাদিত হয়, তাকে বলে শক্তি সম্পদ। উদাহরণ হিসেবে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ শক্তির কথা বলা যেতে পারে।

স্বাধীন ভারতে যে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছে তার জন্য দরকার শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য। ভারতের শিল্পায়নের গতিপ্রকৃতি দেশে উত্তোলিত ও বিদেশ থেকে আমদানীকৃত খনিজসম্পদের পরিমাণ, মূল্য ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এদেশের চিরাচরিত গচ্ছিত শক্তিসম্পদের অনেকটা শেষের পথে। যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম। তাই আমরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অচিরাচরিত শক্তির দিকে, যদিও এই শক্তির উন্নয়নে আরো কিছু সময় লাগবে। নীচে ভারতে চিরাচরিত তথা অচিরাচরিত শক্তি নিয়ে আলোচনা করা হল।

❑ পেট্রোলিয়াম (Petroleum) ❑

Petroleum শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Petra' (শিলা) ও 'Oleum' থেকে সৃষ্টি হয়েছে। শিলাস্তর থেকে যে তেল সংগৃহীত হয় তাকে খনিজ তেল (Rock oil or Mineral oil) বলে। বর্তমানে পৃথিবীতে জ্বালানী ও শক্তি সরবরাহকারী খনিজরূপে খনিজ তেলের গুরুত্ব সর্বাধিক। পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি জড়শক্তি খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে পাওয়া যায়। খনিজ তেলের বিশেষ কতগুলো সুবিধা থাকায় ও গৃহস্থলী, শিল্পের কাজে এর ব্যাপক ব্যবহারের জন্য একে তরল সোনা নামে অভিহিত করা হয়। সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং শিল্পের বিস্তৃত পরিধির মধ্যে খনিজ তেলের গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে শুধু আসামের ডিগবয় খনি অঞ্চল থেকে খনিজ তেল উত্তোলিত হত। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে খনিজ তেল উত্তোলন বিস্তার লাভ করে। প্রথম দিকে (1950–51) 2.5 লক্ষ টন অশোধিত তেল উত্তোলিত হয় এবং পেট্রোলিয়াম সামগ্রির চাহিদা ছিল 34 লক্ষ টন। এই উৎপাদন 1996–97 সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় 32.9 মিলিয়ন টন এবং এই উৎপাদনের 61%-ই উপকূলীয় তৈলক্ষেত্রগুলো থেকে উত্তোলিত হয়। 1997–98 সালে 33.86 মিলিয়ন টন তেল উত্তোলিত হয়। ভারতে মোট খনিজ তেলের সঞ্চয় রয়েছে 800 মিলিয়নের কিছুটা কম।

উত্তোলন ঃ ভারতে খনিজ তেল অনুসন্ধান ও উত্তোলন ব্যাপক ও ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় 1956 সালে ONGC স্থাপিত হবার পর থেকে। বর্তমানে এই সংস্থা 'Oil and Natural Gas Corporation' নামেও পরিচিত। এছাড়া ভারত সরকার Burmah Oil Company-র থেকে Share অর্জন করে 1981 সালে Oil India Limited প্রতিষ্ঠা করে যা দেশের পূর্বাঞ্চল ছাড়াও মহানদী অববাহিকা, রাজস্থানের কিয়দংশ ও আন্দামানে তেল অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

গভীর সমুদ্রে 26-টি তৈলবাহী পাললিক বেসিন সহ দেশে 3.14 মিলিয়ন বর্গ কি.মি. তৈলবাহী পাললিক শিলাস্তর রয়েছে। ভারতে টার্সিয়ারী যুগের তৈলবাহী শিলাস্তরগুলো উত্তর-পূর্ব ভারত, গুজরাট, সন্নিহিত পশ্চিম ভারত, কৃষ্ণা ব-দ্বীপ, গোদাবরী উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে অসমানভাবে ছড়িয়ে আছে।

❑ ভারতে পেট্রোলিয়ামের বণ্টন

ভারতের তেল উত্তোলক অঞ্চলকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (1) উত্তর-পূর্ব ভারত (2) পশ্চিম ভারত।

(1) **উত্তর-পূর্ব ভারত ঃ** উত্তর পূর্ব ভারতের প্রধান তৈলক্ষেত্রগুলো হল আসাম ও তার পাশ্ববর্তী অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম।

আসাম ঃ ভারতে সবচেয়ে প্রাচীন তৈল উত্তোলক রাজ্য হল আসাম। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বরাবর উজান (Upper) আসাম এ 320 কি.মি. জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। প্রধান তৈলবাহী শিলাস্তরটি। আসাবের গুরুত্বপূর্ণ তৈল ক্ষেত্রগুলো হল—

(a) **ডিগবয় তৈলক্ষেত্র ঃ** দেশের প্রাচীনতম তৈলক্ষেত্র উজান আসাম (Upper Assam)-এর ডিব্রুগড় জেলার তিপাম (Tipam) পাহাড়ে অবস্থিত। তৈলবাহী স্তরটি প্রায় 13 বর্গকিমি অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত যেখানে 400 থেকে 200 মিটার গভীরতায় তেল পাওয়া যায়। এখানে 800-এর বেশি তৈলকূপ খনন করা হয়েছে। পশ্চিম ভারতে তৈলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হবার আগে ডিগবয় থেকে দেশের 3/4 ভাগ তেল উত্তোলিত হত।

(b) **নাহার কাটিয়া তৈলক্ষেত্র ঃ** এই তৈলক্ষেত্রটি ডিগবয় থেকে 32 কিমি দক্ষিণে অবস্থিত। 1953 সাল থেকে এখানে তৈল উত্তোলন শুরু হয়। 4000–5000 m গভীরতায় তেল পাওয়া যায়া। 60-টি খননীকৃত তৈলকূপের মধ্যে 56-টি থেকে খনিজ তেল উত্তোলিত হচ্ছে ও 4-টি থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এই তৈলক্ষেত্র থেকে বার্ষিক 2.5 মিলিয়ন টন তেল ও 1 মিলিয়ন কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদিত হয়।

(c) **মোরান ও হুগরিজান তৈলক্ষেত্র ঃ** নাহার কাটিয়া থেকে 40 কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত মোরান হুগরিজান তৈলক্ষেত্রটি থেকে 1956 সাল থেকে তেল উত্তোলন শুরু হয়। খননের ফলে প্রমাণিত হয়েছে তৈলবাহী শিলাস্তরটি 3355 মিটার গভীরতায় অবস্থান করছে। 20-টি খননীকৃত তৈল কূপ থেকে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস দুই-ই পাওয়া যায়। আসামে আবিষ্কৃত অন্যান্য তৈলক্ষেত্রগুলো হল গালকি, বদরপুর, বারহোলা ও আঙ্গুরি।

আপেক্ষিকভাবে আসামের তৈলক্ষেত্রগুলো দুর্গম এলাকায় অবস্থিত ও প্রধান চাহিদা অঞ্চল থেকে দূরত্বও বেশি। ডিগবয়, গোহাটি, বঙ্গাইগাও, বারাউনী ও নোমালিগড়-এ অবস্থিত তেল শোধনাগার কেন্দ্র থেকে আসামের খনিজ তেল পরিশোধিত হয়।

অরুণাচল প্রদেশ ঃ এ রাজ্যের তৈলক্ষেত্রগুলো মানাভূম, খারসং এবং চারালিতে অবস্থিত।

ত্রিপুরা ঃ এই রাজ্যে অবস্থিত তৈলক্ষেত্রগুলো হল মামুনডাঙ্গা, বারামুরা, ডেওতামুরা শুভং, মানু, আম্পিবাজার, অমরপুর ডামবুরা।

এছাড়া নাগাল্যাণ্ডেও কিছু তৈলবাহী শিলাস্তর আছে।

পশ্চিম ভারত ঃ এই অচলে তৈলক্ষেত্রগুলো গুজরাট ও আরবসাগরের মুম্বাই হাই ও বাসিনে (Offshore Oil fields) অবস্থিত।

গুজরাট ঃ ONGC এর অনুসন্ধানের ফলে খাম্বাত উপসাগরের তীরে বহু তৈলবাহী শিলাস্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অঞ্চলটির আয়তন প্রায় 15.36 বর্গ কিমি.। প্রধান তৈলবলয়টি সুরাট থেকে আমরেলী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রধান তেল উত্তোলক জেলাগুলো হল কচ্ছ, ভাদোদরা, বারুত, সুরাট, আমেদাবাদ, খেদা, মেহসনা ইত্যাদি। 1991–94 সালে গুজরাট 61 লক্ষ টন অশোধিত তেল উৎপাদন করে যা দেশের মোট তেল উৎপাদনের 20%। গুজরাটের প্রধান তৈলক্ষেত্রগুলো হল—

(a) **আংকেলেশ্বর ঃ** ভাদোদরা থেকে প্রায় 80 কিমি দক্ষিণে অবস্থিত আঙ্কলেশ্বর তৈলক্ষেত্রটি 1958 সালে

আবিষ্কৃত হয়। এই তৈলক্ষেত্রটি একটি উর্ধ্বভঙ্গে অবস্থিত যা 20 কিমি লম্বা ও 4 কিমি প্রশস্ত। 1000–1200 মিটার গভীরতায় তেল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের তেল উত্তোলন ক্ষমতা বার্ষিক 2.8 মিলিয়ন টন। এই তৈলক্ষেত্রটি এতটাই উৎপাদনশীল যে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু একে 'Fountain of Prosperity' বলেছেন।

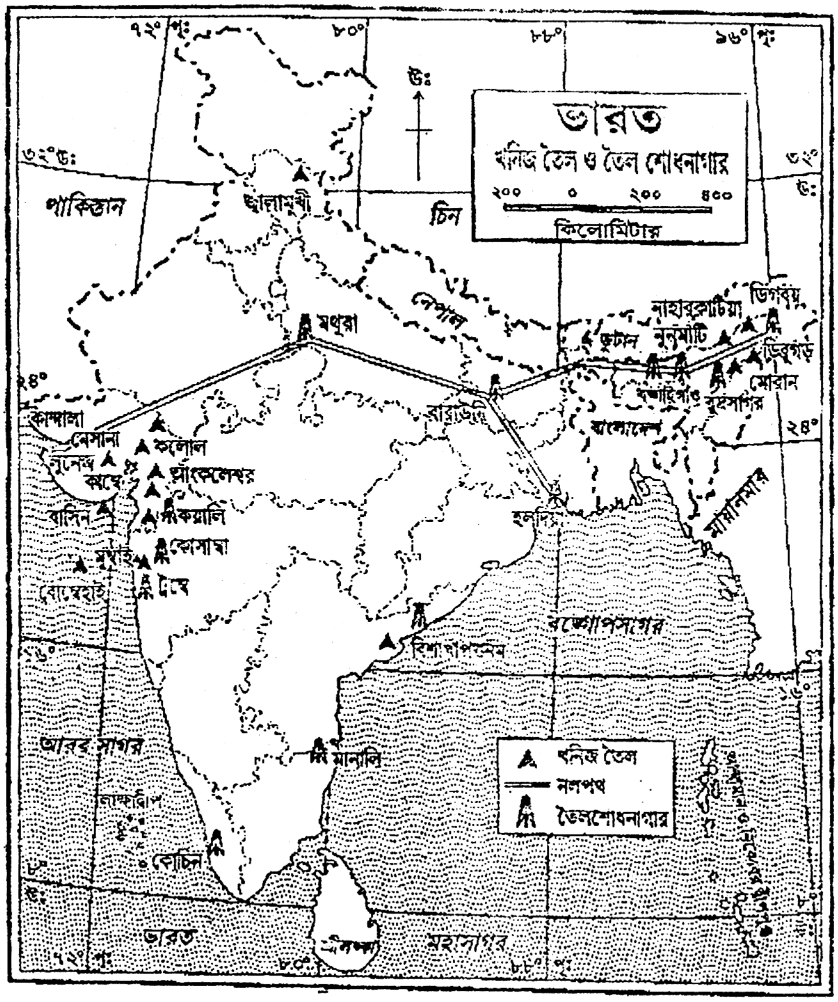

চিত্র 3.42 ঃ ভারতের খনিজ তৈল ও তৈল শোধনাগার

60 টি খননীকৃত তৈলকূপের মধ্যে 50-টি থেকে তেল পাওয়া যায়। এখানকার তেল প্রধানতঃ ট্রম্বে ও কয়ালি শোধনাগার থেকে পরিশোধিত হয়।

2005 সালের 27শে জুলাই মুম্বাই হাই-এর একটি প্ল্যাটফর্ম ও ভেসেলে আগুন লেগে যায়। এর ফলে মুম্বাই হাই এর তেল উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পায়। মুম্বাই হাই-এ যে প্রমাণ ক্ষতি হল তা পূরণ করতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারনা। এই ক্ষতিপূরণের ধাক্কা ভারতে উৎপাদন মারখাবে ও তেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে।

(b) **খাম্বাত বা লুনেজ তৈলক্ষেত্র ঃ** ONGC, 1958 সালে লুনেজে পরীক্ষামূলক তৈলকূপ খনন করে এবং নিশ্চিত যে এখান থেকে বাণিজ্যিকভাবে তেল উত্তোলন সম্ভব। 1959 সালের 4ই সেপ্টেম্বর এখান থেকে তেল

উত্তোলন শুরু হয়। এখান থেকে বার্ষিক 15 লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলে মোট তেল সঞ্চয় রয়েছে প্রায় 3 কোটি টন।

(c) **আমেদাবাদ এবং কলোল তৈলক্ষেত্র ঃ** এই অঞ্চল আমেদাবাদ থেকে 25 কিমি উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই তৈল ক্ষেত্র এবং খাম্বাত বেদিের একাংশে ভারী অশোধিত তেলবাহী শিলাস্তরটি কয়লা স্তরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। প্রধান তেল উত্তোলক অঞ্চলগুলো হল নওয়াগাম, কোসাম্বা, মেহসনা, কাথনা, সানন্দ ইত্যাদি। এছাড়া ওলকাদ, ঢোলকা, কাদি আসজল, ভাদেশর, শোভাসান ইত্যাদি অঞ্চল থেকেও তেল উত্তোলিত হয়।

মুম্বাই দরিয়া তৈল ক্ষেত্র ঃ ONGC দেশের দরিয়া অঞ্চলগুলোতে যথা—কচ্ছ, খাম্বাত, কোঙ্কন, মালাবার এবং করমণ্ডল উপকূল, কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপ এবং সুন্দরবন অঞ্চলে খনি তেল অনুসন্ধানের জন্য ব্যাপক Survey করেছে। এদের মধ্যে বাণিজ্যিক হারে তেল উত্তোলনের জন্য সবচেয়ে বেশি সফলতা পাওয়া গেছে মুম্বাই হাই, বেসিন এবং আলিয়াবেত থেকে।

(a) **মুম্বাই হাই ঃ** তেলের জন্য দরিয়া সমীক্ষার ক্ষেত্রে ONGC-এর সবচেয়ে বড় সফলতা হল 1974 সালে আবিষ্কৃত মুম্বাই হাই। মুম্বাই থেকে 176 কিমি উত্তর পশ্চিমে মহীসোপান অঞ্চলে এই তৈলক্ষেত্রটি অবস্থিত। প্রায় 2500 বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত এখানকার তৈলবাহী শিলাস্তরটি Miocene যুগের এবং এখানে মোট তৈল সঞ্চয় রয়েছে 20 কোটি টনেরও বেশি। এখানে বাণিজ্যিকভাবে তেল উত্তোলন শুরু হয় 1967 সালে। সাগর সম্রাট (Sagar Samrat) নামক ভাসমান জাহাজের সাহায্যে 1400 মিটার গভীরতা থেকে তেল উত্তোলিত হয়। ভারতে তেল উৎনাদনের ক্ষেত্রে মুম্বাই হাই-এর আবিষ্কার বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। এখান থেকে 1991–92 সালে 189 লক্ষ টন তেল উত্তোলিত হয়েছে যা দেশের মোট উৎপাদনের 62%।

(b) **বাসিন ঃ** মুম্বাই হাই-এর দক্ষিণে অবস্থিত সম্প্রতি আবিষ্কৃত এই তৈলক্ষেত্রে সঞ্চিত তেলের পরিমান মুম্বাই হাই থেকেও বেশি। 1900m গভীরতায় অবস্থিত এখানকার তৈলবাহী শিলাস্তর থেকে তেল পাওয়া যায়।

আলিয়াবেত ঃ খাম্বাত উপসাগরের আলিয়াবেত দ্বীপে এই তৈলক্ষেত্রটি অবস্থিত। আশা করা যায় অদুর ভবিষ্যতে অঞ্চলটি থেকে তেল উত্তোলনের কাজ শুরু হবে।

অন্যান্য ক্ষেত্র ঃ এছাড়াও দেশের আরও কিছু স্থানে খনিজ তেল পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল, যেমন— হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর ও পাঞ্জাব।

সারণি

অশোধিত তৈল উৎপাদন, (2002–03)

রাজ্য	উৎপাদন (০০০ টন)	শতকরা হার
অন্ধ্রপ্রদেশ	300	0.93
অরুণাচল	74	0.23
আসাম	4659	14.09
গুজরাত	6,042	18.28
তামিলনাড়ু	395	1.19
মুম্বাই হাই	21,573	65.28
সারা ভারত	33,043	100.00

খনিজ তেল উৎপাদন ঃ 1951 সালে ভারতে মোট খনিজ তেল উত্তোলনের পরিমান যেখানে ছিল 0.27 মিলিয়ন টন মাত্র, 2003–04 সালেতা বৃদ্ধি পেয়ে 33.4 মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে।

সারণি

অশোধিত তৈল উৎপাদনের ধারা (1951–2004)

বর্ষ	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)
1951	0.27
1961	0.51
1971	7.18
1981	14.92
1991–92	30.44
2001–02	32.0
2003–04	33.4

সমস্যা ঃ বিভিন্ন সমস্যার কারণে চাহিদার তুলনায় ভারতে খনিজ তেল উৎপাদনের পরিমাণ বেশ কম। যথা—

(i) **উৎপাদন সীমার আবদ্ধতা ঃ** ভারতে অভ্যন্তরীণ তেলের উৎপাদন বার্ষিক প্রায় ৩০ মিলিয়ন টনের কাছাকাছি আবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

(ii) **খনিজ তেলের আমদানী বিলের দ্রুতবৃদ্ধি ঃ**ভারতে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন খনিজ তেলের চাহিদা মেটাতে সমর্থ নয়। ফলস্বরূপ বিদেশ থেকে তেল আমদানীর জন্য খনিজ তেলের আমদানীর জন্য আমদানী বিল দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের মোট আমদানীর 25% পেট্রোলিয়ামে হয়।

সারণি

তৈল আমদানি

	পরিমাণ (মিলিয়ান টন)	মূল্য কোটি টাকায়
1960–61	0.08	69
1970–71	1.27	139
1980–81	23.54	5264
1990–91	29.36	10,816
2002–03	90.0	85,367
2003–04	99.4	94,520

(iii) খনিজ তেল অনুসন্ধানে উন্নত প্রযুক্তি ও কারিগরীবিদ্যার অভাব ভারতে নতুন তৈলখনি আবিষ্কারে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে।

(iv) 'Ministry of Petroleum and Natural Gas'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের পাললিক তৈলবাহী শিলাস্তরের 50% এখনো সম্পূর্ণভাবে অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। যদিও ভারতে খনিজ তেলের সম্ভাব্যতা বেশি হয়েছে।

(v) বিপুল পরিমানে বিনিয়োগ প্রয়োজন ঃ ভারতে খনিজ তেলের উৎপাদন বাড়াতে হলে বিদেশী বিনিয়োগ খুবই প্রয়োজন। Ministry of Petroleum and Natural Gas-এর রিপোর্ট অনুযায়ী আগামী 15 বছরে E ও P Sector-এর জন্য 50 বিলিয়ন প্রয়োজন।

❑ তৈল শোধনাগার ঃ

অপরিশোধিত খনিজ তেলকে শোধন করার জন্য ভারতে বর্তমানে 14-টি শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে এগুলো হল আসামের (1) ডিগবয়, (2) নুনমাটি, (3) বঙ্গাইগাও, (4) বিহারের বারাউনী, (5) উত্তর প্রদেশের গুজরাটের কয়ালি, (7) মহারাষ্ট্রের ট্রম্বে, (8) বম্বে, (9) কাচি, (10) তামিলনাড়ুর মনোলি, (11) অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম, (12) পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া, (13) কর্নাটকের ম্যাঙ্গালোর, (14) তামিলনাড়ুর নারিমানম হরিয়ানার পানিপথে নতুন তেল শোধনাগারের কার্য চলছে।

14-টি শোধনাগারের মোট তেল শোধনের ক্ষমতা 61.55 মিলিয়ন টন। ভারতের বৃহত্তম তেল শোধনাগার হল কয়ালি যার শোধন ক্ষমতা 9.50 মিলিয়ন টন।

❑ কয়লা (Coal) ❑

কয়লা উৎপাদনে ভারতের স্থান তৃতীয়। 2003–04 সালে দেশে 389.13 মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়। ভারতের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় 20 হাজার কোটি মেট্রিক টন। কয়লার মজুত ভাণ্ডার অনুসারে ভারতের স্থান ষষ্ঠ। ভারতে অধিকাংশ কয়লাই বিটুমিনাস জাতীয়। ভূ-তাত্ত্বিক যুগ অনুসারে ভারতীয় কয়লা 2-টি শ্রেণীতে বিভক্ত— (A) **গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লা** (পারমিয়ান Permian উপযুগ), (B) **টার্সিয়ারী যুগের কয়লা** (ইয়োসিন-মায়োসিন, Eocene-Miocene)

(A) **গণ্ডোয়ানা (Gondwana) যুগের কয়লা ঃ** গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লা উন্নত মানের। দেশের প্রায় 98% কয়লা এই যুগের দামুদা (Damuda) শিলাস্তর থেকে পাওয়া যায়। অন্ধ্রপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও সিকিমে এই কয়লা পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে ঝাড়খণ্ড পশ্চিমবঙ্গের দামোদর, উড়িষ্যা-ছত্তিশগড়ের মহানদী, মহারাষ্ট্র-মধ্যপ্রদেশের গোদাবরী ও ওয়ার্ধা এবং ঝাড়খণ্ড-মধ্যপ্রদেশের শোন অববাহিকা অঞ্চল গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লা উত্তোলনের জন্য প্রসিদ্ধ।

ঝাড়খণ্ড ঃ কয়লার সঞ্চয় (32%) ও উৎপাদন (24.36%) দুদিক থেকেই ঝাড়খণ্ড ভারতের অগ্রনী রাজ্য। এই রাজ্যে 21টি কয়লাখনি আছে যার মধ্যে ধানবাদে 3-টি হাজারিবাগে 7-টি, পালামৌতে 3-টি ও ডুমকা জেলায় 3-টি কয়লাখনি আছে। এদের মধ্যে ঝরিয়া, পূর্ব পশ্চিম বোকারো, গিরিডি, উত্তর ও দক্ষিণ করণপুরা, রামগড়, ঔরাঙ্গ, হুতার ও ডালটনাঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ কয়লাখনি অঞ্চল। (চিত্র 3.63)।

(a) ঝাড়খণ্ডের বৃহত্তম কয়লা উৎপাদক অঞ্চল হল ধানবাদ জেলার ঝরিয়া যা প্রায় 453 বর্গকিমি অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। এখানে কার্যকরী কয়লার 18টি স্তর রয়েছে। নীচের থেকে শুরু করে 1–7 ক্রমিক পর্যন্ত স্তরকে (Seam) মুরহিডি বা গোলোকডি পর্যায় বলে। যেখানে নীচুমানের কয়লা পাওয়া যায়। 8–12 ক্রমিক কয়লা স্তরে (গরিয়া বা নর্দকারকি অবস্থা) উন্নত মানের কোকিং কয়লা পাওয়া যায়। 13–15 ক্রমিক কয়লা স্তরে (জিয়ালগড়

বা বারারি অবস্থা) সবচেয়ে উন্নতমানের কয়লা পাওয়া যায়। ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত কয়লা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে ঝরিয়ার বরাকর কয়লাক্ষেত্র। এই কয়লা জামসেদপুর ও আসানসোলের ইস্পাত কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এই কয়লায় 1.38% জলীয়বাষ্প, 21.5% উদ্বায়ী পদার্থ, 60.4% অঙ্গার, 14.95% ছাই

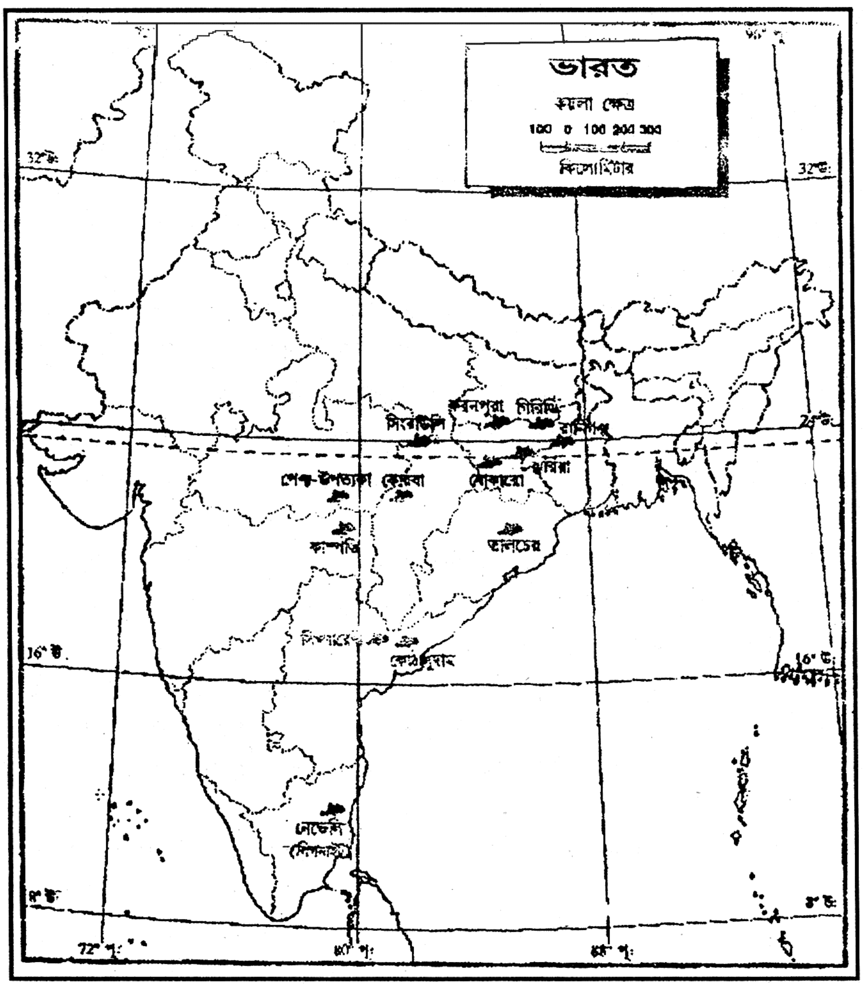

চিত্র 3.43 ঃ ভারতের কয়লা ক্ষেত্র

থাকে। সারা ভারতে কোকিং কয়লা সঞ্চয়ের 90% ঝরিয়ায় সঞ্চিত ও ভারতে ধাতু নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কোকিং কয়লার প্রধান কেন্দ্র ঝরিয়া। সুদামডি ও মানডি-তে কয়লা ধৌত কেন্দ্র আছে এবং চাহিদা অঞ্চলে এই কলয়া পরিবাহিত হয় পূবল রেলপথের মাধ্যমে।

(b) হাজারিবাগ জেলার বোকারো কয়লাক্ষেত্রটি ঝরিয়া থেকে 32 কিমি পশ্চিমে অবস্থিত। বোকারো নদী উপত্যকার সংকীর্ণ বলয়ে এই অঞ্চলটি অবস্থিত ও লুস্য পাহাড় এই অঞ্চলকে 2-টি ভাগে ভাগ করেছে। 207 বর্গকিমি জুড়ে বিস্তৃত পূর্ব বোকারো কয়লাক্ষেত্রের 29টি স্তর আছে। সবচেয়ে ওপরের স্তরকে জরঙ্গান্তি পর্যায় বলে (7.6 m পুরু)। কারগাল স্তর ভারতের পুরুতম স্তর (36.6 m) উন্নতমানের কোকিং কয়লা পাওয়া যায়।

পশ্চিম বোকারোতে 23-টি স্তর আছে যার মধ্যে 8.13 ক্রমিক স্তরে কোকিং কয়লা পাওয়া যায়। এখানকার তেনহাকুজু কয়লাস্তর 10.65 m পুরু। বোকারোর কয়লায় .82% জলীয়বাষ্প, 25.56% উদ্বায়ী পদার্থ, 19.38% ছাই, 54.24% অঙ্গার আছে। বোকারোতে 5186 মিলিয়ন টন কয়লার সঞ্চয় আছে।

(c) হাজারিবাগ জেলার গিরিডি বা কারহার বারি কয়লা ক্ষেত্রটিতে মোট 28m পুরুত্ব সহ 20-টি স্তর আছে। নিম্ন গিরিডি কয়লাস্তর (3–7.5m পুরু) থেকে ভারতের ধাতু নিষ্কাশনের সবচেয়ে উন্নতমানের কোকিং কয়লা পাওয়া যায়। সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ 17.3 মিলিয়ন টন।

(d) করণপুরা কয়লাক্ষেত্র 2 ভাগে বিভক্ত। উত্তর ও দক্ষিণ করণপুরা। ঝাড়খণ্ডের তৃতীয় বৃহত্তম কয়লা উৎপাদক অঞ্চল এটি। কয়লার স্তর 22m পুরু। কিছু স্তর থেকে কোকিং কয়লা পাওয়া যায়। দঃ করণপুরার তারগড়া স্তর থেকে কোকিং কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লার 27% উদ্বায়ী পদার্থ, 64.5% অঙ্গার ও 8.5% ছাই থাকে। কয়লার সঞ্চয় 19.253 মিলিয়ন টন।

(e) বোকারো থেকে 9 কিমি দূরে অবস্থিত রামগড় কয়লা ক্ষেত্রটির মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ 971 মিলিয়ন টন। প্রায় 98 বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত এখানে 22-টি কয়লার স্তর রয়েছে যার মধ্যে 4-টি স্তরের প্রত্যেকটির পুরুত্ব 8 মিটার। এখানকার কয়লার অধিক পরিমাণ ছাই রয়েছে।

(f) পালামৌ জেলার ঔরঙ্গা কয়লাক্ষেত্রটিতে 13 মিটার পুরুত্ব বিশিষ্ট 1টি স্তর রয়েছে। 10.35% জলীয় বাষ্প, 26.91% উদ্বায়ী পদার্থ, 26.43% অঙ্গার, 35.41% ছাইযুক্ত। এখানকার কয়লা নীচুমানের। প্রধানতঃ ইটও সিমেন্ট তৈরিতে এখানকার কয়লা ব্যবহৃত হয়।

(g) পালামৌ জেলার হুতার কয়লা ক্ষেত্রটিতে 5টি কয়লা স্তর রয়েছে। এগুলো বেশিরভাগই পাতলা কিন্তু কোথায়ও কোথাও 4 মিটার পুরু। এখানকার কয়লায় 31.4% উদ্বায়ী পদার্থ, 51.8% অঙ্গার ও 16.8% ছাই। বেশিরভাগ কয়লা নীচুমানের।

(h) পালামৌ জেলার ডালটনগঞ্জও কয়লাক্ষেত্র। এটিতে 14-টি স্তর আছে যার পুরুত্ব 15cm. – 1.5cm.। এখানকার কয়লা উপ-অ্যানথ্রাসাইট প্রকৃতির। এখানে মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ 84 মিলিয়ন টন।

(i) ডুমকা জেলায় অবস্থিত দেওগড় কয়লাক্ষেত্রটি 5টি স্তরে বিভক্ত। এখানে বেশি ছাইযুক্ত নীচুমানের কয়লা পাওয়া যায়।

(ii) রাজমহল কয়লাক্ষেত্রটি রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ 1913 মিলিয়ন টন ও নীচুমানের।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ পশ্চিমবঙ্গে মোট সঞ্চিত কয়লার 13.25% সঞ্চিত রয়েছে এবং মোট উৎপাদনের 6.49% এখানে উৎপন্ন হয়। বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় কয়লা পাওয়া যায়।

বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তে অবস্থিত রানীগঞ্জের কয়লাক্ষেত্রটি কলকাতা থেকে 183.5 কিমি উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে 2টি কয়লাবাহী স্তর (বরাকর ও রানীগঞ্জ) রয়েছে যেখান থেকে উন্নতমানের কোকিং কয়লা পাওয়া যায়। নীচের গঠনে (বরাকর) 7টি কয়লা স্তর রয়েছে ও ওপরের গঠনে (রানীগঞ্জ) 9টি স্তর আছে।

রানীগঞ্জের কয়লায় 2.81% জলীয় বাষ্প, 33.24% উদ্বায়ী পদার্থ, 54.75% অঙ্গার ও 15.04% ছাই আছে। এখানে 548 মিলিয়ন কোকিং কয়লার সঞ্চয় রয়েছে। রেল চালনা, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে (ব্যান্ডেল, দুর্গাপুর, নিউ কোশিপুর, মালাজোর, গুরাপুর, দিশারগড়) এখানকার কয়লা ব্যবহৃত হয়। জামডোমা ও লোদনাতে 2-টি কয়লা ধৌতকেন্দ্র আছে।

দার্জিলিং কয়লাক্ষেত্রটি বহিঃহিমালয়ে অবস্থিত এবং পঙ্কওয়ালি ও ডার্লিং-এর মাঝে প্রায় 48 কিমি স্থান জুড়ে অবস্থিত। কয়লাস্তরের পুরুত্ব .61–3.4m। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স এলাকায় কয়লা পাওয়া যায়।

ওড়িশা ঃ দেশের মোট সঞ্চিত কয়লার 24.69% ও উৎপাদনের 13.47% কয়লা এই রাজ্যে উৎপাদিত হয়। বেশিরভাগ কয়লাখনি ঢেংকানল, সম্বলপুর ও সুন্দরগড় জেলায় অবস্থিত।

প্রায় 578 বর্গ কিমি অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত তালচের কয়লাক্ষেত্রটি ঢেংকানল ও সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত। সঞ্চয়ের দিক থেকে এই ক্ষেত্রটি দ্বিতীয়, রানীগঞ্জের পরে। এখানে 4টি কয়লার স্তর দেখা যায় 60cm.–8.72m পুরুত্ব বিশিষ্ট। এখানকার কয়লায় 2–13% জলীয় বাষ্প, 28–35% উদ্বীয় পদার্থ, 33–56% অঙ্গার ও 11–25% ছাই থাকে। এখানকার কয়লা প্রধানতঃ সার শিল্প ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

ইব নদীর কয়লাক্ষেত্রটি প্রায় 512 বর্গ কিমি. জুড়ে বিস্তৃত। এখানে মোট 1.754 মিলিয়ন টন কয়লা সঞ্চিত রয়েছে ও নীচুমানের কয়লা পাওয়া যায়।

ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ ঃ দেশের মোট সঞ্চিত কয়লার 22.71% কয়লা এখানে সঞ্চিত রয়েছে ও মোট উৎপাদনের 29.95% উৎপাদিত হয়। সঞ্চয়ের দিক থেকে তৃতীয় স্থানাধিকারী ও উৎপাদনের দিক থেকে প্রথম স্থানাধিকারী। কয়লাখনিগুলো রেওয়া, রায়গড়, ছিন্দওয়ারা, বিলাসপুর, সরগুজা, নরসিংহপুর ও বেতুল জেলায় অবস্থিত।

(a) **সিঙ্গারাউলী ঃ** কয়লাক্ষেত্রটিতে 9207 মিলিয়ন টন কয়লা সঞ্চিত রয়েছে। এটি মধ্যপ্রদেশের বৃহত্তম কয়লাক্ষেত্র। এখানে ঝিনগুরডা, পানিপাহাড়ি, খাদিয়া ও তুরা নামক কয়লা স্তর পাওয়া যায়। ঝিনগুরডা স্তরটি 131m পুরু যা ভারতে পুরুতম স্তর। এখানে কয়লায় 8.36% জলীয় বাষ্প, 26.42–32.22 উদ্বায়ী পদার্থ, 42.22% অঙ্গার, 17–17.08% ছাই রয়েছে। তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে এখানকার কয়লা ব্যবহৃত হয়।

(b) বিলাসপুর জেলার কোরবা কয়লাক্ষেত্রটি 2টি স্তরে বিভক্ত যা 21.33–45.72m পুরু। এখানকার কয়লা কোরবা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়।

(c) ছিন্দওয়াড়া জেলার পেঞ্চ কানহান তাওয়া কয়লাক্ষেত্রটি 1956 মিলিয়ন টন কয়লা সঞ্চিত রয়েছে।

(d) শাহডোল জেলার সোহাগপুর ক্ষেত্রটির কয়লাস্তরগুলো 3–5m পুরু।

(e) সরগুজা জেলার বিশ্রামপুর কয়লাক্ষেত্রটির 4-টি কয়লা স্তর রয়েছে যা 30cm–1.8m পুরু।

(f) হাম্‌দে-আরন্দে ক্ষেত্রটিতে মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমান 4321মি. টন। এখানকার কয়লার গড় পুরুত্ব 2.5–7m।

(g) সুরগুজা জেলার চিরিমিরি ক্ষেত্রটিতে 4টি স্তর আছে যার মধ্যে 3টি স্তর থেকে উন্নতমানের কয়লা পাওয়া যায়। মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ 362 মিলিয়ান টন।

(h) বিশ্রামপুর কয়লাখনির দক্ষিণে লক্ষ্মণপুর কয়লাখনিটি অবস্থিত। 1–3m পুরুত্বযুক্ত অ-কোকিং কয়লা পাওয়া যায়।

(i) সরগুজা জেলার ঝিলিমিলি ক্ষেত্রটি সোহাগপুর ক্ষেত্রের বিস্তৃত অংশ। এখানে 5টি কয়লার স্তর আছে। বেশি পরিমাণ ছাইযুক্ত কয়লা অ-কোকিং প্রকৃতির।

(j) জোহিলা নদী উপত্যকায় অবস্থিত জোহিলা কয়লা ক্ষেত্রটি 37–76 বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। মোট 311 মিলিয়ন টন কয়লা সঞ্চিত আছে।

(k) সরগুজা জেলার সোনহাট ক্ষেত্রটিতে 35 মিলিয়ন টন উন্নত মানের, 37 মিলিয়ন টন দ্বিতীয় মানের এবং 22 মিলিয়ন টন তৃতীয় মানের কয়লা পাওয়া যায়।

(l) উমারিয়া কয়লাক্ষেত্রটিতে 6টি কয়লার স্তর আছে যার মধ্যে 4টি গুরুত্বপূর্ণ।

(m) সরগুজা জেলার উত্তর-পূর্বাংশে তাতাপানি রামকোলা কয়লাক্ষেত্রটি অবস্থিত। এখানকার কয়লায় 10.9% জলীয়বাষ্প, 36.46% উদ্বায়ী পদার্থ, 44.06% অঙ্গার, 8.5% ছাই আছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ 15646 মিলিয়ন টন কয়লা সঞ্চিত আছে। বার্ষিক 30/27% মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদিত হয়। গোদাবরী নদী উপত্যকায় গুরুত্বপূর্ণ কয়লাখনি যেমন— অনলারগাঁও, কোন্ডিকা পাহাড়, শান্তি, তেন্দুর, কোঠা, ভেঙ্কুটাপুর, কোঠাগুডাম, তাতাপল্লী, রাণিগুডাম, কারলাপল্লী, চিনুর সেন্দ্রাপল্লীতে অবস্থিত। এই কয়লা সার শিল্প ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়।

(a) হায়দ্রাবাদ থেকে 185 কি.মি. পূর্বে অবস্থিত সিঙ্গারেলী ক্ষেত্রটি অন্ধ্রপ্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়লাখনি। এখানে 4টি কয়লার স্তর আছে। এখানকার কয়লায় 7.6% জলীয়বাষ্প, 25.25% উদ্বায়ী পদার্থ, 10.65% ছাই এবং 56.5% অঙ্গার থাকে। এখানে বেশিরভাগ কোকিং কয়লা পাওয়া যায়।

(b) কোটাগুডাম কয়লাক্ষেত্রটিতে 9টি কয়লার স্তর আছে।

মহারাষ্ট্র ঃ এই রাজ্যে দেশের মোট সঞ্চয়ের 3.44% কয়লা সঞ্চিত আছে। মোট উৎপাদনের 9.29% চন্দ্রপুর, নাগপুর জেলায় সঞ্চিত রয়েছে।

(a) চন্দ্রপুর জেলার ওয়ার্ধা উপত্যকায় 4240 মে.টন নিম্ন মানের কয়লা আছে। এই কয়লায় 9.78%–11% জলীয়বাষ্প, 29.60–35.35% উদ্বায়ী পদার্থ, 41.12%–80.50% অঙ্গার ও 14.15–18.06% ছাই থাকে।

(b) নাগপুর জেলার কাম্পটী কয়লাক্ষেত্রে 1372 মিলিয়ন টন কয়লা সঞ্চিত আছে। কয়লায় 7.84% জলীয় বাষ্প, 30.90% উদ্বায়ী পদার্থ, 38.33% অঙ্গার ও 22.72% ছাই আছে।

(3) টার্সিয়ারী (Tertiary) কয়লাক্ষেত্র ঃ

(1) **মেঘালয় ও আসাম ঃ** উত্তরপূর্ব ভারতের মেঘায়ল ও আসাম টার্সিয়ারী কয়লা উত্তোলনের জন্য বিখ্যাত। মেঘালয়ে 46 কোটি ও আসামে 30 কোটি মেট্রিক টন কয়লা সঞ্চিত আছে।

দুই রাজ্যের কয়লা উত্তোলক অঞ্চলগুলো হল (i) গারো পাহাড় অঞ্চলে কারাইহাড়ি, ওয়াইমং, (ii) জয়ন্তিয়া ও খায়িয়া পাহাড় অঞ্চলে চেরাপুঞ্জি, মওলং, লাকসা, লংগ্রিন, সালুঙ্গা, (iii) শীবসাগর জেলার নাজিরা, (iv) ডিব্রুগড় জেলার মাকুম, (v) লাখিমপুর জেলার জয়পুর প্রভৃতি।

(2) **তামিলনাডু ঃ** নেভেলি লিগনাইট কয়লা উত্তোলনের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে প্রায় 200 কোটি মেট্রিক টন কয়লা সঞ্চিত আছে। দক্ষিণ আর্কট জেলার নেভেলী ছাড়া তিরুচিরাপল্লীর কুলাডুর ও কড়াইকুড়ি অঞ্চলে প্রচুর লিগনাইট পাওয়া যায়।

এছাড়া কেরালা রাজ্যে ভারকালা ও কুইনল অঞ্চল, রাজস্থান পালানা, জম্মু ও কাশ্মীরে রইহতান, লানিয়ালাব, নিছোমা, অরুনাচল প্রদেশে অ্যাবক, ডাফলা, আকা পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়।

❑ কয়লার সমস্যা (Problems of Coal)

ভারতে কয়লা উৎপাদনের প্রধান সমস্যাগুলো হল ঃ

(a) **নিম্নমানের কয়লা ঃ** ভারতীয় বেশিরভাগ কয়লা অ-কোকিং যা ধাতু নিষ্কাশনের জন্য অনুপযোগী। কয়লার ছাই এর করিমাণ বেশি, (20–35%)। টার্সিয়ারী কয়লায় ছাই-এর পরিমাণ কম থাকলেও সালফারের পরিমাণ বেশি থাকে (2–7%)। তবে বর্তমানে কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এই সব অবিশুদ্ধ পদার্থ থেকে কয়লা পরিষ্কার করা হচ্ছে।

(b) **অসম বন্টন ঃ** ভারতের বেশিরভাগ কয়লা সঞ্চিত আছে, দেশের উত্তরপূর্বাংশে ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড় রাজ্যে, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে। দেশের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ কম বা নেই বললেই চলে ও থাকলেও তা নিম্ন মানের। এই অভাবগ্রস্ত এলাকায় কয়লা পরিবহন ব্যয়বহুল। এর ফলে দেশের নানা স্থানে অসম শিল্পোন্নতি দেখা যায়।

(c) **অনুন্নত পরিবহনব্যবস্থা ঃ** ভারতের 90% কয়লা রেলপথে পরিবাহিত হয়। দেশের বিভিন্ন অংশে রেলপথের সুবিধার অভাব, গেজের বিভিন্নতা, কয়লা পরিবহনে ওয়াগনের অপর্যাপ্ততা, রেলের ধীরগতি, কয়লা চুরি ইত্যাদি কয়লা উৎপাদনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কয়লাখনির খাদের চারপাশে ছাই জমা করার ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(d) **প্রাচীন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ঃ** ভারতের কয়লাখনির কলাকৌশলগুলো পুরানো ও সেকেলে, এখানে বেশির ভাগ কাজ মনুষ্যশ্রমনির্ভর। এর ফলে কয়লার বার্ষিক উৎপাদন কম হয় এবং উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়। অত্যাধুনিক কৌশল ও যন্ত্র পাতির অভাব, বিস্ফোরকের অপর্যাপ্ততা, শ্রমিক সমস্যা, পাবলিক সেক্টর ব্যবস্থাপনের অভাব—এই সব কারণে কয়লা উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। অনেক কয়লাখনি অসুরক্ষিত ও দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে পড়েছে।

(c) কয়লা খনিগুলোর অন্যতম অসুবিধা হল বিদ্যুৎশক্তির অভাব, বিশেষ করে DVC অঞ্চলে। এর ফলে খনির কাজে ক্ষতি হয়।

(d) **পরিবেশ দূষণ ঃ** কয়লা উৎপাদন ও ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ব্যাপক অবনমন ঘটে। উন্মুক্ত কয়লা খনি সম্পূর্ণ অঞ্চলকে ধ্বংস করে বৃক্ষ প্রান্তরে পরিণত করে। খনি অঞ্চলে কয়লার গুঁড়ো খনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে কয়লা দহনের ফলে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস পরিবেশে মিশে যায়। পরিবেশে দূষণের বিরুধে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া খুব ব্যয়বহুল।

(e) **কয়লাখনির পশ্চাদপসারণ ঃ** কয়লাখনির অপর সমস্যা হল বিদ্যুৎশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা, বিশেষ করে NTPC ও State Electricity Board-র ওপর। এছাড়া সার সিমেন্ট শিল্প, রেলব্যবস্থায় কয়লার চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। রেলপথ বিদ্যুতায়ন ও ডিজেল চালিত হওয়ায় কয়লার চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে। রান্নার গ্যাসের জন্য প্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহস্থলীর জ্বালানীর ক্ষেত্রে কয়লার চাহিদা কমে গেছে।

(f) **কয়লার অপচয় ঃ** ভারতের কয়লাখনিগুলোতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অভাবের ফলে প্রায়ই ধস নামে ও প্রচুর পরিমাণে কয়লার অপচয় ঘটে। আগুন নেভানোর আধুনিক ব্যবস্থার অভাবের ফলে খনিতে আগুন লাগলে কয়লা পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। খনি অঞ্চলে হঠাৎ বন্যা, খনির ছাদ ভেঙে পড়া, বিষাক্ত গ্যাসের অবস্থান, অ-কার্যকরী কয়লার অবস্থান— ইত্যাদি কারণে কয়লা উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

কয়লা সংরক্ষণ ঃ কয়লা ক্ষয়িষ্ণু ও অপুনর্ভব সম্পদ। ব্যবহারের ফলে কয়লা পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে যায়।; তাকে আর পুনরায় ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং কয়লার অপচয় নিবারণ করা ও কয়লা সংরক্ষণের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। প্রবহমান উন্নয়নের কথা চিন্তা করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কয়লা সংরক্ষণের বিশেষ যুক্তি আছে।

কয়লার অপচয় নিবারণ করার ব্যবস্থা করার ফলে কিছু পরিমাণ সংরক্ষণ করা যায়। তাই কয়লার অপচয় নিবারণ ও সংরক্ষণের নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা চিন্তা ভাবনা করা যায় ঃ

(i) কয়লা খনি থেকে তোলার সময় নানারকম ত্রুটি থাকার দরুন বেশ কিছু কয়লা নষ্ট হয়। আধুনিক প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক পদ্ধতি বিনিযোগ করে এই অপচয় নিবারণ করা যায়।

(ii) কয়লাকে সোজাসুজি পুড়িয়ে ব্যবহার করলে অনেক সময় কয়লার অপচয় হয়, কিন্তু তার পরিবর্তে কয়লার সাহায্যে তাপবিদ্যুৎ তৈরি করে তার শক্তিকে কাজে লাগালে কয়লার অপচয় কম হয়।

(iii) কয়লাকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করলে যেমন একদিকে তাপবিদ্যুৎ পাওয়া যায় তেমনি তাপবিদ্যুৎ রূপান্তর করার সময় যেসব উপজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেগুলোও কাজে আসে। ফলে কয়লা সম্পদের পুনর্ব্যবহার সম্ভব হয়। এর ফলে জ্বালানীর সাশ্রয় হয় ও উপজাতদ্রব্যগুলো পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কয়লা সম্পদের অপচয় বন্ধ হয়।

(iv) খনি থেকে কয়লা তোলার সময় ঠিকমতো যত্ন না নিলে বহু কয়লা টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায় ও গুড়ো হয়। এই গুড়ো কয়লার চাহিদা কম, শিল্পের কাজে ব্যবহৃত হয় না। গৃহস্থলীর কাজ ছাড়া অন্য কিভাবে ব্যবহার করলে সেগুলোর সাশ্রয় হয় তা দেখা দরকার। আধুনিক পদ্ধতি বিনিয়োগের ফলে কয়লার অপচয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন আইন করে যেমন— (The Coal Mines Conservation and Development Act, 1974) কয়লার অপচয় নিবারণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা হচ্ছে।

● **প্রাকৃতিক গ্যাস ঃ** প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেলের একটি অঙ্গ। খনিজ তৈলকূপেই এর অবস্থান। খনিজ তেল উত্তোলনের সময় প্রথমে এই গ্যাস বেরিয়ে আসে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে তৈলকূপ থেকে শুধুমাত্র স্বাভাবিক গ্যাসই পাওয়া যায়, তেল পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে খনি থেকে তেল সরে গিয়ে অন্যখানে অবস্থান করে।

ব্যবহার ঃ বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক গ্যাস শক্তির একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখতে, বিভিন্ন শিল্পের জ্বালানি কার্যে, রন্ধন কার্যে ও রাস্তাঘাট আলোকিত করতে স্বাভাবিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম রবার, কীটনাশক পদার্থ, প্লাস্টিক রঙ, সার ও ওষুধ, রবার, টায়ার ও কালি তৈরীতে এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারেও এই গ্যাসের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড [The Gas Authority of India Limited (GAIL)] ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং এদেশের স্বাভাবিক গ্যাস উত্তোলন, পরিবহণ ও বাজারজাত করার সব রকমের কাজ পরিচালনা করে। নীচের সারণিতে ভারতবর্ষের গ্যাস উৎপাদক অঞ্চলগুলির একটি চিত্র তুলে ধরা হল। অঞ্চল-ভিত্তিক স্বাভাবিক গ্যাসের উৎপাদন (ব্যবহার) 2002–03।

রাজ্য/এলাকা	উৎপাদন মিলিয়ান কিউবিক মিটার	ভারতের মোট উৎপাদন % হার	মূল্য কোটি টাকায়
1. মুম্বাই	21,742	72.55	6,522.6
2. গুজরাত	3,324	11.09	997.2
3. অন্ধ্রপ্রদেশ	2,019	6.74	605.7
4. আসাম	1,897	6.33	341.5
5. ত্রিপুরা	446	1.49	80.2
6. তামিলনাড়ু	379	1.26	113.7
7. রাজস্থান	161	0.54	48.3
8. অরুণাচলপ্রদেশ	1		
ভারত	**29,969**	**100.00**	**8709.4**
Source : Data computed from Statistical Abstract, India, 2003, p.7			

ভারতে স্বাভাবিক গ্যাসের উৎপাদন 0.17 (1961 সাল) বিলিয়ান কিউবিক মিটার (BCM) থেকে 29.97 বিলিয়ান কিউবিক মিটারে পৌঁছেছে (2002–03 সাল)। বস্তুতপক্ষে, 1985 সালের পর গ্যাস উৎপাদনের দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে।

ভারতে গ্যাস উৎপাদন (B.C.M.)

বছর গ্যাস উৎপাদন	1960–61 0.017	1970–71 0.076	1980–81 0.2	1990–91 12.87	1991-92 12.08
বছর গ্যাস উৎপাদন	1993–94 16.41	1994–95 17.34	1996–97 21.26	1997–98 23.17	1998–99 25.71
বছর গ্যাস উৎপাদন	1999-00 26.88	2000-01 27.86	2001-02 28.04	2002-03 29.97	
উৎস (i) Ministry of Petroleum and Natural Gas, (ii) Statistical Abstract, India, 2003,p. 72					

1988-89 সালে জয়সালমীর অববাহিকার টানোট-এ গ্যাস আবিস্কৃত হয়েছিল। 1988 সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাউথ বেসিন গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদন শুরু হয়েছিল। 1989-90 সালে গ্যাসবাহী ভূতাত্ত্বিক গঠন তামিলনাড়ুর আড়িযাক্যমঙ্গলম, গুজরাটের আনদাদা, আসামের খোভাঘাট, অন্ধ্রপ্রদেশের লিঙ্গলা, মুম্বাই দরিয়া, কচ্ছ দরিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছিল। 1997 সালে আন্দামানে এক সমীক্ষায় 1700 বিলিয়ান কিউবিক ফিট গ্যাসের সঞ্চয় আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দেশের আগামী 30 বছরের চাহিদা মেটাতে পারে।

কৃষ্মা-গোদাবরী দরিয়ার অববাহিকায় রিয়ালেন্স শিল্পগোষ্ঠী কর্তৃক গ্যাসের আবিস্কারকে 2000 সালের গ্যাস আবিস্কারের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে বিশ্ব রেকর্ড বলা চলে। এখানে 14 ট্রিলিয়ান কিউবিক ফিট গ্যাস সঞ্চিত থাকে। এই গ্যাস ক্ষেত্রটি বিশাখাপত্তনম-এর সমুদ্র থেকে 200 কিমি দূরে। ক্ষেত্রটি 200,000 বর্গ কি.মি. জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এই একটি ক্ষেত্র থেকে দৈনিক 60 থেকে 80 মিলিয়ান কিউবিক মিটার গ্যাস পাওয়া যাবে।

2005 সালের জুন মাসে ONGC কৃষ্মা-গোদাবরী অববাহিকার অগভীর উপকূলে অপর একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কার করেছে। এই দুটি গ্যাস ক্ষেত্রের আবিস্কার দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে এবং কৃষ্মা-গোদাবরী অববাহিকার অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনবে।

2004 সালের জুন মাসে রিলায়েন্স শিল্প গোষ্ঠী উড়িষ্যা উপকূলে এক গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কার করেছে। এখানকার সঞ্চয়ের পরিমান 4 থেকে 5 ট্রিলিয়ান কিউ ফিট। রাজস্থানে বারমের জেলায় 2003 সালে গ্যাস আবিস্কৃত হয়েছে। যখন উৎপাদন শুরু হবে, তখন এখান থেকে প্রতিদিন 7.3 মিলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট গ্যাস পাওয়া যাবে। কচ্ছ ও খাম্বাত উপসাগরে ও গ্যাস পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

● **জলবিদ্যুৎ (Hydel power) ঃ**

জলের গতিবেগ বা জলস্রোতের সাহায্যে ডায়নামো ঘুরিয়ে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়, তাকে জলবিদ্যুৎ বলে। কয়লা ও খনিজ তেল হল গচ্ছিত সম্পদ, একদিন না একদিন তা নিঃশেষিত হয়ে যাবে। কিন্তু জলবিদ্যুৎ হল অফুরন্ত শক্তির উৎস। এটি কোনদিনও শেষ হয়ে যাবে না।

ভারতে জলবিদুৎ শক্তি ঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের হার বিভিন্ন রকম। পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে উৎপন্ন পশ্চিমবাহিনী নদীগুলো থেকে 43 লক্ষ কিলোওয়াট (k.w.), পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ববাহিনী নদীগুলো থেকে 86 লক্ষ কিলোওয়াট (k.w.), মধ্যভারতের নদীগুলো থেকে 43 লক্ষ কিলোওয়াট (k.w.), গঙ্গা অববাহিকা থেকে 48 লক্ষ কিলোওয়াট (k.w.), ব্রহ্মপুত্রসহ পূর্ব ভারতের নদীগুলো থেকে 125 লক্ষ কিলোওয়াট (k.w.), বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ অসম জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য

দায়ী। কারণ ভারতে সম্ভাব্য বা সুপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ হল 4.1 কোটি কিলোওয়াট (k.w.)। এই প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তির 60% সঞ্চিত রয়েছে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে 20% দক্ষিণ ভারতের পূর্ববাহিনী নদীগুলোতে, আর 20% মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমবাহিনী নদীগুলোতে।

ভারতের সম্ভাব্য জলবিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ

নদী অববাহিকা	জলবিদ্যুৎ শক্তি (%)	জলবিদ্যুৎ শক্তির পরিমান কোটি (kww)
উত্তর পূর্ব ভারতের নদ অববাহিকা (ব্রহ্মপুত্র)	29.9	1.25
উত্তর ভারতের নদী অববাহিকা	12.0	0.50
উত্তর পশ্চিম ভারতের নদী অববাহিকা (সিন্ধু)	16.7	0.70
মধ্যভারতের নদী অববাহিকা	10.3	0.43
দক্ষিণভারতের পশ্চিমবাহিনী নদী অববাহিকা	10.5	0.44
দাক্ষিণাত্যের পূর্ব বাহিনী নদী অববাহিকা	20.6	0.86
মোট	100.0	4.18
উৎস ঃ India's Water Wealth (K.L.Rao)		

উত্তর ভারতের হিমালয়ের বরফ-গলা জলে পুষ্ট নদীগুলো সারা বছর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো কেবল বৃষ্টির জলে পুষ্ট হওয়ায় বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে নদীগুলোতে জলপ্রবাহ বিশেষ থাকে না। ফলে অন্য সময় উৎপাদন ব্যাহত হয়। ভারতে প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দক্ষিণ ভারতেই গড়ে ওঠে। উত্তর ভারতে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা খুবই কঠিন ব্যাপার, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কয়লা ও খনিজ তেলের অভাব, এখানকার করস্রোতা নদী ও জলপ্রপাত সমূহ, পশ্চিমঘাটের অত্যাধিক বৃষ্টিপাত এবং উন্নয়নশীল শিল্পাঞ্চলের চাহিদা সেখানে জলবিদ্যুৎ শক্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

রাজ্যওয়াড়ী সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে হরিয়ানা, হিমাচলচপ্রদেশ, জম্মু, ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরালা, মেঘালয় এবং পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যসমূহ জলবিদ্যুৎ শক্তির উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলি জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উভয়ের উপর নির্ভরশীল। দিল্লী, বিহার, গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গে জলবিদ্যুতের ভূমিকা খুক কম।

জলবিদ্যুৎ শক্তির গুরুত্ব ঃ ভারতের শিল্প ও কৃষি উন্নয়নে শক্তি সম্পদ হিসাবে জলবিদ্যুতের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ভারতে মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম জলপ্রপাতের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে এদেশের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি। তারপরে একে একে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এদেশের শিল্পবিকাশে জলবিদ্যুৎশক্তির এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কোলা স্বর্ণখনিতে বিদুৎ সরবরাহের (1902 সন) মধ্য দিয়ে এদেশে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে (1915 খ্রিস্টাব্দে) টাটা কোম্পানীর প্রচেষ্টায় মহারাষ্ট্রের ভিরা, ভিবপুরী, খোপালী প্রভৃতি কয়েকটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং এর শক্তির সাহায্যে বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই) ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে কার্পাস বয়ন শিল্প উন্নতি করে। শিল্পবিকাশের উন্নতির উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা গঠন করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের

ব্যবস্থা হয়। এই জলবিদ্যুতের ওপর নির্ভর করে ভারতে 'নতুন শিল্পযুগের' আবির্ভাব ঘটে। বিদ্যুৎশক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বহু রকমের শিল্প উন্নতি করেছে। সেগুলির মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, লৌহ-ইস্পাত শিল্প, ইলেকট্রনিক্স শিল্প ও বহুবিধ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন শিল্পের নাম উল্লেখ করা যায়। শিল্পের প্রসার ও উন্নতিতে এই বিদ্যুৎশক্তির এক অবদান রয়েছে এবং ভারত আজ বিশ্বে তার বিভিন্ন শিল্প সম্ভার নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে।

ভারতীয় কৃষি উন্নয়নে এই বিদ্যুৎশক্তির এক বিশেষ ভূমিকা আছে। ভারতের মত কৃষিপ্রাধান দেশে কৃষির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে নিয়মিত জলসেচের ওপর। ব্যাপক কৃষির প্রসারের উদ্দেশ্যে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের জন্য প্রচুর কূপ ও নলকূপ ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সব কূপ ও নলকূপ থেকে জল তোলার জন্য পাম্পসেট ব্যবহৃত হয়। জল তোলার কাজে পাম্পকে সচল রাখতে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন। জলবিদ্যুৎ শক্তি সস্তা। তাই সুলভে চাষের কাজে এই বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করা যায়। এদেশে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে ব্যাপক কৃষির প্রসার ও কৃষি সাফল্যের ক্ষেত্রে রয়েছে বিদ্যুৎশক্তির এক অসামান্য অবদান। দক্ষিণ ভারতে কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও সেচের কাজে প্রচুর জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। সঠিকভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করলে এদেশে কৃষি উন্নয়ন সার্থকভাবে এগিয়ে যেতে পারবে।

ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ভৌগোলিক অবস্থা ঃ জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের একমাত্র উৎস হল প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জলপ্রপাত। মানুষ তার ইচ্ছামতো যে কোন স্থানে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারে না। এই শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে কয়েকটি অনুকূল প্রাকৃতিক উপাদান যেমন অপরিহার্য তেমনি আবার অনুকূল অ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে বেগবতী জলস্রোতের ধারা, প্রচুর জলসম্ভার, নিয়মিত জলপ্রবাহ, জলাধার তৈরীর স্থান বা ভূমির অবস্থানের কথা উল্লেখ করতে হয়। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে বাজার, প্রচুর মূলধন, সরকারী ব্যবস্থাপনা ও আনুকূল্য, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও দক্ষ শ্রমিক, অন্যান্য শক্তির অপ্রাচুর্য, বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ও পরিবহনের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

(১) **বেগবতী জলস্রোতের ধারা ঃ** জলস্রোতের বেগের ওপর টারবাইন ঘূর্ণনের পরিমাণ নির্ভর করবে। জলস্রোতের গতিবেগের দ্বারা টারবাইন ঘুরিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। জলস্রোতের গতিবেগের পরিমাণ নদী ঢাল এবং জলধারার কৃত্রিম পতনের ওপর নির্ভর করে। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির আগে জলপ্রপাত বা ঐ জাতীয় ঢালের পরিবর্তনসহ নদীর প্রবাহকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হত। বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির কল্যাণে কৃত্রিমভাবে এই জলপ্রপাত সৃষ্টি করা হয়। ভাকরা বাঁধে 720 মি. উঁচু জলস্তরকে নীচের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে নামিয়ে এনে টারবাইন ঘুরিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্ব পাহাড়িয়া অঞ্চলের বন্ধুর ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত বেগবতী জলাধারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের এক অনুকূল পরিবেশ রচনা করে রেখেছে।

(২) **প্রচুর জলসম্ভার ঃ** জলবিদ্যুৎ লাভজনকভাবে উৎপাদনের জন্য প্রচুর জলসম্ভারের প্রয়োজন হয়। তথ্যগতভাবে বলা যায় যে কোন নদী বা জলপ্রবাহ থেকেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা যায় কিন্তু, লাভজনকভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য প্রচুর জলসম্ভারের প্রয়োজন। এই জন্য দেখা যায় যে বিশাল আকৃতির নদ-নদীগুলোতে অনেক জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

(৩) **জলাধার নির্মাণ ঃ** স্বাভাবিকভাবে কোন হ্রদকে জলাধার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে বাঁধের পশ্চাতে জলাধার নির্মাণের জায়গা থাকা দরকার। জলাধার নির্মাণের জায়গা নীচু বা পতিত জমি এবং জনবসতিহীন

হওয়া দরকার। অন্যথায় প্রস্তাবিত জলাধার নির্মাণ স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের প্রচুর ক্ষতিপূরণ করার প্রয়োজন হতে পারে। জনবসতি অঞ্চল থেকে দূরে পরিত্যক্ত স্থানে ও পার্বত্য অঞ্চলে অপ্রবেশ্য শিলায় গঠিত ভূমিভাগে কম ব্যয়ে জলাধার নির্মাণ করা যায়। জলাধার তৈরীর সময় অনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশতন্ত্র (ecosystem) নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য বর্তমানে উত্তর প্রদেশের তেহরী বাঁধ বা গুজরাটের নর্মদা নদীতে বাঁধ নির্মাণের সময় স্থান পরিবর্তনের জন্য বারবার দাবী উঠেছে।

(৪) **হ্রদের অবস্থান ঃ** নদীপ্রবাহ থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ এবং বাঁধের পেছনে কৃত্রিম হ্রদ বা জলাশয় নির্মাণ করতে হয়। এতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়। উপরন্তু, এর ফলে বিরাট অঞ্চল জলে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ভাকরা বাঁধের পশ্চাতে গোবিন্দ সাগর জলাশয় নির্মাণে প্রাকৃতিক সুবিধে পাওয়া গিয়েছিল।

❑ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণসমূহ

(ক) বাজার ঃ সব দেশেই বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখা যায় না বলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার সময় ঐ উৎপাদিত বিদ্যুতের চাহিদার পরিমাণ সম্পর্কে সমীক্ষা করা হয়। এজন্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাছাকাছি শিল্পসমৃদ্ধ ও জনবহুল বসতি থাকা দরকার। নীচের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোতে মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার বেশি, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ ভারতে মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার খুব কম।

মাথাপিছু বিদ্যুতের (কিলোওয়াট) ব্যবহার								
যুক্তরাষ্ট্র	সুইডেন	নরওয়ে	কানাডা	যুক্তরাজ্য	জাপান	রাশিয়া	ফ্রান্স	ভারত
9,470	9,360	9000	7000	4,649	3,990	3,830	3,420	119

(খ) সরকারী ব্যবস্থাপনা ও অনুকূল্য ঃ প্রাথমিক ব্যয়ের পরিমাণ বেশী বলে সাধারণত সরকারী প্রচেষ্টায় জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ ছাড়া জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বাঁধ ও জলাধারের জায়গার জনয ক্ষতিপূরণ ও স্থানচ্যুত বাসিন্দাদের পূনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান, উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য স্তম্ভ বসানোর জায়গা ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিদ্যুৎ-বাহিত লাইন বসানোর জন্য জায়গা দখল, উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্রয়মূল্যের হার (Rate) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জাতীয় স্তরে নির্ধারিত করা প্রয়োজনীয়তা আছে বলে দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আনুকূল্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলে গড়ে উঠেছে।

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান দেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (মোট জলবিদ্যুতের শতকরা হার), 1998									
দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদন	দেশ	উৎপাদ
কানাডা	12.84	ব্রাজিল	11.25	রাশিয়া	5.87	জাপান	3.49	সুইডেন	2.84
যুক্তরাষ্ট্র	12.64	চীন	7.91	নরওয়ে	4.47	ভারত	2.97	ফ্রান্স	2.34
(**Source :** Energy Statistics, U.N.O)									

(গ) অন্যান্য শক্তির অপ্রাচুর্য ঃ দেশে যে অঞ্চলে কয়লা দুষ্প্রাপ্য সেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা অপরিহার্য

হয়ে পড়ে। এই কারণে দক্ষিণ ভারতে স্বাধীনতার আগে থেকে বহু সংখ্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

(ঘ) বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণে প্রাথমিক ব্যয় বেশি পরিমাণে হয়। এই কারণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সাথে যাতে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে আরো বেশি পাওয়া যায়, তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এদেশে স্বাধীনতা লাভের পর বহুমুখী নদী পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের অগ্রগতি (ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত) ঃ বিলিয়ান Kw/h

বছর	ব্যবহৃত				অব্যবহৃত	সর্বমোট
	জলবিদ্যুৎ	তাপ	আণবিক	মোট		
1950–51	2.5	2.6		5.1	1.5	6.6
1960–61	7.8	9.1		16.9	3.2	20.1
1970-71	25.2	28.2	2.4	55.8	5.4	61.2
1980-81	56.5	61.3	3.0	120.8	8.4	129.2
1990–91	7.1.7	186.5	6.1	264.3	25.1	289.4
1995-96	72.6	299.3	8.0	379.9	38.2	418.1
1996-97	68.9	317.9	9.1	395.9	40.8	436.7
1997-98	74.6	337.0	10.1	421.7	44.1	465.8
1998-99	82.9	353.7	11.9	448.5	48.4	532.2
1999-00	80.6	386.8	13.3	480.7	51.5	532.2
2000-01	74.5	408.1	16.9	499.5	55.0	554.5
2001-02	73.5	424.4	19.5	517.4	61.7	579.1
2002-03	64.0	449.3	19.4	532.7	63.8	596.5
2003-04	75.2	472.1	17.8	565.1	68.2	633.3

*বায়ু শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে, P=প্রভিশনাল

উৎস ঃ The Economic survey, 2004–05. p.S-26.

ভারতের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে তিনটি পর্যায়ে বা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) স্বাধীনতার পূর্বে স্থাপিত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ।

(২) স্বাধীনতার পরে নদী উপত্যকার অধীন নয় এইরূপ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ।

(৩) বহুমুখী নদী উপত্যকার অধীন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ।

● **(১) ভারতের কয়েকটি প্রাচীন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ঃ** স্বাধীনতালাভের আগে জলবিদ্যুতের উন্নতি মূলত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল। এর কারণ কয়লা ও খনিজ তেলের অভাব, দক্ষিণ ভারতের খরস্রোতা নদী ও জলপ্রপাতসমূহ, পশ্চিমঘাট অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত এবং উন্নয়নশীল শিল্পের চাহিদা।

স্বাধীনতা লাভের আগে স্থাপিত দাক্ষিণাত্যের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রের খোপলি, ভিরা ও

ভিরপুরী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তামিলনাড়ুর পাইকারা, মেত্তুর, পাপনাশম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণাটকের শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামসাগর দেবনুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, এবং কেরালার পল্লীভাসাল প্রকল্প, অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামসাগর দেবনুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, এবং কেরালার পল্লীভাসাল প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। উত্তর ভারতের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের গঙ্গাখাল জলবিদ্যুৎ গ্রিড, সারদা খাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও পাথরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাঞ্জাবের উল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং জম্মু ও কাশ্মীরের রবমূলা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতালাভের আগে স্থাপিত উল্লেখযোগ্য জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

মহারাষ্ট্র ঃ ঘোপলি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ এটি 1915 সালে পশ্চিমঘাট পর্বতের ভোর ঘাট গিরিপথের পাদদেশে নির্মিত হয়। এখানকার উৎপাদিত বিদ্যুৎ মুম্বাই এর শিল্পাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। ভীরা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পশ্চিমঘাট পর্বতে নলামূলা নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরী করে ঐ জলের সাহায্যে তৈরী হয়েছে। এর বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা 132 mw যা মুম্বাই শহর ও পাশ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। ভিরপুরী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি

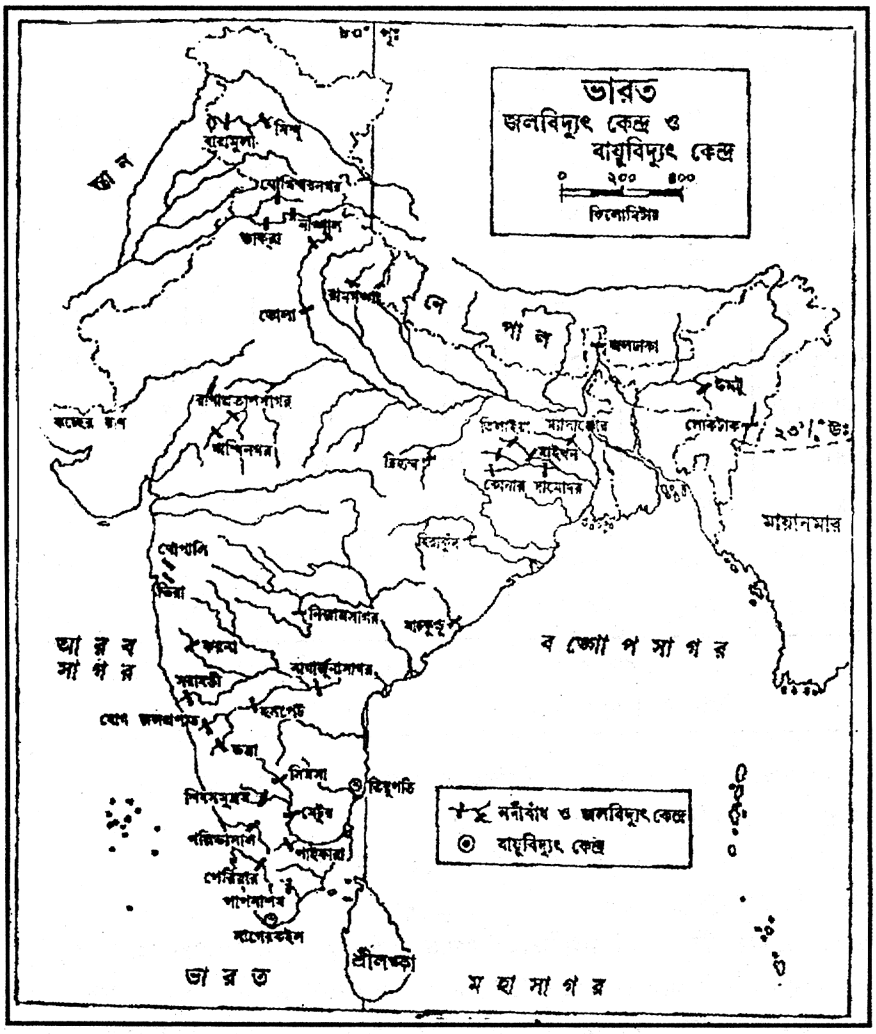

চিত্র 3.43 ঃ ভারতের জলবিদ্যুৎ ও বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র

খোপলির কাছে অন্ধ্র নদীর ওপরে সৃষ্ট কৃত্রিম জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই তিনটি বিদ্যুৎকেন্দ্রই স্বাধীনতার আগে টাটা কোম্পানী তৈরী করে।

তামিলনাড়ু ঃ পাইকারা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি নীলগিরি পাহাড়ে পাইকারা নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে তৈরী হয়েছে। এর উৎপাদন ক্ষমতা 71 mw যা কোয়েম্বাটোর, কান্নোর, মাদুরাই শিল্পাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। মেত্তুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প 1937 সালে কাবেরী নদীর ওপর তৈরী হয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বাঁধ স্থাপন করে এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার আগে এর উৎপাদন ক্ষমতা 30 mw থাকলেও পরবর্তীকালে তা বাড়িয়ে 200 mw করা হয়েছে। সালেম, তিরুচিরাপল্লী, এরোদ, ভেলোর প্রভৃতি অঞ্চলে এই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। পাপনাশম্ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে তাম্রপর্নী নদীর জল প্রপাতের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

কর্ণাটক ঃ ভারতের প্রাচীনতম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি 1902 খ্রিস্টাব্দে কোলার স্বর্ণখনিতে বিদ্যুতের যোগান দেবার জন্য কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম জলপ্রপাতের উপর স্থাপিত হয়। এর উৎপাদন ক্ষমতা 48 mw.

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ গোদাবরীর উপনদী মঞ্জিরার ওপর নিজামসাগর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

কেরালা ঃ কেরালা রাজ্যের পেরিয়ার পরিকল্পনায় মুদীরপুঝা নদীর জলপ্রপাত থেকে পল্লী-ভাসালে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রের সহযোগিতায় অলওয়ের অ্যালুমিনিয়াম শিল্পকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ ঃ গঙ্গা-খাল জলবিদ্যুৎ গ্রিড প্রকল্পে উত্তরপ্রদেশে হরিদ্বার থেকে মীরাট পর্যন্ত গঙ্গা-খালের একই প্রবাহে 7টি ছোট ছোট কৃত্রিম জলপ্রপাত থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই কেন্দ্রগুলো হল বাহাদুরবাদ, মহম্মদপুর, চিতৌরা, সালওয়া, ভোলা, পালরা ও সুমেরা। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত বলে এদের গ্রিড বলা হয়।

উত্তরপ্রদেশের প্রধান জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির উৎপন্ন বিদ্যুত পরিমাণ নীচে দেওয়া হল।

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	**জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ**
রিহান্দ (50 mw সম্পন্ন 6টি ইউনিট)	300 mw
যমুনা স্টেজ I থেকে V	114.8 mw
ঐ II (চিবরো)	240.0 mw
ঐ II	120.0 mw
মাটাটিলা	30.0 mw
গঙ্গা-ক্যানাল	45.2 mw
খতিমা	41.5 mw

পাঞ্জাব ঃ পাঞ্জাবের উল নদীর কয়েকটি অংশে বিদ্যুৎকেন্দ্র (95 mw) স্থাপিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ পাঠানকোট, অমৃতসর, লুধিয়ানা অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের ঝিলাম নদীর ওপর বারমুলাতে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

● (২) **স্বাধীনতার পরে বহুমুখী নদী উপত্যকার অধীন নয় এইরূপ কেন্দ্রসমূহ হল ঃ কর্ণাটক ঃ** সারাবতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কালি নদী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্বাধীনতার পরে স্থাপিত হয়েছে। এখানে 880 mw জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশ 330 mw শ্রীশৈলম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কৃষ্ণা নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে গড়ে উঠেছে। নিম্ন (400 mw ও 120 mw) সিলেরু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি সিলেরু নদীর ওপর গড়ে উঠেছে। মাচকুন্দ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় মাচকুন্দ নদীর ওপর তৈরী হয়েছে। এখানে 115 mw বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

কেরালার ইদ্দিকি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি (780 mw) পেরিয়ার নদীর পার্বত্য প্রবাহে বাঁধ দিয়ে স্থাপিত হয়েছে। শবরীগিরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি (300 mw) কুইলন জেলার পাম্বা ও কাক্কি নদীর ওপর স্থাপিত হয়েছে।

তামিলনাড়ুর কুন্দা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নীলগিরি পর্বতের কুন্দা অববাহিকায় স্থাপিত হয়েছে। এখানে 535 mw বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। নীলগিরি পর্বতের বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি এখানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার সহায়ক হয়েছে।

হিমাচল প্রদেশ ঃ এখানে প্রধান জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা 5টি।

(a) **পঙ-বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঃ** এটি বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অন্তর্গত একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। 360 mw শক্তি সম্পন্ন এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিপাশা নদীর ওপর গড়ে উঠেছে।

(b) **দেহার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** যা দেহারের কাছে শতদ্রু নদীর ওপর নির্মাণ করা হয়েচে, এর উৎপাদন ক্ষমতা 990 mw।

(c) **বয়রা-সিউল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** যা বয়রা, সিউল ও ভালেদ নদীকে আশ্রয় করে তৈরী হয়েছে। এটি 180 mw জলবিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম।

উপরোক্ত প্রকল্পগুলি ছাড়াও গিরি বাটা (Giri-Bata) ও বাসসি (Bassi) নামে আরো দুটো প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এদের প্রত্যেকের ক্ষমতা হল 60 mw। কাশ্মীরে ঝিলাম নদীর নিম্ন অববাহিকায় নিম্ন ঝিলাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 105 mw স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া চন্দ্রভাগা নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে সালাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র 345 mw গড়ে উঠেছে।

উত্তরপ্রদেশে যমুনা ও তার উপনদী টোনস্-কে নিয়ন্ত্রণ করবার জনয যমুনা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। মনিপুরে ইম্ফল নদীর উপর বাঁধ দিয়ে ও সুরঙ্গপথে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে লোকটাক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠেছে।

সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে নিম্ন লাগিয়াপ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

● (৩) ভারতের বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা ঃ পরিকল্পনা অনুসারে বন্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও সম্ভব হয়েছে।

ভারতের প্রধান নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলো হল	
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	পরিকল্পনার নাম
(১) মাইথন, পাঞ্চেৎ	(১) দামোদর নদী উপত্যকা পরিকল্পনা
(২) তিলাইয়া, ম্যাসাঞ্জোর	(২) ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা
(৩) মুকুটমণিপুর	(৩) কংসাবতী পরিকল্পনা
(৪) ভাক্‌রা, কোটলা ও গাঙ্গুযোল	(৪) ভাক্‌রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা
(৫) হীরাকুঁদ ও চিপলিরা	(৫) মহানদী (হীরাকুঁদ) পরিকল্পনা

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	পরিকল্পনার নাম
(৬) গান্ধীসাগর, রানাপ্রতাপ সাগর জওহর সাগর	(৬) চম্বল পরিকল্পনা
(৭) তুঙ্গাভদ্রা	(৭) তুঙ্গাভদ্রা পরিকল্পনা
(৮) নাগার্জুন	(৮) নাগার্জুন পরিকল্পনা
(৯) রিহান্দ	(৯) রিহান্দ পরিকল্পনা
(১০) হনুমান	(১০) কুশী পরিকল্পনা
(১১) বাল্মিকী সাগর	(১১) গণ্ডক পরিকল্পনা
(১২) কয়না	(১২) কয়নাপরিকল্পনা
(১৩) নিরাব, শোলায়ার, পরাম্বিকুলাম, টুক্কাভাবু পেরুবারিপল্লম ও টেক্কাদি	(১৩) পারম্বিকুলাম, আলিয়ার পরিকল্পনা

❑ এক নজরে ভারতের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ❑

অঞ্চল	রাজ্য	প্রকল্পের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (mw)
উত্তর-পূর্ব ভারত	মণিপুর	লোকটাক	105
	মেঘালয়	কর্দমকুলাই	60
		ঘংডং	25
	আসাম ও ত্রিপুরা	একাধিক ক্ষুদ্রায়তন প্রকল্প	80
পূর্ব ভারত	বিহার ও ঝাড়খণ্ড	দামোদর	104
		সুবর্ণরেখা	20
		কোশী	130
পূর্ব ভারত	উড়িষ্যা	হীরাকুঁদ	270
		চিপলিমা	72
		বালিবেলা	360
	পশ্চিমবঙ্গ	ময়ুরাক্ষী	6
	সিকিম	নিম্ন লাগিয়াগ	12
		অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন প্রকল্প	41
উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারত	জম্মু ও কাশ্মীর	নিম্ন ঝিলাম	105
		সালাল	345

অঞ্চল	রাজ্য	প্রকল্পের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (mw)
	হিমাচল প্রদেশ	পঙ বাঁধ	360
		দেহার	990
		বয়রা-সিউল	180
		গিরি-বাটা	60
		বাস্‌সি	60
	উত্তরপ্রদেশ	রামগঙ্গা	198
		রিহান্দ 6টি ইউনিট	300
		যমুনা স্টেজ I থেকে V	115
		যমুনা স্টেজ II (চিবরো)	240
		যমুনা স্টেজ II	120
		মাটাটিলা	30
		গঙ্গা ক্যানাল	45
		খতিমা	42
	পাঞ্জাব	ভাক্‌রা-নাঙ্গাল	1355
		উল	95
	রাজস্থান	রাণাপ্রতাপ সাগর	172
		জহওর সাগর	99
	মধ্যপ্রদেশ	গান্ধীসাগর	115
দক্ষিণ ভারত	মহারাষ্ট্র	কয়না	920
		(i) খোপলি	276
		(i) ভিবপুরী	
		(i) ভীরা	
	কর্ণাটক	শরাবতী	880
		কালিনদী	810
	কেরালা	ইডুক্কি	780
		শবরীগিরি	300
		পেরিয়ান্‌গল	32
		পান্নিয়ার	30
		নেরিয়ামঙ্গলম	45
		পল্লীভাসাল	38
		সেঙ্গুলাম	48
		কাট্টিয়াডি	75
	তামিলনাড়ু	কুন্দা	535
		মেত্তুর	240

অঞ্চল	রাজ্য	প্রকল্পের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (mw)
		পেরিয়ার	140
		পাইকারা	70
		পাপনাশম্	28
		কোদায়ার	100
		শোলায়ার I II	95
	অন্ধ্রপ্রদেশ	শ্রীশৈলম	330
		নাগার্জ্জুনসাগর	810
		মুচকুন্দ	115
		উচ্চ সিলেরু	120
		নিম্ন সিলেরু	400

ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন, 2002–03

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	জলবিদ্যুৎ	তাপ	ডিজেল ও বায়ু	গ্যাস	আণবিক	মোট
রাজ্য						
অন্ধ্রপ্রদেশ	3,470	23,032	98	6,878	—	33,478
অরুণাচল প্রদেশ	10	—	17	—	—	27
আসাম	—	—	—	884	—	884
বিহার	59	535	—	—	—	594
ছত্রিশগড়	277	7,593	—	—	—	7,870
গোয়া	—	—	—	273	—	273
গুজরাত	588	30,522	179	5,824	—	37,114
হরিয়ানা	3661	6,122	—	—	—	9,783
হিমাচলপ্রদেশ	1,650	—	—	—	—	1650
জম্মু ও কাশ্মীর	323	—	—	58	—	381
ঝাড়খণ্ড	79	3,827	—	—	—	3,906
কর্ণাটক	7,248	11,164	1,319	1,280	—	21,011
কেরালা	4845	—	804	135	—	5,784
মধ্যপ্রদেশ	1,771	13,681	33	—	—	15,485
মহারাষ্ট্র	5,535	52,204	667	5,043	—	63,449

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	জলবিদ্যুৎ	তাপ	ডিজেল ও বায়ু	গ্যাস	আণবিক	মোট
মণিপুর	—	—	—	—	—	—
মেঘালয়	574	—	—	—	—	574
মিজোরাম	7	—	3	—	—	10
নাগাল্যান্ড	23	—	—	—	—	23
ওড়িষ্যা	3,261	2,621	—	—	—	5,882
পাঞ্জাব	8,691	13,650	—	—	—	22,341
রাজস্থান	2,197	14,727	25	222	—	17,171
সিকিম	40	—	—	—	—	40
তামিলনাড়ু	2,723	21,080	3,744	3,274	—	30,822
ত্রিপুরা	52	—	2	282	—	336
উত্তরাঞ্চল	3,426	—	—	—	—	3,426
উত্তরপ্রদেশ	1,429	20,949	—	—	—	22,378
পশ্চিমবঙ্গ	510	21,468	1	—	—	21,949
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল						
আন্দামান ও নিকোবর	—	—	—	139	—	139
চন্ডীগড়	—	—	—	—	—	—
নগর হাভেলী	—	—	—	—	—	—
দিল্লী	—	1,312	—	2,039	—	3,351
দমন ও দিউ	—	—	—	—	—	—
লাক্ষাদ্বীপ	—	—	21	—	—	21
পন্ডিচেরী	—	—	—	264	—	264
ডি.ভি.সি	294	8,653	—	8	—	8,956
কেন্দ্রীয় সরকারী প্রজেক্ট	11,267	1,36,410	—	26,221	19,390	1,93,288

উৎস ঃ Statistical Abstract, India, 2003, pp. 119–120.

তাপবিদ্যুৎ ঃ এই ধরণের বিদ্যুৎ কয়লা, ডিজেল এবং স্বাভাবিক গ্যাসের মতন জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে উৎপাদিত হয়। স্বভাবতই, উপরোক্ত যে কোন একটি জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রাপ্তি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। জলবিদ্যুৎ ও আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনায় তাপবিদ্যুৎ দ্রুত অগ্রগতি করেছে। 1950–51 সালে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল 2.6 বিলিয়ান KWR (BKW)। ঐ একই সময় জলবিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা

ছিল 2.5 (BKW)। কিন্তু 2003–04 সালে তাপবিদ্যুতের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছিল 472.1 (BKW) MW। ঐ একই সময়ে জলবিদ্যুতের উৎপাদন ছিল মাত্র 75.2 BKW। অর্থাৎ 1950–51 থেকে 2003–04 সালের তাপবিদ্যুতের উৎপাদন 181 গুণ বেড়েছে। পক্ষান্তরে, জলবিদ্যুতের বেড়েছে মাত্র 30 গুণ।

NTPC (ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশন) 1975 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং এর পর থেকেই তাপবিদ্যুৎ এর উৎপাদন বহুলাংশে বেড়েছে। বর্তমান NTPC-র 13টি কয়লা-ভিত্তিক সুপার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং 7টি গ্যাস ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে উপযোগী যেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আদর্শ অবস্থা নেই। মহারাষ্ট্র তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। ভারতবর্ষের মোট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের 16% এই রাজ্য থেকে আসে। গুজরাতে কোন বড় নদী নেই যেখান থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। তাই এই রাজ্যের বিদ্যুতের 91%-ই হল তাপবিদ্যুৎ। অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে কিছু কয়লার খনি রয়েছে যা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগে। নীচে রাজ্য ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম দেওয়া হল—

রাজ্য	তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
মহারাষ্ট্র	কারাডী, নাসিক, কাপারখেদা, পায়াস, ভূসয়াল, পারলি, উরান, বল্লারমাহ, চোলা, ট্রম্বে, কোলাপুর, ধোবানী, উজ্জয়িনী।
গুজরাত	বানাস, গান্ধীনগর, কচ্ছ, সবরমতী, ওয়ানস্কবরী, কাবায়, সিক্কা, মহুভা, উট্রান, শাপুর, গেরবন্দর, কান্ডালা, ধুভারান, উকাই।
অন্ধ্রপ্রদেশ	রামাগুদাম, কোধাগুদাম, নেল্লোর, বিজয়ওয়াদা, ভদ্রাচলম, মানগুরু।
পশ্চিমবঙ্গ	ব্যান্ডেল, কলকাতা, দুর্গাপুর, ফারাক্কা, কোলাঘাট, টিটাগড়, সাঁওতালডিহি, গৌরীপুর, মেজিয়া
তামিলনাড়ু	নেভেলী, মেত্তুর, এন্নোর, তুতিকোরিন
উত্তরপ্রদেশ	ওবরা, হরদুয়াগঞ্জ, বেণুসাগর, রোসা, জওহরপুর, উনচোহার, রিহান্দ, কানপুর, মৌ, গোরখপুর, দোহরীঘাট, মোবাদাবাদ, টুন্ডলা, বাহরিহ।
মধ্যপ্রদেশ	সিঙ্গোউলী, সাতপুরা, অমরকণ্টক।
ঝাড়খন্ড	পাত্রাতু, সুবর্ণরেখা, চন্দ্রপুরা।
হরিয়ানা	ফরিদাবাদ, পানিপথ, যমুনানগর।
পাঞ্জাব	ভাতিন্দা, রূপনগর।
দিল্লী	ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজঘাট, বদরপুর।
রাজস্থান	কোটা, পোলানা, মোয়াই মাধোপুর, বানসওয়ারা, আন্টা।
আসাম	নামরূপ, বঙ্গাইগাঁও, চন্দদরপুর।
উড়িষ্যা	তালচের, বালিমেলা।
বিহার	বারাউনী, কহলগাঁও।
উৎস ঃ Khuller, India (2006)	

পারমাণবিক শক্তি (Atomic Power) ঃ পরমাণুকে (atom) কাজে লাগিয়ে রিয়াক্টরে (Reactor) যে প্রচণ্ড তাপ (বিদ্যুৎ) উৎপন্ন হয় তার সাহায্যে বাষ্পশক্তিকে সক্রিয় করে টারবাইন চালানো হয়। এর ফলে যে শক্তি আমরা পাই তাকে পারমাণবিক শক্তি বলে।

ইউরোনিয়াম, থোরিয়াম, হাইড্রোজেন, জিরকন, ইলমেনাইট, বেরিলিয়াম ও লিথিয়াম হল আনবিক শক্তি উৎপাদনের মৌলিক পদার্থ। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে 0.45 কি.গ্রা. ইউরোনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম থেকে 1.2 কোটি কিলোওয়াট/ঘণ্টা (kw/h) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, অথচ ঐ একই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে 6,000 টন কয়লার প্রয়োজন হয়। আর, যেহেতু অল্প পরিমাণ আণবিক পদার্থ ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়, তাই এই প্রকার বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে খরচও কম পড়ে। এই শক্তি বর্তমানে শিল্পকার্যে ও যানবাহন চালাতে ব্যবহার হচ্ছে।

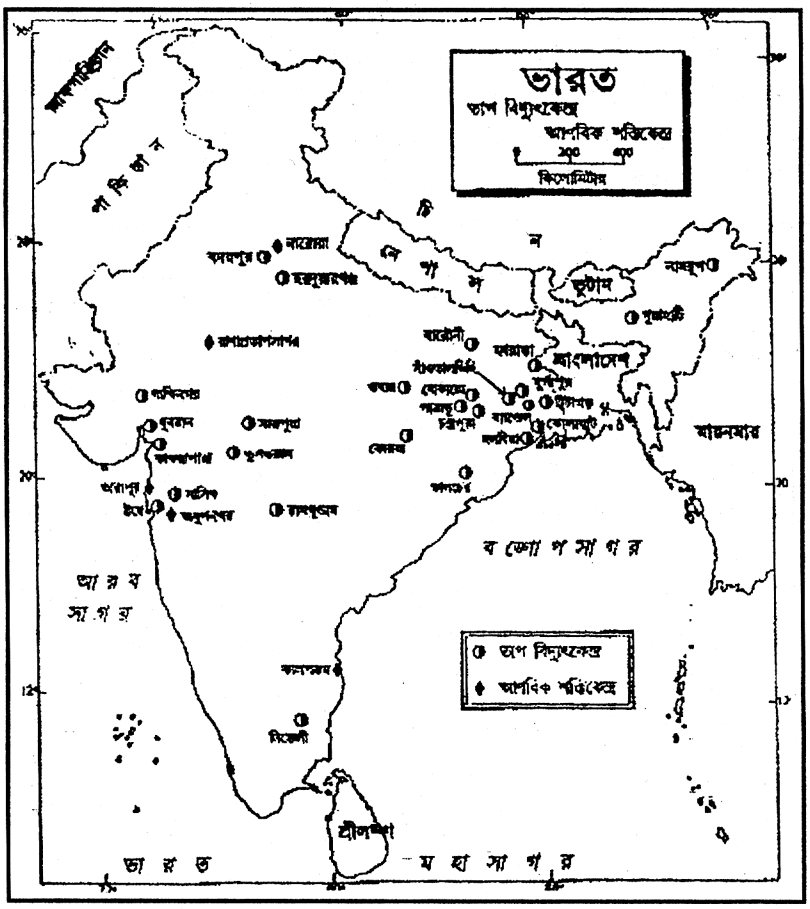

চিত্র 3.45 ঃ ভারতের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

পারমাণবিক শক্তির খনিজ পদার্থের প্রাপ্তিস্থান ঃ পৃথিবীতে আণবিক শক্তির খনিজ পদার্থ যথা, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, চিরকন, বেরিলিয়াম ও ইলমেনাইট প্রভৃতির বন্টনে খুব অসাম্য দেখা যায়।

ইউরেনিয়াম মোনাজাইট (monazite) বালুকা থেকে পাওয়া যায়। ভারতের ঝাড়খণ্ডের যদুগুড়ায় ইউরেনিয়াম সঞ্চয় আছে।

থোরিয়াম ঃ প্রধানত মোনাজাইট বালুকা থেকে এই খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। ভারতের কেরালা রাজ্যের (ট্রাভাঙ্করের কাছে) মালাবার উপকূলের বালুকারাশিতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মোনাজাইট পাওয়া যায়। এখানে সঞ্চিত থোরিয়ামের পরিমাণ হল 0.2 মেট্রিকটন।

জিরকন হল জার্কোনিয়ামের প্রধান আকর। কেরালার কুইলন ও মানবলাকুরিচি সৈকতের বালুকারাশিতে জিরকনের সঞ্চয় রয়েছে।

বেরিলিয়াম বেরিল (Beryl) খনিজ থেকে পাওয়া যায়। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও রাজস্থানে বেরিলিয়ামের সঞ্চয় আছে।

ইলমেনাইট উপকূল অঞ্চলের সৈকতের বালুকারাশিতে পাওয়া যায়। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে (কেরালা) এই খনিজের যথেষ্ট সঞ্চয় রয়েছে।

ভারতে চারটি পারমারবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। কেন্দ্রগুলো হল ঃ (১) মুম্বাই-এর কাছে তারাপুর অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন, (২) কোটার কাছে (রাওয়তভট্টা) রাজস্থান অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন, (৩) চেন্নাইয়ের কাছে (কালপক্কম) মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন ও (৪) উত্তরপ্রদেশে বুলন্দশহরের কাছে নারোয়ায়। ভারতে পারমাণবিক শক্তি থেকে প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় তারাপুর অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশনে 1969 সালে। কর্ণাটকের কাইগা (Kaiga), গুজরাটের কাকরাপার প্রভৃতি স্থানেও এই শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ার কাজ শুরু হয়েছে।

ভারতে পারমাণবিক শক্তির গবেষণার জন্য চারটি কেন্দ্র আছে। ট্রম্বেতে Bhaba Atomic Research Centre, কলকাতায় Variable Energy Cyclotron Centre, কালপক্কমে Indira Gandhi Centre for Atomic Research ও ইন্দোরে Centre for Advanced Technology। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে ভারত সপ্তম স্থানের অধিকারী।

অচিরাচরিত শক্তি (Non-Conventional Energy)

1960 সালে ফ্রান্সে অগাস্টিন মুশো (Augustin Muchot) এক অভিনব পদ্ধতিতে সৌরশক্তির সাহায্যে পরিচালিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। কোন জীবাশ্ম জ্বালানী (Fossil Fuel) ছাড়াই ঐ ইঞ্জিন চালানো যায়। কয়েকটি অর্ধবৃত্তাকার (Parabolic) আয়না সাজিয়ে সৌর আলোক রশ্মির রেখাগুলো কেন্দ্রমুখী করে অধ্যাপক মুশো সৌরশক্তিকে তাপ শক্তিতে পরিবর্তন করেন। এই শক্তির (তাপ শক্তি) সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করে সেই বাষ্প দিয়ে ইঞ্জিন চালানো যায়। মুশোর এই আবিষ্কার অপ্রচলিত শক্তির উৎসের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব আনল। সৌরশক্তি চালিত পাম্প, সৌর কুকার, সৌর রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি যন্ত্র অধ্যাপক মুশোর দীর্ঘ গবেষণার ফসল।

যদিও অপ্রচলিত শক্তি কোন নতুন ধারণা নয়, তবুও বর্তমানে এর গুরুত্ব দারুণ ভাবে বেড়েছে। বর্তমানে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে চিরাচরিত পথে শক্তি উৎপাদন ও তার চাহিদা মেটানো সম্ভবপর নয়। অথচ ঘটনা হল পৃথিবীর সর্বত্র জ্বালানী শক্তির বিপুল চাহিদা রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, কোন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি শুধুমাত্র কাঁচামালের যোগানের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে না। শক্তি সম্পদের ওপরও তা নির্ভরশীল। দেখা গেছে যে পৃথিবীর শক্তি সম্পদে অগ্রসর দেশগুলোই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত, কিন্তু ঘটনা হল পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই শক্তি সংকটে (Energy crisis) ভুগছে। ক্ষয়িষ্ণু বা অপূর্ণভব সম্পদগুলো ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর অনেক দেশে এদের ভাণ্ডার ক্রমশ কমে আসছে। গচ্ছিত সম্পদগুলোর পরিমাণকে কিছুটা প্রসারিত করা চলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐসব সম্পদ একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে। এটা অনুমান করা হয় যে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার যেভাবে দিন দিন বাড়ছে তাতে করে পৃথিবীর বর্তমান সঞ্চয় 2050 সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

ভারতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার		
উৎসসম্প্রযুক্তি	সম্ভাবনা	কার্যকরী ক্ষমতা
1. বায়ু-শক্তি	20,000 মেগাওয়াট	900 মেগাওয়াট
2. ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ (3 মেগাওয়াট ক্ষমতা পর্যন্ত)	10,000 মেগাওয়াট	141 মেগাওয়াট
3. জৈব-ভর (Biomass)	17,000 মেগাওয়াট	83 মেগাওয়াট
4. সৌর ফোটো-ভোল্ট	20 মেগাওয়াট/বর্গ কি.মি.	28 মেগাওয়াট/বর্গ কি.মি.
5. পৌর জঞ্জাল	1700 মেগাওয়াট	3.75 মেগাওয়াট 90 মেগাওয়াট (প্রকল্পের কাজ চলছে)
6. সৌর শক্তি	35 মেগাওয়াট/বর্গ কি.মি.	
(a) জল গরম করার প্রকল্প	4 লক্ষ বর্গ মিটার	
(b) সৌর চুল্লী		4 লক্ষ 30 হাজার (সংখ্যা)
7. জৈব-গ্যাস প্ল্যান্ট	120 লক্ষ	253 লক্ষ (সংখ্যা)
8. উন্নত জৈব-ভর চুল্লী	1200 লক্ষ	237 লক্ষ (সংখ্যা)
Source : India, 1998,		

● **সৌর শক্তি (Solar Energy) ঃ** 'জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ম মহাদ্যুতিম'— এই দিবাকরের কাছ থেকে আমরা পেতে পারি বিদ্যুৎ, তাপ ইত্যাদি। কি রকম ভাবে? ব্যাপারটা একটু খুলে বলা যাক।

পৃথিবীতে যে সৌর রশ্মি এসে পড়ে তা অমিত শক্তির ভাণ্ডার। এই শক্তিই বিশ্বে জীব জগতের সৃষ্টি ও রক্ষার মূল শক্তি। সৌর শক্তির একাংশ ধরা পৃষ্ঠে বিকিরণ হিসেবে এসে পড়ে। এর সামান্য অংশ যদি কাজে লাগাতে পারা যেত তবে শক্তি (energy) নিয়ে মানব সভ্যতার সমস্যা দূর হত, কোনো দেশে আপতিত (incoming) সৌর শক্তি (Solar radiation) এক মিনিট কাল ধরে রেখে যদি তা শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেত তাহলে সেই দেশে একদিনেরও বেশি প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা যায়। বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন যে গোটা পৃথিবীতে প্রতি ঘণ্টায় যে সূর্য কিরণ পাওয়া যায় তাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে 21,0000,000 লক্ষ টন কয়লার তাপশক্তির (thermal power) সমান হবে। সৌরশক্তিকে সৌর ব্যাটারী দিয়ে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করলে রান্না, বাড়িঘর ঠাণ্ডা ও গরম রাখা, ধাতব পদার্থ গলানো, কুয়ো থেকে জল তোলা ইত্যাদি কাজ চলতে পারে। ভারতবর্ষের প্রতি বছর প্রায় 5,000 klw/h সৌরশক্তি উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে সৌরশক্তি থেকে বছরে 50,000 klw/h বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যেতে পারে। ভারতের বিভিন্ন গ্রামে সৌরশক্তি থেকে প্রতিদিন 10 থেকে 50 kw/h বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। চেষ্টা চলছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ছোট মোল্লাখালি, বড় মোল্লাখালি অঞ্চলগুলোতে সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার। হরিয়ানার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফটোভোল্টাইক সেল ব্যবহার করে পাম্প সেটের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করেছে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিককরণ নিগম বা Rural Electrification Corporation (সংক্ষেপে REC) আমাদের দেশের প্রায় 20,000 প্রত্যন্ত গ্রাম নির্বাচন করেছে যেখানে প্রথাগত পদ্ধতিতে (traditional) বিদ্যুৎ যোগান দেওয়া যথেষ্ট

খরচ সাপেক্ষ ও দুঃসাধ্য। এই সব গ্রামে ফোটো ভোল্টাইক সেল ব্যবহার করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে। ABE (1995)-র এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতে প্রায় 20,000 গ্রাম আছে যেখানে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় 75 মেগাওয়াট। এই সব গ্রামে ফটো ভোল্টাইক সেল ব্যবহার খুব ফলপ্রসু হবে। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাটের প্রায় 300 গ্রামে এই সেলের সাহায্যে রাস্তা আলোকিত (street lighting) করা হয়েছে।

পবনশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের এক অন্যতম দেশ। পবনশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ভারত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। 1994 সনে পবনশক্তির সাহায্যে এদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 182 মেগাওয়াট। 1997 সনে তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে 900 মেগাওয়াটে অর্থাৎ তিন বছরে এর উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় 5 গুণ। ভারতের প্রধান প্রধান পবনশক্তি কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে (ক)

সারণি

ভারতে বায়ুশক্তির বিকাশ (MW)

বর্ষ	1990	1992	1993	1994	1995	1996
বিকাশ (MW)	31	41	54	115	351	733
বর্ষ	1997	1998	1999	2000	2001	2004
বিকাশ (MW)	900	970	1025	1167	1507	2483

Source : Ministry of Non-conventional Energy Sources.

সারণি

বায়ুশক্তির সম্ভাবনা

ক্রম নং	রাজ্য	মোট সম্ভাবনা (MW)	কারিগরী সম্ভাবনা (MW)
1.	অন্ধ্রপ্রদেশ	8,275	1,550
2.	গুজরাত	9,675	1,750
3.	কর্ণাটক	6,620	1,025
4.	কেরালা	875	605
5.	মধ্যপ্রদেশ	5,500	1,200
6.	মহারাষ্ট্র	3,650	2,990
7.	উড়িষ্যা	1,700	680
8.	রাজস্থান	5,400	885
9.	তামিলনাড়ু	3,050	1700
10.	পশ্চিমবঙ্গ	450	450
	মোট	45,195	12,835

তামিলনাড়ু মুপ্পানডল, নাগেরকহল, (খ) অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি, (গ) ওড়িশার সমুদ্র উপকূল অঞ্চল (ঘ) গুজরাট ও (ঙ) মহারাষ্ট্রের আরবসাগরের উপকূল অঞ্চল প্রভৃতি স্থান। ভারতের বিভিন্ন উপকূলে (কন্যাকুমারিকা উপকূল, মালাবার উপকূল, অন্ধ্রউপকূল) ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে পবনশক্তিচালিত বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ আছে।

● **জোয়ার-ভাঁটা শক্তি ঃ** খাঁড়িতে বা অববাহিকায় যেখানে জোয়ার-ভাঁটার প্রকোপ বেশি সেখানে উপযুক্ত স্থানে বাঁধ দিয়ে জোয়ার-ভাঁটা থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই শক্তি উৎপাদনের কাজ সর্বপ্রথমে ফরাসী দেশে চালু হয়েছিল। এখানে লা-রাঁস নদীর খাঁড়িতে সাফল্যের সঙ্গে সর্বপ্রথম জোয়ার-ভাঁটা থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এখানে প্রতি বছরেই 80 লক্ষ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ভারতের মাদ্রাজ উপকূলে একটি স্বল্পক্ষমতা সম্পন্ন জোয়ার-ভাঁটা শক্তির বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের বহু খাঁড়িতে জোয়ার-ভাঁটার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে বোম্বে উপসাগর ও তার লাগোয়া কচ্ছ অঞ্চল জোয়ার ভাঁটার শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী। মিশ্র (1991) 'Technology for Sustainable Development' (ed. B.M. Mukherjee) লিখেছেন বম্বে ও কচ্ছের দুটি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে 8000–9000 মেগোয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়া, দেশের পূর্ব উপকূলে সুন্দরবন অঞ্চলে মিনি হাইডেল প্ল্যান্ট (100–1,000 কি.ও.) স্থাপন করে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই ধরনের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কথা ভাবা হয়েছে।

● **ভূ-তাপীয় শক্তি (Geothermal Energy) ঃ** আমরা জানি মাটির নিচে গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা বাড়ে। অর্থাৎ ভূ-গর্ভের মধ্যে তাপ (heat) লুকিয়ে আছে। এই তাপকে কাজে লাগিয়ে যে শক্তি উৎপাদন হয় তাকে ভূ-তাপ শক্তি বলে। আমাদের দেশের হিমাচল প্রদেশের মণিকরণে পাঁচ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। আজ পর্যন্ত এই দেশে প্রায় সাড়ে তিনশটি উষ্ম প্রস্রবনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে বক্রেশ্বর, লাদাখের পুর্গা, মধ্যপ্রদেশের সরপূজা জেলার তাতাপানি, উত্তরপ্রদেশের অলকানন্দা উপত্যকার ক্যাম্বে বেসিন ও হিমাচল প্রদেশের পার্বতীভ্যালি উল্লেখযোগ্য। ভারতের ভূ-তাপীয় শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অচরাচরিত শক্তি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করছে। বর্তমানে দেশীয় কারিগরীতে 20 kw থেকে 10 kw পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর ভারতে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্য ভূ-তাপীয় শক্তি তে সমৃদ্ধ।

● **জৈব পদার্থ বা জৈব ভর থেকে শক্তি (Biomass Energy) ঃ** মানুষ বহুদিন ধরেই কাঠ, কয়লা, শুকনো লতা-পাতার মত জৈব পদার্থ ব্যবহার করে আসছে। যে সব জৈব-পদার্থ প্রত্যক্ষভাবে জ্বালানো যায় অথবা অত্যন্ত সুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করে জ্বালানো যায়, তাকে জৈব ভর বলে। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সুদীর্ঘ কাল ধরে মানুষের জ্বালানীর প্রধান উৎস ছিল জৈব ভর। ইউরোপীয়রা যখন প্রথম উত্তর আমেরিকায় এসে বসবাস শুরু করলো তখন তাদের জ্বালানীর প্রধান উৎস ছিল কাঠ। তাদের ঘরবাড়ি গরম রাখতে কাঠ ব্যবহার করা হত। জৈব ভর থেকে বিভিন্ন ধরনের শক্তি উৎপাদন করা যায়। নিচে কয়েক প্রকার শক্তি নিয়ে আলোচনা করা হল।

● **রান্না ও ঘর গরম রাখার কাজে কাঠের ব্যবহার ঃ** পৃথিবীর 10 কোটি মানুষ এখনও কাঠ বা কাঠ কয়লা রান্না ও ঘরবাড়ি গরম রাখতে, ব্যবহার করে। যে সব দেশে কাঠের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে, সে সব দেশে ঘরবাড়ি গরম রাখতে বাষ্প ও বিদ্যুৎ তৈরি করতে কাঠের ব্যবহার হয়।

এখনও পর্যন্ত আমাদের গ্রামগুলোতে রান্না ও অন্যান্য কাজে প্রয়োজনীয় শতকরা আশীভাগ শক্তির উৎস হল

জ্বালানী কাঠ, বর্জ্য কৃষিজাত দ্রব্য যেমন-খড়, পাটকাঠি, আখের ছিবড়ে ইত্যাদি। এদেশে বছরে প্রায় চল্লিশ কোটি টন জ্বালানী কাঠ রান্না ও অন্যান্য কাজে লাগে। তবে প্রচলিত উনুনে মাত্র 5% থেকে 10% জ্বালানী কাঠের দহন শক্তি কাজে লাগে। বায়ুর অক্সিজেনের অভাবে কাঠ ঠিকমতো পুড়তে পারে না বলে কম তাপ সৃষ্টি হয়। এছাড়া, উনুনের কাঠের নির্গত ধোঁয়ায় প্রভাবে চোখের অসুখ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস রোগ হতে পারে। এসব কথা চিন্তা করে বিজ্ঞানীরা উন্নত চুলা (চুল্লী) উৎপাদন করেছেন যাতে বছরে আনুমানিক 700 কিঃ গ্রাঃ জ্বালানী কাঠ বাঁচে। এতে কিছুটা অরণ্য সংরক্ষণও হবে। গ্রামীণ ভারতবর্ষে জৈবভর খুব গুরুত্ব পেয়েছে। এটা সমীক্ষিত হয়েছে যে ভারতবর্ষে 93.69 মিলিয়ান হেক্টর অনাবাদী জমি রয়েছে যার মধ্যে 20 মিলিয়ান হেক্টর উৎপাদনক্ষম অ-কৃষি জমি। এখানে প্রতি বছর 400 মিলিয়ান টন জ্বালানী কাঠ উৎপাদিত হতে পারে। এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 60,000 MW-র সমতুল্য। ভারতের অ-চিরাচরিত শক্তি মন্ত্রক দ্রুত উৎপাদনশীল জ্বালানী কাঠের গাছ লাগাবার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

● **কৃষি বর্জ্য ও জ্বালানী ঃ** ধান কেটে নেওয়ার পর ক্ষেতে পড়ে থাকা ধান গাছের গোড়া কিংবা ধানকলে অবশিষ্ট কুঁড়ো এখন উন্নতশীল দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে ধানকলগুলোর বয়লারে ধানের তুষ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, আখের ছিবড়ে দিয়ে কিংবা আখ বাড়াই-এর পরে অবশিষ্ট ব্যাগাসী (bagasse) দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। অনেক সময় এগুলোকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায়। হাওয়াই দ্বীপে এবং আমাদের দেশে এভাবে জ্বালানী কিছুটা সাশ্রয় হয়েছে। ব্রাজিলের চিনিকলগুলোতে প্রচুর পরিমাণ আখের ছিবড়ে পাওয়া যায়। তা থেকে উৎপন্ন ব্রথানল পরিবহনে ব্যবহৃত হয়।

1. আমাদের দেশে কিছু জায়গায় ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করার কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। পাতিয়ালার (পাঞ্জাবে) কাছে জলখেড়ীতে 10 Mw-র একটি কারখানা আছে।

2. ভারতবর্ষে যতগুলো চিনিকল আছে, সেগুলো থেকে যত বর্জ্য বস্তু পাওয়া যায়, তা দিয়ে প্রায় 2,000 Mw বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একটি বড় আকারের চিনিকল থেকে যদি 10 Mw শক্তি উৎপাদন করা যায়, তাহলে ঐ কারখানার প্রয়োজন হবে 4 Mw বিদ্যুৎ শক্তি। বাকী 6 Mw শক্তি কে অন্যান্য কাজে লাগানো যেতে পারে।

● **বর্জ্য পদার্থ ও শক্তি উৎপাদন ঃ** পৃথিবীর সব বড় শহরে প্রতিদিন যে প্রচুর পরিমাণ আবর্জনা সৃষ্টি হয় তার অধিকাংশ উপাদানই হল জৈব পদার্থ। এই সব জৈব পদার্থকে জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে দাহ্য গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায়। এতে জঞ্জাল অপসারণ সমস্যার সমাধান হয়। বিদেশে অনেক শহরে গরম গ্যাসের সাহায্যে সরাসরিভাব গ্যাস টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। দিল্লীর তিমারপুরে এই ধরনের একটি কারখানা (3.75 মেগাওয়াট সম্পন্ন) আছে।

● **জ্বালানী ও জৈবশক্তি ঃ** জৈবভরকে বাষ্পীয় বা তরল জ্বালানীতে পরিণত করে, তা থেকে শক্তি উৎপাদন করা যায়। জৈব পদার্থকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতি পচিয়ে তা থেকে বহু প্রকার তরল জ্বালানী যেমন মেথানল, এথানল ইত্যাদি তৈরি করা যায়। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই দুই তরল জ্বালানী সম্পর্কে খুব আশাবাদী। কারণ অদূর ভবিষ্যতে গাড়িতে পেট্রোলের বদলে এ জাতীয় তরল পদার্থের ব্যবহার বাড়বে। আগেই বলা হয়েছে যে ব্রাজিলে চিনিকলের বর্জ্য পদার্থ (ছিবড়ে) থেকে উৎপন্ন এথানল সে দেশের পরিবহনের কাজে শতকরা 40 ভাগ জ্বালানী সরবরাহ করে। যুক্তরাষ্ট্রে ইদানীং গ্যাসেহল (এথানল-গ্যাসেলিন) এর ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ এতে দূষণ ছড়ায় কম (জৈব জ্বালানী নাইট্রোজেন উৎপন্ন করে না বলে তা দূষণমুক্ত)।

● **জৈবগ্যাস বা বায়োগ্যাস ঃ** ভারতের অনেক গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। এই সব স্থানে গোবর গ্যাস প্রকল্প একটি সম্ভাবনাময় শক্তির আধার। আমাদের দেশে প্রতি বছর 100 বিলিয়ন টনের বেশি গোবর উৎপন্ন

হয়। এ থেকে বছরে 22.425 মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপন্ন করা সম্ভব। কেরোসিনের বিকল্প হিসেবে (i) আলো জ্বালাতে, (ii) রান্নার জন্য এই গ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে। আসলে গোবর গ্যাসে শতকরা প্রায় 60 ভাগ মিথেন গ্যাস থাকে। একটি গরু বা মোষের গোবর থেকে প্রতিদিন গড়ে 200 গ্রাম মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

গোবর গ্যাস প্রকল্পে উৎপন্ন জৈবসার কৃষিকাজে লাগানো যায়। এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে এদেশে বছরে প্রায় 206 মিলিয়ন টন জৈবসার উৎপন্ন হয়। এই বিপুল পরিমাণ সার একদিকে যেমন রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসাবে অর্থনৈতিক সাশ্রয় ঘটায়, অন্যদিকে তেমনই পরিবেশ দূষণ-মুক্ত হয়। গোবর সার ব্যবহার করলে বছরে 20 মিলিয়ন টন খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়বে।

ব্যায়োগ্যাস উন্নয়নে জাতীয় প্রকল্প

2000-01 সাল পর্যন্ত রাজ্যভিত্তিক অনুমিত সম্ভাবনা (Potential)

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	প্ল্যানের অনুমিত সম্ভাবনা	প্ল্যান্ট (সংখ্যা) স্থাপন	শতকরা হার
অন্ধ্রপ্রদেশ	10,65,600	3,08,519	29
অরুণাচলপ্রদেশ	7,500	1,142	15
আসাম	3,07,700	48,059	16
বিহার	9,39,900	1,19,110	13
গোয়া	8,000	3,283	41
গুজরাট	5,54,000	3,43,686	62
হরিয়ানা	3,00,000	42,120	14
হিমাচলপ্রদেশ	1,25,600	43,354	35
জম্মু ও কাশ্মীর	1,28,500	1932	15
কর্ণাটক	6,80,000	3,06,845	45
কেরালা	1,50,500	72,339	48
মধ্যপ্রদেশ	14,91,200	1,92,951	13
মহারাষ্ট্র	8,97,000	6,62,120	74
মণিপুর	38,700	1939	5
মেঘালয়	24,000	1,859	6
মিজোরাম	2500	2,376	95
নাগাল্যান্ড	6,700	1,477	21
উড়িষ্যা	6,05,500	1,71,761	28
পাঞ্জাব	4,11,600	62,708	15
রাজস্থান	9,15,300	66,026	7

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	প্ল্যানের অনুমিত সম্ভাবনা	প্ল্যান্ট (সংখ্যা) স্থাপন	শতকরা হার
সিকিম	7300	2,971	39
তামিলনাড়ু	6,15,800	1,98,838	34
ত্রিপুরা	28,500	1,438	5
উত্তরপ্রদেশ	20,21,000	3,56,311	18
পশ্চিমবঙ্গ	6,95,000	1,87,266	27
আন্দামান ও নিকোবর	2,200	137	6
চণ্ডীগড়	1,400	97	7
দাদরা ও নগর হাভেলী	2,000	169	8
দিল্লী	12,900	675	5
পণ্ডিচেরী	4300	539	13
মোট	1,20,49,900	32,02,047	26.57

উৎস ঃ Ministry of Non-Conventional Energy sources.

সবচেয়ে বড় কথা হল গোবর গ্যাস একটি পরিচ্ছন্ন জ্বালানী। এতে Co_2 উৎপন্ন হয় না। ভারতে বর্তমানে 35 লক্ষ বায়োগ্যাসের কারখানা আছে। এক সমীক্ষায় জানা গেছে 10 লক্ষ বায়োগ্যাসের কারখানা বছরে 4 লক্ষ টন জ্বালানী কাঠের সাশ্রয় করে। নর্দমার নোংরা থেকেও প্রাথমিক পরিশোধনের মাধ্যমে বায়োগ্যাস তৈরি হয়। দিল্লীর কাছে এই ধরনের একটি গ্যাস কারখানা চালু হয়েছে।

উর্জগ্রাম প্রকল্প (Urya Gram) ঃ দেশের সুদূর প্রান্তে শক্তির চাহিদা মেটাবার জন্য এই প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপাদন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্থানীয় সহজলভ্য শক্তির উৎসগুলো থেকে প্রাপ্ত পুনর্ভব শক্তি সরবরাহকে ভিত্তি করে প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। 400-টির বেশি গ্রামে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে।

ধোঁয়াহীন চুল্লা (Smokeless Chullah) ঃ আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষরা এখনও পুরনো প্রথার কাঠের উনুন ব্যবহার করে। এসব উনুনের দহনক্ষমতা কম। উপরন্তু ধোঁয়াও বের হয় প্রচুর। ফলে মহিলাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। আবার যেহেতু এদের দহনক্ষমতা কম, তাই কাঠও লাগে বেশি। এজন্য ভারত সরকারের অচিরাচরিত শক্তি বিভাগ উন্নত মানের চুল্লা ব্যবহারের এক জাতীয় প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এই ধরণের চুল্লাতে একটা লম্বা চিমনি থাকে, একটা বা দুটো, এমনকি তিনটে মুখও থাকে পারে। কটা মুখ আছে সেই অনুযায়ী এগুলোকে সুরভি, সুগম, কষ্ঠি নাম দেওয়া হয়েছে। এতে খড়, পাটকাঠি, শুকনো পাতা ছাড়াও গুল, ঘুটেও ব্যবহার করা যায়। গ্রামাঞ্চলে এই উন্নত চুল্লা ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। 2004 সালের 31শে মার্চ পর্যন্ত 35.2 মিলিয়ান উন্নতমানের চুল্লা বণ্টিত হয়েছে। এ ব্যাপারে চীনের পরই-ভারতের স্থান। এর ফলে 13.2 লক্ষ টন বায়ো-জ্বালানী (bio-fuels) এবং 1.6 লক্ষ লিটার কেরোসিন তেল বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। ভারত সরকারের টার্গেট হল 120 মিলিয়ান গ্রামীণ ও আধা শহরবাসীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা।

মিনি-হাইডেল প্ল্যান্ট ঃ ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কম। এটি পরিবেশ-বন্ধু

এবং পুনর্ভব শক্তির উৎস। বহু দূরবর্তী এবং পাহাড়ী এলাকায় যেখানে ব্যাপক গ্রিড ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়, সেখানে এই ধরণের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। এই ধরণের টেকনোলজি শতাব্দী প্রাচীন, কিন্তু গত দু'দশক যাবৎ এইটি জনপ্রিয় হয়েছে।

ভারতবর্ষের অনুমিত জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা হল প্রায় 15,000 Mw. 2001–02 সালের মধ্যে 420-টি ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের (প্রতিটি 25 MW ক্ষমতাসম্পন্ন) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এদের মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা 1,423 MW। এছাড়া, 187-টি প্রকল্পের (এদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় 521 MW) কাজ চলেছে। 2004 সালের 31শে মার্চ পর্যন্ত মোট 1,602 MW ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। ভারতের 13-টি রাজ্য (হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থান) ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যিক মিনি প্ল্যান্ট প্রকল্প ঘোষণা করেছে।

রাজ্য-ভিত্তিক চিহ্নিত (identified) মিনি হাইডেল প্ল্যান্ট

25 MW ক্ষমতাসম্পন্ন (2001–02 সাল)

রাজ্যের নাম	চিহ্নিত প্ল্যান্টের সংখ্যা	মোট ক্ষমতা MW
হরিয়ানা	22	30.05
হিমাচল প্রদেশ	323	1,624.78
জম্মু ও কাশ্মীর	201	1,207.27
পাঞ্জাব	78	65.26
রাজস্থান	49	27.26
উত্তরাঞ্চল	445	1,472.93
গুজরাত	290	156/83
মধ্যপ্রদেশ ও ছত্রিশগড়	125	410.13
মহারাষ্ট্র	234	599.47
অন্ধ্রপ্রদেশ	286	254.63
কর্ণাটক	230	652.61
কেরালা	198	466.85
তামিলনাড়ু	147	338.92
বিহার ও ঝাড়খন্ড	171	367.97
উড়িষ্যা	161	156.76
সিকিম	68	202.75
পশ্চিমবঙ্গ	145	182.62
অরুণাচলপ্রদেশ	492	1,059.03
আসাম	46	118.00

রাজ্যের নাম	চিহ্নিত প্ল্যান্টের সংখ্যা	মোট ক্ষমতা MW
মণিপুর	96	105.63
মেঘালয়	98	181.39
মিজোরাম	88	190.32
নাগাল্যান্ড	86	181.39
ত্রিপুরা	8	9.85
আন্দামান ও নিকোবর	6	6.40
গোয়া	3	2.60
মোট	4,096	10,71,81

উৎস : Ministry of Non-conventional Energy Sources.

চিরাচরিত ও অচিরাচরিত শক্তির পার্থক্য :

বিষয়	চিরাচরিত শক্তি	অচিরাচরিত শক্তি
১। সংজ্ঞা	যে সকল শক্তি বহুকাল আগে থেকে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তাদেরকে **চিরাচরিত শক্তি** বলে।	প্রচলিত শক্তির বাইরে যে সকল শক্তির ব্যবহার খুব একটা নেই বা খুবই কম, তাকে **অচিরাচরিত বা অপ্রচলিত** শক্তি বলে।
২। ব্যবহারের সময়কাল	চিরাচরিত শক্তি বহু প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।	এই শক্তি নতুন। বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন থেকে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে।
৩। ব্যবহারকারী দেশ	পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রকার শক্তি ব্যবহৃত হয়।	কারিগরি বিদ্যায় উন্নত দেশগুলিতে এই শক্তির ব্যবহার বেশি।
৪। উৎপাদন ব্যয়	এই শক্তির উৎপাদক ব্যয় বেশি।	এর উৎপাদন ব্যয় কম।
৫। নিঃশেষের সম্ভাবনা	এই শক্তির ভান্ডার সীমিত। তাই একদিন এগুলির ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	এই শক্তি পুনর্ভব বা নবীকরণযোগ্য। কারবার ব্যবহারেও ভবিষ্যতে এর ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।
৬। পরিবেশ দূষণ	এই শক্তি ব্যবহারে পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত হয়।	এই শক্তির ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।
৭। উদাহরণ	কয়লা, খনিজ তেল, প্রভৃতি চিরাচরিত শক্তি।	বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি, জোয়ার-ভাঁটা, ভূতাপ শক্তি প্রভৃতি অচিরাচরিত শক্তি।

☐ অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বাড়ছে কেন?

শক্তি আহরণের প্রচলিত বা চিরাচরিত উৎসগুলি (যেমন— কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস) গচ্ছিত বা অপুনর্ভব সম্পদ। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন এগুলি নিঃশেষিত হচ্ছে, তেমনিভাবে পরিবেশ

দূষণের মাত্রাও দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শক্তি ব্যবহারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণগুলি হল ঃ—

(1) এই শক্তির উৎসগুলি পূরণশীল বা অফুরন্ত অর্থাৎ এইগুলি ব্যবহারের ফলে কোনদিন নিশেঃষিত হবে না।

(2) এই শক্তিগুলির উৎসকেন্দ্রগুলি থেকে শক্তি আহরণে ও এই শক্তির ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের কোন সম্ভাবনা নেই।

(3) অল্প খরচে ছোট ছোট শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই শক্তির জোগান দেওয়া সম্ভব।

(4) এই শক্তি উৎপাদনের প্রাথমিক খরচ বেশি হলেও পরবর্তীকালের খরচের পরিমাণ খুবই কম।

(5) অনেক দরিদ্র ও অনুন্নত দেশ উন্নত দেশগুলির কারিগরি বিদ্যার সুযোগ নিয়ে শক্তি ব্যবহারে সক্ষম হয়ে উঠেছে।

(6) বহুমুখী ব্যবহারের সুবিধার জন্য এই শক্তির উৎসগুলির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তাই বলা হয়ে থাকে — "It is the energy of the future."

3.2.2 খনিজ সম্পদ

❑ **খনিজ ঃ (Minerals)**

কোন দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে খনিজ সম্পদের বিরাট ভূমিকা আছে। কয়লা ও লোহাকে কেন্দ্র করেই ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে চীন, C.I.S. ও পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতি যে খনিজ তেল ও গ্যাসের রপ্তানীর ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল তা বলা চলে। জাম্বিয়া, চিলি, ভেনেজুয়েলা, গিয়ানা ও জামাইকার মত অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনীতি খনিজ সম্পদ রপ্তানীর ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। অবশ্য এখনও অনেক দেশে প্রধানত মূলধনের অভাবে খনিজ সম্পদকে কাজে লাগান সম্ভব হয়নি।

ভূগর্ভ বা খনি থেকে যে সব পদার্থ উত্তোলন করা হয়, সাধারণভাবে তাদের খনিজ সম্পদ বলে, যেমন কয়লা, খনিজ তেল, লোহা আকরিক ইত্যাদি। কখনও কখনও ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগেও খনিজ পদার্থ সঞ্চিত থাকে। এখন প্রশ্ন হল খনিজ কী? খনিজ হল প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এমন এক বস্তু যা একই উপাদানে গঠিত বা অন্যান্য পরিবর্তিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠিত এক যৌগিক পদার্থ। কোন কোন খনিজ কেবল একটি মৌলিক উপাদানে গঠিত, যেমন সোনা, রুপো, হীরে প্রভৃতি। এই রাসায়নিক মিলন এমনভাবে ঘটে থাকে যে তার সাথে মৌলিক উপাদানগুলোর আর কোন প্রকার মিল থাকে না।

খনিজ সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (1) ধাতব খনিজ ও (2) অধাতব খনিজ। এই দুই প্রকার খনিজকে আবার কয়েকটি উপরিভাগে ভাগ করা যায়। নীচে খনিজ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হল ঃ

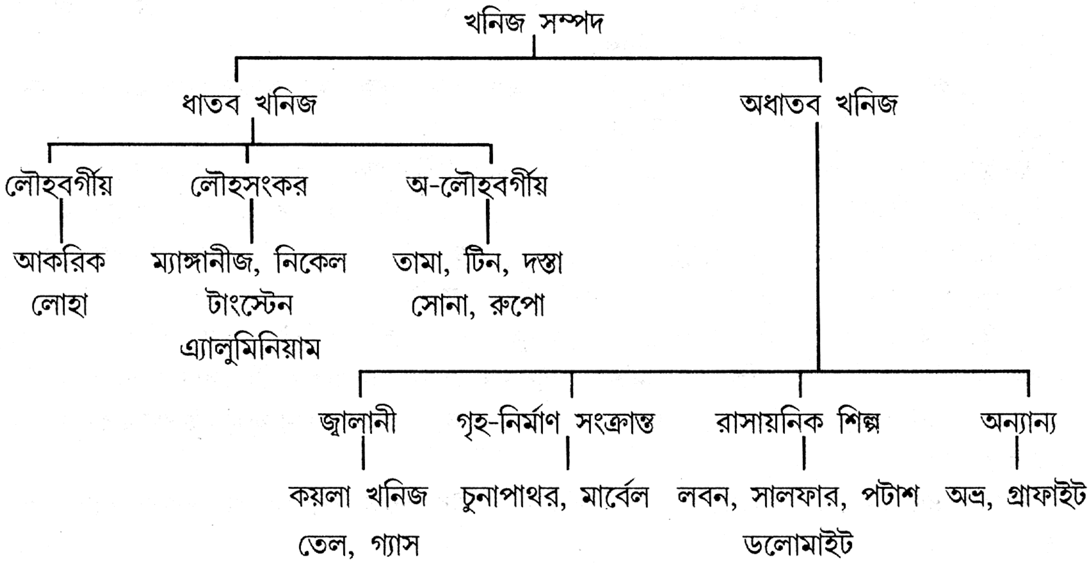

ধাতব খনিজ যেমন আকরিক লোহা, নিকেল, টাংস্টেন থেকে বিভিন্ন প্রকার ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। ধাতুর মত চক্চকে এই খনিজগুলোকে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল, নিষ্প্রভ চুনাপাথর, ডলোমাইট থেকে নিষ্কাশন করা যায় না! এগুলো খনি থেকে উত্তোলন করে সরাসরি শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

আকরিক লোহা (Iron Ore)

শ্রেণীবিভাগ ঃ লোহা কখনও বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন শিলার সঙ্গে এটি মিশে থাকে। খনি থেকে এটিকে উত্তোলন করে প্রথমে নিষ্কাশন করে নিতে হয়। যদিও অধিকাংশ শিলাতে কিছু না কিছু পরিমাণ লোহা থাকে, তথাপি বাণিজ্যিক সুবিধের জন্য সাধারণত বেশি লৌহযুক্ত আকরিক থেকেই লোহা নিষ্কাশন করা হয়। অবশ্য লোহার ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য অনেক সময় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টমানের আকরিক থেকেও উন্নত নিষ্কাশন পদ্ধতির সাহায্যে লোহা নিষ্কাশন করা হয়। অবশ্য লোহার ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য অনেক সময় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টমানের আকরিক থেকেও উন্নত নিষ্কাশন পদ্ধতির সাহায্যে লোহা নিষ্কাশন করা হয়। লোহার পরিমাণের পার্থক্য অনুসারে লৌহ অনুসারে লৌহ আকরিককে 5 ভাগে ভাগ করা যায়।

ম্যাগনেটাইট (Magnetite) ঃ কালো রঙের সর্বোৎকৃষ্ট এই লৌহ আকরিককে শতকরা প্রায় 72, ভাগের বেশী লোহা থাকে। বৈদ্যুতিক শিল্পে এই আকরিকের চাহিদা আছে। Lodestone জাতীয় ম্যাগনেটাইটের এত বেশী চুম্বক শক্তি আছে যে তাকে প্রাকৃতিক চুম্বক বলে।

হেমাটাইট (Haematite—Fe_2O_3) ঃ রক্তবর্ণের এই আকরিকে শতকরা 65 ভাগ লোহা থাকে। যদিও ম্যাগনেটাইটের তুলনায় হেমাটাইটে আকরিকের ভাগ কম থাকে, তবুও লোহা ও ইস্পাত শিল্পে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। তাই একে শিল্পীয় **আকরিক লৌহ** বলে।

লিমোনাইট (Limonite—$2Fe_2O_3H_2O$) ঃ পিতাভ বাদামী রঙের এই লৌহ আকরিকে শতকরা প্রায় 65 ভাগ লোহা থাকে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর এই লৌহআকরিককে ব্লাস্ট ফার্নেসে ব্যবহারের আগে প্রোসেসিং করতে হয়। জলাভূমিতে যে লিমোনাইট পাওয়া যায়, তাকে **জলা লৌহ (Bog Iron)** বলে।

সিডেরাইট (Siderite—$FeCO_3$) ঃ ধূসর ছাই রঙের এই আকরিকে শতকরা 20 থেকে 30 ভাগ লোহা থাকে। এটি অত্যন্ত নিম্নমানের লৌহ আকরিক।

ট্যাকেনাইট ঃ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাকেনাইট নামে এক ধরনের নিম্নমানের আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশিত হচ্ছে। এতে লোহার পরিমাণ শতকরা 25-30 ভাগ।

ব্যবহার ঃ ধাতু হিসেবে লোহা খুব শক্ত ও কঠিন। সুদূর অতীতকাল থেকে এর ব্যবহার হয়ে আসছে, যদি ব্লাস্ট ফার্নেস আবিষ্কারের পর থেকে এর ব্যবহার বেড়ে গেছে। আধুনিক সভ্যতা লোহা ও ইস্পাত নির্ভরশীল। গৃহস্থালীর সামান্যতম জিনিস থেকে শুরু করে বৃহদায়তন শিল্প পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই লোহার ব্যবহার দেখা যায়। কৃষি, শিল্প, পরিবহন সব ক্ষেত্রেই লোহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ঢালাই লোহা ও পিণ্ড লোহার ব্যবহার করেই মানুষ থেমে থাকেনি, লোহার সাথে ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, নিকেল, টাংস্টেন প্রভৃতি ধাতু পরিমাণগত মিশিয়ে মানুষ নানা ধরনের ইস্পাত তৈরী করতে সক্ষম হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার ইস্পাতের ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। তাই বর্তমান যুগকে **ইস্পাতের যুগ** বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারত ঃ ভারতের গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, কর্ণাটক রাজ্যে বেশী পরিমাণে আকরিক লোহা পাওয়া যায়।

গোয়া ঃ যদিও ভারতবর্ষের মোট সঞ্চয়ের 5 শতাংশ এই রাজ্যে রয়েছে, তবুও ভারতের মধ্যে 18 শতাংশ। আকরিক এই রাজ্যে উত্তোলিত হয়, যদিও এখানকার আকরিক খুব উন্নত মানের নয়। এখানে ম্যাগনেটাইট-জাতীয় আকরিক পাওয়া যায়। এই রাজ্যের বিচোলিখ, সাকোয়ালিম, সাথারি ও মপুসাতে প্রচুর আকরিক পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশ ঃ এই রাজ্যে ভারতের লৌহ আকরিকের মোট সঞ্চয়ের 25 শতাংশ রয়েছে এবং দেশের মোট উত্তোলনের প্রায় 19 শতাংশ এ রাজ্য থেকে পাওয়া যায়। এই রাজ্যের দ্রুগ জেলার দাল্লিরাজহারা একটি প্রধান লৌহখনি অঞ্চল। মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণে বাস্তার জেলার বাইলাডিলায় লৌহখনি আছে। এখান থেকে আকরিক জাপানে রপ্তানী করা হয়।

চিত্র 3.46 ঃ ভারতের লৌহ ক্ষেত্র

ঝাড়খণ্ড ঃ যদিও এই রাজ্যে ভারতের 21 শতাংশ আকরিক সঞ্চয় আছে, তবুও এখান থেকে দেশের 14 শতাংশ আকরিক উত্তোলিত হয়। এই রাজ্যের সিংভূম জেলার গুয়া, নোয়ামুন্ডি, পালামৌ জেলার ডালটনগঞ্জে বেশীর ভাগ আকরিক পাওয়া যায়। স্থানীয় ইস্পাত শিল্পে এখানকার আকরিক ব্যবহার করা হয়।

ওড়িশা ঃ এখানে ভারতের 30 শতাংশ আকরিক সঞ্চিত আছে। তবে ভারতের 22 শতাংশ আকরিক এখান থেকে পাওয়া যায়। এই রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ জেলার গুরুমহিষাণী, সুলাইপাত, বাদামপাহাড়, কেওনঝাড় জেলার বনানী ও কিরিবুরু ও সুন্দরগড় জেলার বোনাই এলাকায় লৌহখনি আছে। জামশেদপুর, বার্ণপুর, রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর ও বোকারো ইস্পাত কারখানায় এখানকার আকরিক ব্যবহার করা হয়।

কর্ণাটক ঃ এখানে দেশের প্রায় 15 শতাংশ আকরিক সঞ্চয় আছে। দেশের মোট উত্তোলনের 9 শতাংশ কর্ণাটক রাজ্য থেকে আসে। এখানকার বাবাবুদান পাহাড়, বেলারী, চিত্রদূর্গ, হসপেট ও টুমকুরে লৌহখনি আছে। এখানে হেমাটাইট জাতীয় আকরিক পাওয়া যায়। এখানকার বেশীরভাগ আকরিক বিন্দেশরায়া (ভদ্রাবতী) আয়রন অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কসে ব্যবহার হয়। সম্প্রতি এই রাজ্যের কুদ্রেমুখে একটি লৌহখনি আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার রেডি, অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর, কুর্ণল, গুন্টুর, তামিলনাড়ুর সালেম ও তিরুচিরাপল্লীতে লৌহখনি আছে।

সারণি

আকরিক লোহার উৎপাদন (০০০ টন)

রাজ্য	উৎপাদন	% উৎপাদন	মোট মূল্য কোটি টাকায়
1. কর্ণাটক	24,044	24.80	76,41,457
2. উড়িষ্যা	21,518	22.19	48,34,183
3. ছত্রিশগড়	19,358	19.97	66,45,564
4. গোয়া	17,502	18.05	49,48,395
5. ঝাড়খণ্ড	13,684	14.11	29,74,943
6. অন্যান্য	856	0.88	59,937
সর্ব ভারত	**96,962**	**100.00**	**2,71,04,479**

Souce : Data computed from Statistical Abstract India 2003, P. 74.

সারণি
আকরিক লোহার উৎপাদন (মিলিয়ন টন)

বর্ষ	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
উৎপাদন	4.1	18.7	34.3	41.6	54.9	68.1	75.7	72.2	77.6	80.6	86.2	96.9
মূল্য কোটি টাকায়	2.3	13.5	40.1	144.3	535.7	1479.5	1819.7	1855.9	1973.7	2117.9	2496.9	2710.4

Source : Statistical Abstract India 1997 and 2003.

সারণি
আকরিক লোহার রপ্তানী

বর্ষ	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1995-96	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
পরিমাণ (মি.টন)	3.2	21.2	22.4	32.5	31.7	20.2	23.08	57.09	--
মূল্য (কোটি টাকায়)	17	117	303	1,049	1,721	1,634	2,034	4,200	5,173

❑ ম্যাঙ্গানীজ (Manganese)

লৌহ-সংকর ধাতুর মধ্যে ম্যাঙ্গানীজের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। লৌহ-ইস্পাত শিল্পে উন্নত দেশগুলোতে ম্যাঙ্গানীজের ব্যবহার বেশী লক্ষ্য করা যায়।

ম্যাঙ্গানীজের প্রধান ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ইস্পাত শিল্পে। পৃথিবীর উৎপাদিত ম্যাঙ্গানীজের 90 শতাংশ এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা লোহার সঙ্গে ম্যাঙ্গানীজ মিশিয়ে ইস্পাতে পরিণত করা হয়। ইস্পাতের মধ্যে শতকরা 12 থেকে 14 ভাগ ম্যাঙ্গানীজ থাকলে তা চুম্বকশক্তিহীন হয়। তাপ ও বিদ্যুতের কুপরিবাহী বলে এই ধরনের ইস্পাত বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত ম্যাঙ্গানীজের 10 শতাংশ রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহার করা হয়। কাঁচের রঙ পাল্টাতে, ব্লিচিং পাউডার তৈরী করতে, বয়ন শিল্পের রাসায়নিক দ্রব্য হিসেবে, মৃৎশিল্পে এবং কীটনাশক তরল তৈরী করা ছাড়াও শুষ্ক ব্যাটারী কোষ (Dry battery cell) নির্মাণে, ফটো তোলার কাজে, সার প্রস্তুতে ম্যাঙ্গানীজ ব্যবহৃত হয়।

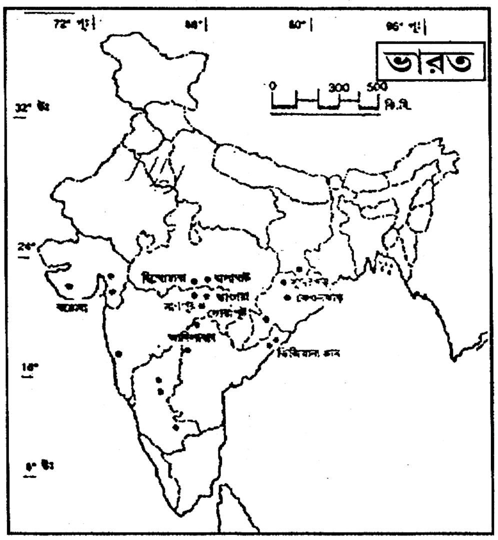

চিত্র 3.47 ঃ ভারতের ম্যাঙ্গানিজ ক্ষেত্র

মিশ্র ধাতু উৎপাদনেও এটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তামা ও নিকেলের সাথে ম্যাঙ্গানীজ মিশিয়ে যথাক্রমে ম্যাঙ্গানীজ ব্রোজ ও ম্যাঙ্গানীজ ধাতু (Manganin) তৈরী করা হয়।

❑ ম্যাঙ্গানীজ আকরিকের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Manganese ore)

প্রকৃতিতে বহু প্রকার ম্যাঙ্গানীজ আকরিক (পাইরোলুনাইট, সিলোমিলেন, ব্রনাইট ও হসম্যানাইট) পাওয়া গেলেও প্রথমোক্ত দু'প্রকার থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদন করা হয়। উপরোক্ত দুই আকরিক থেকে ম্যাঙ্গানীজ নিষ্কাশন করতে ইলেকট্রোলাইটিক পদ্ধতি (electrolytic) ব্যবহার করা হয়।

ভারতে 18.7 কোটি মেট্রিক টন ম্যাঙ্গানিজ সঞ্চিত আছে। লৌহ আকরিক যুক্ত শিলা, চুনাপাথর, ডলোমাইট ও খোন্দালাইট (Khondalite) শ্রেণীর পাথরে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়, কর্ণাটক অন্ধ্রপ্রদেশ প্রধান ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদক রাজ্য (2002-03) সালের উৎপাদনের ক্রম অনুযায়ী।

ম্যাঙ্গানীজের উৎপাদন (০০০ টন) (2002-03)

রাজ্য	উৎপাদন	%	মূল্য 000 টাকায়
1. উড়িষ্যা	616	37.06	8,37,557
2. মহারাষ্ট্র	397	23.89	7,81,228
3. মধ্যপ্রদেশ	339	20.39	6,25,274
4. কর্ণাটক	223	13.42	1,64,462
5. অন্ধ্রপ্রদেশ	73	4.39	34,479
অন্যান্য	14	0.85	12,229
সর্ব ভারত	1,662	100.00	24,55,229

Source : Data Computed from Statistical Abstract, India 2003. p. 75.

সারণী ঃ ভারতে ম্যাঙ্গানীজের বন্টন

রাজ্য	ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদক অঞ্চল
1. উড়িষ্যা	বোনাই, কোরাপুট, জামদা, কয়রা
2. মহারাষ্ট্র	1. নাগপুরের রামডুংরি, কোদারগাঁও, গুমগাঁও, লোহারডুংরি, মনিগাঁও
	2. ভান্ডারা জেলার বুজরুম, কুসুমবা
	3. দক্ষিণ রত্নগিরি জেলার ফনডিস, গালেল
3. মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড়	1. বালাঘাট জেলার কাঠগোড়িয়া, লাঙ্গুর, ভরওয়ালি, তিরোদি, সালওয়া, চিকপারা
	2. ছিন্দওয়ারা জেলার সীতাপুর, মাচিওয়ানা
	3. ঝাবুয়া জেলার রামপুর, মান্ডি তুমডিয়া, বন্দিওয়ার
4. কর্ণাটক	1. শিমোগা জেলার শংকরগুড্ডা, রামদুর্গ
	2. উত্তর কানাড়া জেলার লোনদা, সুপা
5. অন্ধ্রপ্রদেশ	সালুর-ভদ্রপুরম, শ্রীকাকুলাম জেলার গারিভিডি, চিপুরাপল্লী
6. গোয়া	পেরনেম ও বারদের জেলা
7. বিহার	গাংপুর, কোলহান, ঘাটকুরি, গুয়া-ঝাড়খণ্ড
8. গুজরাট	বামনকুঁয়া, শিবরাজপুর অঞ্চল

উৎপাদন ও বাণিজ্য ঃ 1951 সাল থেকে 2002 সালের মধ্যে দেশে ম্যাঙ্গানীজের উৎপাদন অনেক বেড়েছে। 1951 সালে ভারতে প্রায় 14 লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়। 2002-এ এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 17 লক্ষ টন (সারণি দ্রষ্টব্য)।

ভারতে ম্যাঙ্গানিজের অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম। সে কারণে মোট উৎপাদনের প্রায় 85 শতাংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানিতে ভারতের স্থান প্রথম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উন্নত দেশগুলি ভারত থেকে ম্যাঙ্গানিজ আমদানি করে।

সারণি

ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের উৎপাদন (লক্ষ টনে)

বর্ষ	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
উৎপাদন	13.98	14.05	18.41	15.32	13.88	18.71	16.42	15.38	15.86	15.95	15.87	16.32
মূল্য কোটি টাকায়	10.6	8.0	8.4	25.0	57.7	176.0	177.7	173.8	193.1	197.7	213.2	245.5

Source : Statistical Abstruct of India. 1997 and 2003.

ম্যাঙ্গানিজের রপ্তানী

বর্ষ	1970-71	1975-76	1980-81	1990-91	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
রপ্তানী 000 টন	1,636	786	609	318	259	167	76	265	248	336
মূল্য কোটি টাকায়	13.98	17.51	12.69	44.19	43.00	18.97	19.79	59.54	54.3	69.34

Source : (i) Indian Bureau of Mines. (ii) Statistical Abstract India 2003, P. 191.

❑ বক্সাইট (Bauxite)

অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর প্রধান আকরিক বক্সাইটের নামকরণ হয়েছে ফ্রান্সের লা বক্স (Les Baaux) গ্রামের নামে। ঐ গ্রামেই এই আকরিকের আবিষ্কার হয়েছিল। প্রাচীন যুগের মানুষ এই আকরিক সম্বন্ধে কিছুই জানত না। এমনকি, 1896 সালে ধাতু-রসায়নবিদ চার্লস মার্টিন হল (Charles Martin Hall)-এর বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এই ধাতুর তেমন কোন ব্যবহার ছিল না।

বক্সাইট ক্রান্তীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের দেশগুলোতে শুষ্ক ও আর্দ্র ঋতুর চক্রাকার পরিবর্তনের ফলে কৌশিক প্রক্রিয়ায় (capallary action) ল্যাটেরাইটের মতই বক্সাইটের উৎপত্তি হয়। আর্দ্র ঋতুতে বৃষ্টিপাতের জন্য ধৌত প্রক্রিয়ার (leaching process) ফলে শিলাস্তরের লৌহ ও অন্যান্য খনিজ দ্রবীভূত (saturated) হয়ে অপসারিত হয়। শুষ্ক ঋতুতে অবশিষ্ট অ্যালুমিনা ও সিলিকেট মিলিত হয়ে বক্সাইটে পরিণত হয়।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে বাণিজ্যিকভাবে সাফল্য লাভ করতে গেলে বক্সাইটের মধ্যে শতকরা প্রায় 40 ভাগ অ্যালুমিনা থাকতে হবে। আবার বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের খরচ প্রচুর, কারণ 6 টন বক্সাইট থেকে 1 টন অ্যালুমিনিয়াম তৈরী হয়। আবার এই পরিমাণ বক্সাইট নিষ্কাশন করতে যে পরিমাণ জ্বালানীর প্রয়োজন হয়, তার খরচ গরীব দেশগুলোর পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। যে সব দেশে সস্তায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন

হয়, সেখানেই বাণিজ্যিকভাবে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন সম্ভব। এই কারণে বক্সাইট উৎপাদক দেশ ও অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক দেশের মধ্যে একটা ফারাক দেখা যায়। শিল্পোন্নত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে উন্নত, কিন্তু বক্সাইট উৎপাদনকারী গিনি, ব্রাজিল, ভারত, সুরিনাম অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে পশ্চাৎপদ।

ব্যবহার ঃ বক্সাইট হল অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের কাঁচামাল। অ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত মজবুত, হাল্কা, নমনীয় অথচ সহজে ক্ষয় হয় না বা মরচে (rust) ধরে না বলে একে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা চলে। অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

বিমান, রেল, ওয়াগান ও কোচ, সড়কযান নির্মাণে হাল্কা, অথচ দৃঢ় এই ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কেটলি, ইস্ত্রি, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার প্রভৃতি গৃহস্থালী দ্রব্য অ্যালুমিনিয়ামের সাহায্যে প্রস্তুত হয়।

অ্যালুমিনিয়ামের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা খুব বেশী। ইদানীংকালে দামী তামার তারের বদলে সস্তা অ্যালুমিনিয়াম তারের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

অত্যন্ত ক্ষয়রোধকারী বলে নানাবিধ রাসায়নিক শিল্পে এটি ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়ামের সাথে 8 থেকে 12 ভাগ তামা মিশিয়ে যে সংকর ধাতু প্রস্তুত হয়, তা লরীর গিয়ার বক্স তৈরীতে কাজে লাগে। আবার তামার সাথে শতকরা 12 ভাগ সিলিকন মিশিয়ে যে সংকর ধাতু প্রস্তুত হয়, তা অত্যন্ত নমনীয় হয় বলে প্রচণ্ড আঘাতজাতীয় শক (shock) প্রতিরোধ করতে পারে। অতি বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে হেড লাইটের প্রতিফলক (Reflector) আয়না (mirror) তৈরী হয়। চকলেট, মিষ্টি খাবার ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মোড়ক ও দুধের বোতলের ঢাকনা হিসেবে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়।

ভারতের বিভিন্ন উৎপাদক অঞ্চল ঃ—

(a) **ওড়িশ্যা ঃ** ভারতের সর্বপ্রধান বক্সাইট উত্তোল অঞ্চল ওড়িশ্যা। এখানে 2002-03 সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 49.04 লক্ষ টন। এখানকার গন্ধমাদন মালভূমি, বোলাঙ্গির পাহাড়, মঞ্জিমালি পাহাড় অঞ্চলে কালা হান্ডি, কোরাপুট ও সম্বলপুর জেলাতে বক্সাইট উত্তোলিত হয়। এখানে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ 150 কোটি মেঃ টন।

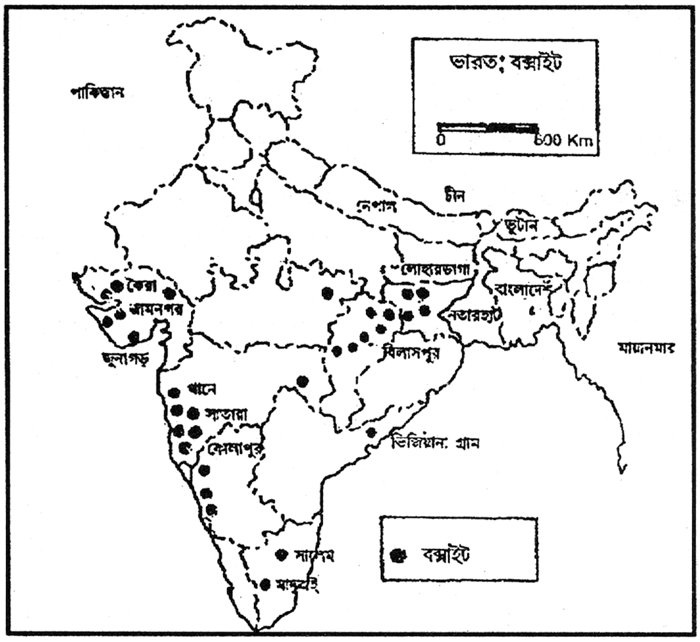

চিত্র 3.48 ঃ ভারতের বক্সাইট ক্ষেত্র

(b) **গুজরাট ঃ** বক্সাইট উত্তোলনে উড়িষ্যার পর গুজরাটের স্থান দ্বিতীয়। এখানে 2002-03 সালে উত্তোলনের পরিমাণ ছিল 30.75 লক্ষ মে. টন। গুজরাট রাজ্যের আবহাওয়া এবং মৃত্তিকা বক্সাইট সৃষ্টির প্রধান কারণ। এখানকার বক্সাইট সঞ্চিত অঞ্চলটি প্রধানত সমুদ্রতটের নিকটবর্তী কচ্ছ উপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে প্রায় 48 কি.মি. লম্বা এবং 5 কিমি চওড়া একটি বলয়ে বক্সাইট সঞ্চিত রয়েছে।

এখানকার প্রধান বক্সাইট উত্তোলক অঞ্চলগুলি জামনগর, খেদা, জুনগড়, ভবনগর, কচ্ছ কৈরা প্রভৃতি।

(c) ঝাড়খণ্ড ঃ ভারতে বক্সাইট উত্তোলক ঝাড়খণ্ডের স্থান তৃতীয়। 2002-03 সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 13.34 লক্ষ টন। এখানকার প্রধান কেন্দ্রগুলি রাঁচি ও পালামৌ জেলাতে অবস্থিত।

(i) রাঁচি— লোহারডাগা, জর্দাপাহাড়, মাণ্ডুয়াপাট, ময়দান পাট, বাগড় পাহাড়, সেরাদ প্রধান।

(ii) পালামৌ জেলা— নেতার হাট, জামির পাট, রাচনপাট, রমাপাট, জোড়া ডুমার উল্লেখযোগ্য।

এখানে উত্তোলিত বক্সাইট খুব উচ্চমানের এবং এই বক্সাইট থেকে প্রায় 50-60 শতাংশ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়।

(d) **মহারাষ্ট্র ঃ** বর্তমানে বক্সাইট উত্তোলনে ভারতে চতুর্থ। বর্তমান উৎপাদন 10.12 (2003) লক্ষ মে. টন। এখানকার মালভূমি অঞ্চলে বক্সাইটের সঞ্চয় দেখা যায়। এখানকার প্রধান উত্তোলন কেন্দ্রগুলি কোলাপুর, রত্নগিরি, সাতার, মানে, কোলবা অঞ্চলে অবস্থিত। তবে এদের মধ্যে প্রধান অঞ্চলগুলি হল— কোলাপুর জেলার উদয়গিরি, ধাঙ্গারভাদি, রাধানগর, ইডানগর প্রভৃতি।

ছত্তিশগড় ঃ বক্সাইট উত্তোলনে এই রাজ্যে ভারতের পঞ্চম স্থানে রয়েছে। বর্তমানে উত্তোলন 7.10 লক্ষ মে. টন। এখানকার বক্সাইট উন্নতমানের। এই বক্সাইট থেকে প্রাপ্ত অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ 50-60 শতাংশ। এখানকার প্রধান উৎপাদন অঞ্চলগুলি বিলাসপুর, বস্তার, দূর্গ, রায়গড়, বালাঘাট প্রভৃতি জেলায় অবস্থিত। এদের মধ্যে—

(i) **বিলাসপুর**— পুটকা পাহাড়, লড্ডি পাহাড়, মহাদেও পাকে এবং (ii) বস্তার জেলার বাইলাডিলা প্রধান উত্তোলন ক্ষেত্র।

মধ্যপ্রদেশ ঃ মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের বক্সাইট যথেষ্ট উন্নত মানের। এখানকার প্রধান উৎপাদন কেন্দ্রগুলি প্রধানত মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে-(i) অমরকণ্টক মালভূমির সারগুজা।

■ বক্সাইট আকরিকের সঞ্চয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের স্থান ■

মহারাষ্ট্র—28 শতাংশ	বিহার—15.5 শতাংশ	কর্ণাটক— 7 শতাংশ
মধ্যপ্রদেশ— 22 শতাংশ	গুজরাট— 11 শতাংশ	তামিলনাড়ু — 4 শতাংশ

মহাকাল পর্বতের শাদোল, মণ্ডলা, বালাঘাট। এছাড়া জব্বলপুর, রেওয়া, সাতনা এবং শিবপুরি জেলাতেও বক্সাইট উত্তোলিত হয়।

তামিলনাড়ু ঃ তামিলনাড়ুর প্রধান বক্সাইট উত্তোলন কেন্দ্রগুলি প্রধানত তিনটি জেলাতে অবস্থিত-

(i) নীলগিরি জেলা - কোট্টক্কিরি, কুর্জন উপত্যকা, উটি।

(ii) মাদুরাই - পলিগি ও কোদাইকানাল পাহাড়ি অঞ্চল, এবং

সারণি

ভারতের প্রধান প্রধান বক্সাইট উত্তোলক রাজ্য (2003)

রাজ্য	উত্তোলন (লক্ষ মে. টন)	%
ওড়িশা	30.75	50
গুজরাট	15.82	16
ঝাড়খণ্ড	13.34	12
মহারাষ্ট্র	10.12	10
ছত্তিশগড়	7.10	6
অন্যান্য	6.54	6
ভারত মোট	83.37	100

(iii) সালেম প্রধান। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে কনোমালাই পাহাড়েও কিছু বক্সাইট উত্তোলিত হয়। এখানকার খনি গুলিতে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 31%—42%.

উপরে বর্ণিত অঞ্চলগুলি ছাড়া ভারতের অন্যান্য উত্তোলন কেন্দ্রগুলি হল ঃ—

কর্ণাটক ঃ বেলগাঁও, চিকমাগালুর, চিত্রকূট, বাবাবুদান পাহাড় অঞ্চল।

গোয়া ঃ কুয়েপেম, ক্যানকোনা।

কেরালা ঃ পালাকাজ, ইদুকি।

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ অনন্তগিরি মালভূমি, বিশাখাপত্তনম।

উত্তরপ্রদেশ ঃ ললিতপুর, বারাণসী, এলাহাবাদ।

জম্মু ও কাশ্মীর ঃ পুঞ্জ, রিয়াসি, উধমপুর প্রধান। এখানে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 55%।

বাণিজ্য ঃ ভারত একসময় বক্সাইট রপ্তানি করলেও বর্তমানে জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের উন্নতি ঘটেছে এবং উত্তোলিত বক্সাইট দেশের বিভিন্ন অ্যালুমিনিয়াম কারখানাতেই ব্যবহৃত হয়। রপ্তানি প্রায় হয় না বললেই চলে। বক্সাইটের উৎপাদন 1951 সালে যেখানে ছিল মাত্র 68 হাজার মেট্রিক টন, সেখানে 1971 তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল 15.17 লক্ষ টন। 2002 সালের হিসাব মত বক্সাইট উত্তোলনের পরিমাণ আরো প্রায় দেড় গুণ পেয়ে 93 লক্ষ টনে পৌঁছেছে। ফলে ভারত থেকে বক্সাইট রপ্তানীর পরিমাণ কমে গেছে। ভারত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাপানে বক্সাইট রপ্তানি করে থাকে। ভারত থেকে বক্সাইট আমদানিকারী দেশগুলি হল জার্মানী, ব্রিটেন, জাপান ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে বক্সাইট একটি ভারহ্রাস কাঁচামাল (Weight Loosing Raw Material)। ফলে আধুনিক নৌ-পরিবহনের সুবন্দোবস্ত ছাড়া আমদানিকৃত বক্সাইট থেকে সুলভে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন ঃ

বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। 1 মেট্রিক টন অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করতে প্রায় 4 মেট্রিক টন বক্সাইট প্রয়োজন হয়।

অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন কেন্দ্র

ভারতের উল্লেখযোগ্য অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন কেন্দ্র হল—

অ্যালুমিনিয়াম করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড— জে. কে. নগর (পশ্চিমবঙ্গ),

ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি (INDAL)— অলুপুরম (কেরল),

হীরাকুদ— (ওড়িশা)

বেলগাঁও— (কর্ণাটক)

হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম করপোরেশন (HINDAL CO)— রেনুকুট (উত্তরপ্রদেশ), মাদ্রাস আলুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড— মেত্তুর (তামিলনাড়ু)

ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড— কোরবা (ছত্তিশগড়)

ন্যাশানাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি (NALCO)— কোরাপুট (ওড়িশা)।

মুরি, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি।

❑ তাম্র (Copper)

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তামার ব্যবহার করে আসছে। বলতে গেলে পৃথিবীর সব ধাতুর মধ্যে যে ধাতুর ব্যবহার মানুষ সর্বপ্রথম শিখেছে, তা হল তামা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ তামার সাথে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ প্রস্তুত করে তা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বানাতো। ইতিহাসে ঐ যুগকে **ব্রোঞ্জযুগ** বলা হয়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তামার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আজকের দিনে ব্যবহারের দিক দিয়ে নমনীয় এই বাদামী ধাতুর স্থান লোহার পরেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে তামাকেও নানা কাজে লাগান হচ্ছে। অতীতে তাম্রযুগে তামার তৈরী বাসনপত্র, অলঙ্কার, যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহৃত হত। উত্তম তাপ ও বিদ্যুতের পরিবাহী বলে বিদ্যুৎশিল্পে তামার ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। তামার তারের সাহায্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়। বৈদ্যুতিক জেনারেটার, মোটর, রেলইঞ্জিন, জাহাজ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও সুইচবোর্ড তৈরীতে তামার ব্যবহার বেশী লক্ষ্য করা যায়। মুদ্রণ শিল্প, রঙ, কীটনাশক ওষুধপত্র তৈরী করতেও তামা ব্যবহৃত হয়।

মিশ্র ধাতু উৎপাদনেও তামার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি সংকর ধাতু হল ঃ

তামা + অ্যালুমিনিয়াম = ডুরালুমিন

তামা + দস্তা = পিতল

তামা + টিন + দস্তা = ব্রোঞ্জ

তামা + পিতল = জার্মান সিলভার

তামা + সোনা = গিনি সোনা

তামা + নিকেল = মোনেল মেটাল

তামা + পিতল + টিন = কাঁসা

বন্টন ঃ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক ভারতের প্রধান তামা উৎপাদক রাজ্য। কনসেনট্রেশন ও স্মেলটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে আকরিক তামা বিশুদ্ধ তামা থেকে আহরণ করা হয়। এজন্য ঘাটশিলা, মোসাবনি, রাখা, ক্ষেত্রী প্রভৃতি স্থানে আকরিক গলন যন্ত্র (স্মেলটর) বসানো হয়েছে।

সারণী ঃ
তামার বণ্টন, সঞ্চয়, বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন (২০০২-০৩)

রাজ্য	সম্ভাব্য সঞ্চয়	জেলা	উত্তোলক কেন্দ্র
1 মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড়	5 কোটি মে. টন (মধ্যপ্রদেশ উৎপাদনে প্রথম স্থান, 187 লক্ষ মে. টন)	বালাঘাট	মালঞ্চখন্ড।
2 রাজস্থান	12 কোটি মে. টন (1.0%-1.4% তামা), (উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান, 62 লক্ষ মে. টন)	ঝুনঝুন, আলোয়ার	ক্ষেত্রী, দারিবা, প্রতাপগড় (ক্ষেত্রীর আকরিক তামার মধ্যে সামান্য রূপা, সোনা ও সিলেনিয়াম পাওয়া যায়)।
3 ঝাড়খণ্ড	10 কোটি মে. টন (1.4%-1.6% তামা), ঝাড়খণ্ড উৎপাদনে তৃতীয়	সিংভূম	মোসাবনি, বাদিয়া, সুরদা, পাথরগোড়া, রাকা, রোয়াম-সিদ্ধেশ্বর তামা পাহাড়, রামচন্দ্র পাহাড়, নানডুপ, বয়ানবিল, তরামডিহি।
		হাজারিবাগ	বারাগনডা।
4 অন্ধ্রপ্রদেশ	68-70 লক্ষ মে. টন (1.0%-1.8% তামা)	গুনটুর খামমাম	অগ্নিগুনডল্যা, বানডালামটটু, নাল্লাকোনডা ময়লারাম।
5 কর্ণাটক	80-90 লক্ষ মে. টন (1.3%-1.8% 1.8% তামা)	চিত্রদূর্গ গুলবর্গা	বেলিগুড্ড। টিনথিনি।
6 পশ্চিমবঙ্গ	1.2 কোটি মে. টন (1.8% তামা)	পুরুলিয়া	তামাখুন।
7 সিকিম	11 লক্ষ মে. টন		সিসনি, ডিকচু।

উৎস ঃ *Indian Bureau of Mines*

ভারতের আকরিক তামার উৎপাদন ও বাণিজ্য ঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দেশে আকরিক তামার উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1951 সালে 0.37 লক্ষ মে. টন থেকে 1991-92-এ 5.2 লক্ষ মে. টন উৎপাদন হয়েছিল। 2001-এ এসে তা দাঁড়ায় 34.83 লক্ষ মে. টনে। বিগত 50 বছরে দেশে তামার উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই কম। ফলে ভারতকে বিদেশী আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়। মোটামুটিভাবে, দেশের মোট চাহিদার প্রায় 60% তামা বিদেশী যোগানের ওপর নির্ভরশীল। ভারত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, বেলজিয়াম, চিলি প্রভৃতি দেশ থেকে তামা আমদানি করে। বিদেশী যোগানের প্রায় 33% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করা হয়।

সারণী ঃ আকরিক তামার উৎপাদন

সাল	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)
1951	0.37
1961	0.42
1971	0.67
1981	2.10
1991	5.20
2001	34.83

❑ অভ্র (Mica)

অধাতব খনিজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই আকরিকের ব্যবহার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে বেড়ে চলেছে। প্রকৃতিতে বিভিন্ন রঙে অভ্র পাওয়া গেলেও মাসকোভাইট বা শ্বেত অভ্র, বায়োটাইট বা কৃষ্ণবর্ণের অভ্র ও ফ্লোগোপাইট বা বাদামীবর্ণের অভ্র বাণিজ্যিক দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এদের মধ্যে মাসকোভাইট সবচেয়ে ভালো। অভ্র আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলায় মাইকা শিস্ট ও মাইকা নাইস-এ পাতলা পাতলা পাতরূপে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থাকে Book of Mica বলে।

ব্যবহার ঃ স্থিতিস্থাপক, স্বচ্ছ, তাপসহ্যকারী, নমনীয় ও পাতলা অভ্রকে (ক) বৈদ্যুতিক শিল্পে, (খ) ঔষধ শিল্পে, (গ) চিমনি, মাইকা টেপ, গ্যাস ল্যাম্প তৈরী করতে, (ঘ) রঙ-এর ঔজ্জ্বল্য আনতে, (ঙ) রবার শিল্পে, (চ) প্রতিমার সাজ তৈরী করতে, (ছ) ছাদের উপাদান (অভ্র ইট) তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়। তবে এর ব্যাপক ব্যবহার বৈদ্যুতিক শিল্পেও লক্ষ্য করা যায়।

■ প্রধান উত্তোলক দেশসমূহ (Major producing countries)

অভ্র উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট অভ্র উত্তোলনের শতকরা 60 ভাগ এদেশ থেকে আসে। ভারতের মধ্যে ঝাড়খণ্ড অভ্র উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতের প্রায় 11 শতাংশ অভ্র এই রাজ্য থেকে আসে। আবার ঝাড়খণ্ডের মধ্যে হাজারীবাগ জেলা অভ্র উৎপাদনে প্রথম (ঝাড়খণ্ডের 75 শতাংশ)। হাজারীবাগের কোডার্মা রিজার্ভ ফরেস্ট পৃথিবীর বৃহত্তম অভ্রখনি অঞ্চল। হাজারীবাগ ও মুঙ্গের

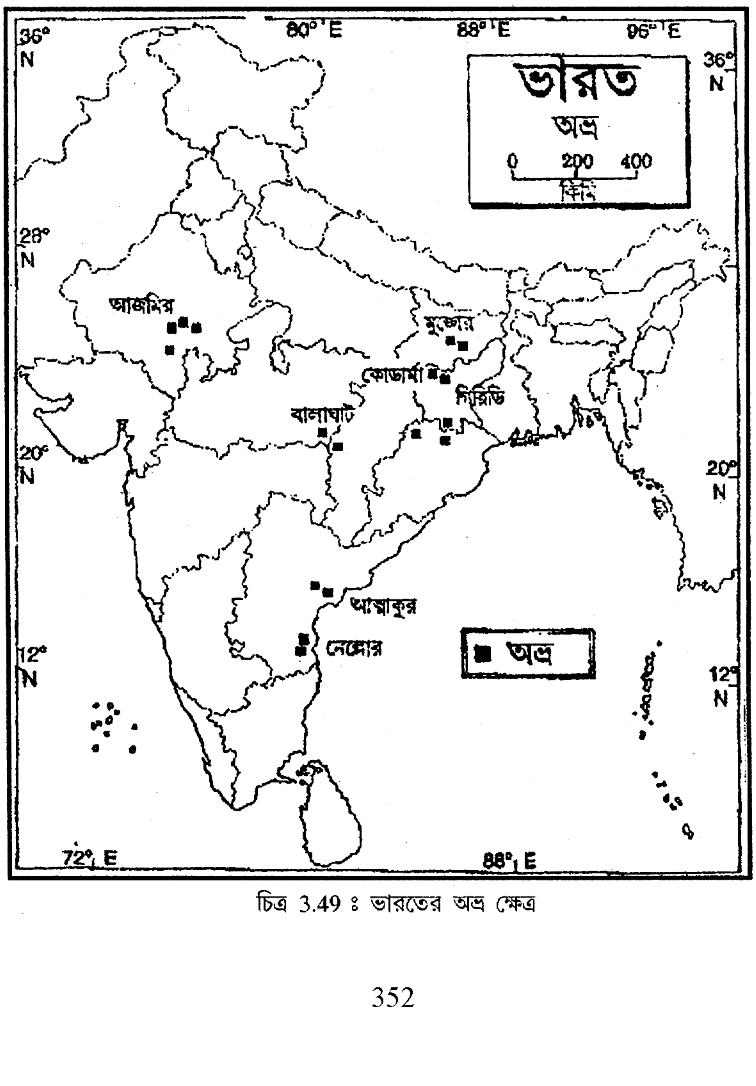

চিত্র 3.49 ঃ ভারতের অভ্র ক্ষেত্র

(বিহার) জেলার মধ্যে এই অভ্র বলয়টি বিস্তৃত। রাঁচী, পালামৌ, ধানবাদ ও সিংভূম জেলাতেও অভ্র উত্তোলিত হয় (চিত্র 3.69)। ঝাড়খন্ডের অভ্র খুব উৎকৃষ্ট। এই অভ্রের রঙ রুবি (গাঢ় লাল)। তাই এই পদার্থ **রুবি অভ্র** নামে পরিচিত।

অভ্র উৎপাদনে ভারতের (দেশের 73 শতাংশ) শীর্ষ রাজ্য হল অন্ধ্রপ্রদেশ। এই রাজ্যের নেল্লোর জেলার আত্মাকুর, কলাণবামা, পট্টাভিরাম প্রভৃতি স্থানে অভ্রখনি অবস্থিত। নেল্লোর ছাড়াও অনন্তপুর, চিতোর, গুন্টুর জেলাতেও অভ্র পাওয়া যায়।

ভারতের তৃতীয় স্থানাধিকারী অভ্র উত্তোলক রাজ্য হল রাজস্থান। উত্তরে আজমীর থেকে ভিলওয়াড়া হয়ে দক্ষিণে উদয়পুর পর্যন্ত 320 কি.মি. দীর্ঘ এই অভ্র বলয়ে দাঁতা, রতনপুরা ও মানখন্ড প্রভৃতি স্থানে প্রধান খনিগুলো অবস্থিত। এখান থেকে প্রায় 16 শতাংশ অভ্র উত্তোলিত হয়।

উপরোক্ত রাজ্যগুলো ছাড়াও মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট ও ছত্তিশগড়ের বাস্তার বিলাসপুর, কেরালার আলেপ্পি ও কুইলন, কর্ণাটকের মহীশূর ও হাসান এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় অভ্র পাওয়া যায়।

সারণি

অভ্রের উৎপাদন (টনে)

রাজ্য	উৎপাদন	%	মূল্য মিলিয়ান টাকায়
1. অন্ধ্রপ্রদেশ	883	72.56	256.50
2. রাজস্থান	190	15.61	21.46
3. ঝাড়খণ্ড	133	10.93	29.95
4. বিহার	11	0.90	0.92
ভারত	1,217	100.00	308.83

Source : Data computed from Statistical Abstract India. P. 79

সারণি

অভ্র উৎপাদনের (টনে) (1960-61-2002-03) ধারা

বর্ষ	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02	2002-03
উৎপাদন	28,347	15,099	8,534	3,806	1,154	2,026	1,217
মূল্য কোটি টাকায়	2.4	2.1	3.5	2.8	2.6	4.9	3.1

Source : Indian Bureau of Mines. (i) Statistical Abstract India, 2003.

বাণিজ্য ঃ অভ্র উৎপাদক ও রপ্তানীকারক দেশ হিসেবে ভারত শীর্ষস্থানে রয়েছে। ভারতের উৎপাদিত অভ্রের 80 ভাগই রপ্তানী হয়, আর পৃথিবীর মোট রপ্তানীর 75 ভাগ ভারত একাই করে।

সারণি

ভারত থেকে অভ্র রপ্তানী

বর্ষ	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	1995-96	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
উৎপাদন	28.4	26.7	16.7	42.0	33.4	63.2	57.7	33.8	—
মূল্য কোটি টাকায়	—	16	18	35	27	64	56	61	106

Source : Economic Survey 2004-05, pp. S-84 to 86

❑ টিন (Tin)

প্রাচীন মানুষ টিনের ব্যবহার জানত না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ টিনের সাথে তামা মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরী করে ব্যবহার করত। পিটার ডুরান্ড (Peter Durand) নামে এক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টিনজাত পাত্রে খাদ্য সংরক্ষণ পন্থা আবিষ্কারের পর থেকেই সারা পৃথিবীতে টিনের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।

টিনের প্রধান আকরিক হল ক্যাসিটেরাইট (Cassiterite—SnO2)। এতে শতকরা 75 ভাগ রাং বা টিন থাকে। আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলায় অক্সাইডরূপে শিরা বা ধাতুনালী (lodes)-র মত এই আকরিক অবস্থান করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে আবহবিকারের ফলে ক্ষয়িত টিন (আকরিক) নদী বা বৃষ্টিপাতের জলস্রোতের সাথে বাহিত হয়ে নদী উপত্যকা বা সমভূমিতে সঞ্চিত হয়। তাই পৃথিবীর মোট টিন আকরিক উৎপাদনের প্রায় 80 শতাংশ এভাবে সমভূমি বা নদী উপত্যকায় পাওয়া যায়। আর স্টানাইট আকরিকে শতকরা 25 থেকে 30 ভাগটিন পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ নানা কাজে টিন ব্যবহার হয়ে থাকে। যথা—

টিন প্লেট ঃ অবিষাক্ত ও ক্ষয় প্রতিরোধক ধাতু হওয়ায় খাদ্যদ্রব্য বহুদিন সংরক্ষণ করবার জন্য বহুল পরিমাণে টিন ব্যবহৃত হয়। ইস্পাত ও লোহার পাতলা পাতকে টিনের প্রলেপ দিলে তাতে আর মরচে ধরে না। টিনের প্রলেপযুক্ত ইস্পাত বা পাতলা ইস্পাত বা লোহার পাত দিয়ে পাত্র বা কৌটা তৈরী করে তার মধ্যে বায়ুশূন্য আবদ্ধ অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়।

রাং ঝালাই ঃ ধাতুজাত বিভিন্ন জিনিসকে জোড়া দিতে টিন ব্যবহৃত হয়। কারণ গরম হলে টিন নরম হয়ে যায়। আবার ঠান্ডায় খুব শক্ত হয়। পৃথিবীর মোট ব্যবহৃত টিনের শতকরা প্রায় 20 ভাগ টিন রাং ঝালাই (Soldering) করতে কাজে লাগে। টেলিভিশন বা রেডিও সেট খুললে দেখা যায় যে বিভিন্ন টুকরো টুকরো তার জোড়া দিতে রাং ঝালাই ব্যবহৃত হয়েছে।

টিন ফয়েল ঃ টিনের অতি পাতলা পাত দিয়ে সিগারেট ও চকলেট-এর মোড়ক করা হয়। এছাড়া টুথপেস্ট, মলম ও নানা ধরনের ওষুধপত্র সংরক্ষণ করতে টিন ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রকার মিশ্র ধাতু তৈরী ঃ টিন দিয়ে বহু প্রকার মিশ্র ধাতু তৈরী করে তা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। টিন ও অন্যান্য ধাতুর সংমিশ্রণে যে সব মিশ্র ধাতু তৈরী হয় সেগুলো হল ঃ

টিন + তামা = ব্রোঞ্জ

টিন + সীসা = পিউটার ও টারন

টিন + অ্যান্টিমনি = ব্রিটানিয়া

টিন + অ্যান্টিমনি + তামা = ববিট ধাতু।

এসব ধাতু নানান কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন পিউটার অলঙ্কার ও গৃহস্থালীর পাত্রাদি, টার্নপ্লেট, পেট্রোল ট্যাঙ্কের পাত ও ঘরের ছাদ, ববিট ধাতু বিমান ও সড়ক যানের বিয়ারিং (Bearings), এবং ব্রিটানিয়া কাঁটা চামচ তৈরী করে ব্যবহৃত হয়।

বন্টন ঃ রাঁচী, হাজারীবাগ ও গয়া জেলায় কিছু স্থানে গ্রানাইট শিলার ভেতরে অল্প পরিমাণ টিন আকর পাওয়া যায়। এই বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত আকরের পরিমাণ খুবই অল্প। আর্থিক দিক দিয়ে তা লাভজনক নয়।

উড়িষ্যা-ছত্রিশগড় ঃ ছত্রিশগড়ের বস্তার এবং উড়িষ্যার কোরাপুটের কয়েকটি জায়গায় ক্যাসিটারাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই আকর পেগমাটাইট শিলাতে পাওয়া যায়। ক্ষারকীয় শিলার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট পেগমাটাইটই টিন আকরের উৎস। এই ধরনের পেগমাটাইট বেন্ডানপাল থেকে মুন্ডাভাল এবং কুদ্রিপাল থেকে মুন্ডাগুড়া অঞ্চলে রয়েছে। এদের দৈর্ঘ্য 200 মিটার থেকে 1 কিলোমিটার। প্রস্থ 1 মিটার থেকে 5 মিটার। টিনের পরিমাণ কোথাও 0.1 থেকে 0.3 শতাংশ আবার কোথাও 0.5 থেকে 0.1 শতাংশ। এছাড়া, বস্তারের কোথাও কোথাও বালি ও মাটির মধ্যে টিনের প্রকীর্ণক (placer) অবক্ষেপও পাওয়া যায়।

হরিয়ানা ঃ ভিলওয়ানি জেলার তোসাম অঞ্চলে টিন আকরের সন্ধান পাওয়া যায়। 1982 সালে ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্ব্বেক্ষণের সমীক্ষার সময়। এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন ও খনিজীভবনের প্রকৃতি বেশ জটিল। এখানে ক্যাসিরাইট দানার পরিমাপ 0.01 থেকে 0.6 মিলিমিটারের মধ্যে। কোথাও সূক্ষ্ম (0.5 থেকে 5 মিলিমিটার) খনিজ শিলা হিসাবে পাওয়া যায়। আকরদেহ প্রায় 2 কিলোমিটার দীর্ঘ এবং বিস্তার প্রায় 24 মিটার। আনুমানিক মোট ভান্ডারের পরিমাণ 3.83 কোটি টন। এখানকার আকরের সঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণে তামা, টাংস্টেন, সীসা, রৌপ্য এবং সোনাও পাওয়া যায়।

টিন উৎপাদনের ধারা ঃ 1993-94 থেকে 1997-98

বর্ষ	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
উৎপাদন	127340	59226	54991	31184	35143

❑ টাংস্টেন

টাংস্টেন একটি বিরল মৌলিক ধাতু। এই ধাতুর বৈশিষ্ট্য হল অ্যাসিডের সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তা এবং উচ্চ গলনাঙ্ক। একে পিটিয়ে পাতলা করা সম্ভব। 10 গ্রাম ধাতু থেকে 8 কিলোমিটার লম্বা তার তৈরি করা সম্ভব হয়। 2 টন টাংস্টেন থেকে প্রায় 10 কোটি বালবের ফিলামেন্ট করা যায়।

টাংস্টেন যুক্ত ইস্পাত নানা ধরনের যন্ত্রনির্মাণে অপরিহার্য ভূত্বকের শিলা ছেদন করার ড্রিল যন্ত্রের বিট তৈরীতে এই ধাতু বেশী ব্যবহার হয়।

টাংস্টেন, কোবাল্ট ও ক্রোমাইটের মিশ্রণে টাংস্টেন কার্বাইড তৈরী করা হয় যার কাঠিন্য হীরকের চেয়ে কম। এই জন্য ডিলিং বিটে এ টার ব্যবহার করা হয়।

টাংস্টেন— কোবাল্ট-মলিবডেনাম ইত্যাদির নানা অনুপাতের মিশ্রণে বিভিন্ন সংকর ধাতু যা যে গুলির যন্ত্রশিল্পে বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদন কাজে লাগে।

ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক শিল্পে ও রাসায়নিক শিল্পে এটি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। বস্ত্র এবং সিরামিক দ্রব্যে রঙ করতে এই ধাতু ব্যবহার করা হয়।

টাংস্টেনের মূল আকর উলফ্রামাইট (Fe, Mn) WO4) যাতে টাংস্টেনের পরিমাণ 51 শতাংশ; অন্য আকর শিলাইট (CaWO4) যাতে টাংস্টেনের পরিমাণ 64 শতাংশ। উলফ্রামাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব 7.2 থেকে 7.5 যা চৌম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। শিলাইট আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে দ্যুতি ওঠে। খনিজ সন্ধানের ব্যাপারে তাই আলট্রা

ভায়োলেট ল্যাম্প অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

বন্টন ঃ রাজস্থানের নগৌর জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা পাওয়া যায়।

রাজস্থান ঃ পশ্চিম রাজস্থানে প্রাক-কেমব্রিয় শিলায় অনুপ্রবিষ্ট শিরাকৃতি কোর্টজ (Quartz vein) খনিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় আকরিক টাংস্টেন (W) লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে চ্যালকোপাইরাইট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খনিজ পাওয়া যায়। শিরাতে আনুমানিক 234000 টন আকর আছে যাতে WO3 র পরিমাণ 0.25 থেকে 0.54 শতাংশ। দেগানা পাহাড়ে এই ধাতুর সঞ্চয় হল 13 লক্ষ টনে আকরের (WO3)-র গড় পরিমাণ হল 0.04 শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ ছেঁদাপাথর অঞ্চলে প্রাচীনতম শিলাগোষ্ঠীর কোয়ার্টজাইট ও ফিলাইট শিলায় অনুপ্রবিষ্ট কোয়ার্টজ শিরার মধ্যে অল্প পরিমাণ টাংস্টেন পাওয়া যায়।

এখানকার শিরাগুলি 1.22 মিটার থেকে 1.83 মিটার পর্যন্ত পুরু। আনুমানিক ভাণ্ডারের পরিমাণ 105.840 টন যাতে 0.05 থেকে 0.06 শতাংশ WO3 আছে এবং 56700 টন যাতে 0.03 থেকে 0.07 শতাংশ WO3 আছে।

এছাড়া মহারাষ্ট্রে নাগপুর জেলায় অমরগাঁও অঞ্চলে ঝাড়খন্ডের গয়া জেলার ধনবাস অঞ্চলে, তামিলনাড়ুর তিরুরিপল্লী অঞ্চলে, গুজরাটে পাঁচমহল জেলার জের এলাকায় টাংস্টেন সঞ্চয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই সবগুলি জায়গায়ই মোট আকর ভাণ্ডার বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত এবং মোট পরিমাণও কম।

ভারতবর্ষে টাংস্টেন ভাণ্ডার অল্প-তাই চাহিদা মেটাতে এই ধাতু আমদানি করতে হয়। গত কয়েক বছরের এই আকরিকের উৎপাদনে ধারা দেওয়া হল ঃ

সারণি ঃ

টাংস্টেন উৎপাদনের ধারা

বর্ষ	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
উৎপাদন কি.গ্রা.	5247	5721	6451	3826

❑ এ্যান্টিমনি

এ্যান্টিমনি বিরল ধাতুর মধ্যে অন্যতম। এর রাসায়নিক চিহ্ন Sb এবং এর মূল ব্যবহার এ্যালয় শিল্পে। এর অক্সাইড রঙ শিল্পে লাগে। এ ছাড়া ঔষধ শিল্পে, অস্ত্র তৈরিতে, ইলেকট্রিক ব্যাটারিতে এবং বহু অন্য শিল্পে এর প্রয়োজন হয়।

এই ধাতুর মূল আকর হল স্টিবনাইট (Sb2 S3) যাতে 71.4 শতাংশ এ্যান্টিমনি থাকে native অবস্থায় এই ধাতু খুব কম জায়গায়ই পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে এই ধাতুর প্রধান ভান্ডার হল হিমাচল প্রদেশের কাঙড়া জেলায় লাহুল— স্টিটি অঞ্চলে। এই অঞ্চলে এ্যান্টিমনি শিরা 13 সেন্টিমিটার চওড়া এবং পেগমাটাইট শিলাতে পাওয়া যায়। এখানকার আকরে স্টিবনাইট ছাড়া গ্যালেনা এবং স্প্যালেরাইট পাওয়া যায়। এই আকর ভাণ্ডারের আনুমানিক পরিমাণ 10588 টন যার মধ্যে স্টিবনাইট আকর 3296 টন যাতে 2.88 শতাংশ এ্যান্টিমনি আছে, 7292 টন এ্যান্টিমনি সীসা-দস্তার আকর ভান্ডার যাতে 1.02 শতাংশ এ্যান্টিমনি, 1.40 শতাংশ সীসা এবং 0.54 শতাংশ দস্তা পাওয়া যায়।

এই অঞ্চল ছাড়া— অন্ধ্রপ্রদেশের করিমনগরে, কর্ণাটকের চিত্রদুর্গাতে, রাজস্থানের উদয়পুরে এবং উত্তরপ্রদেশের চামোলীতে অল্প পরিমাণ স্টিবনাইট আকারের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু এগুলির সব জায়গায়ই আকর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিস্তৃত এবং মোট মজুত ভান্ডারের পরিমাণও কম।

আমাদের দেশে এ্যান্টিমনির কোনও খনি নাই— কাজেই পুরো চাহিদাই আমদানি করে মেটাতে হয়।

❑ চুনাপাথর এবং ডলোমাইট

যেসব শিলাসমূহের মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ 50 শতাংশের বেশি, সেইসব শিলাসমূহকে চুনাপাথর বলে। এই হিসাবে মার্বেল, খড়ি, ট্যাভারটিন, টুফা বা প্রস্রবণজাত অবক্ষেপ, মার্ল ইত্যাদিকে চুনাপাথর হিসাবে গণ্য করা হয়। কিছু খড়ি পাথরে ফোরামিনিফোরা জীবাশ্ম পাওয়া যায়— এইরকম ধরনের পাথর দিয়ে মিশরের পিরামিড তৈরি হয়েছিল।

ডলোমাইট প্রায়শই চুনাপাথরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে— এই পাথরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের অনুপাত যথাক্রমে 54.3 শতাংশ এবং 45.7 শতাংশ। প্রকৃতিতে অবশ্য এই অনুপাতের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে যে সব চুনাপাথরে ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ 40 থেকে 45 শতাংশ তাদের ডলোমাইট বলে।

❑ বন্টন

বিহারের সাহাবাদ জেলায় চুনাপাথরের বড় ভাণ্ডার রয়েছে। এই অঞ্চলে ইস্পাত গলনে এবং ব্লাস্টফার্নেসে ব্যবহারের উপযোগী চুনাপাথর পাওয়া যায়।

সিংভূম এবং হাজারীবাগ জেলায় সিমেন্ট উৎপাদনের উপযোগী চুনাপাথর পাওয়া যায়, রাঁচী জেলার খিলাড়ীতে অনুরূপ ভাণ্ডার আছে।

মধ্যপ্রদেশের কাটনী, কৈমুর, মাইহার ও সাতনার নিকটবর্তী অঞ্চলের চুনাপাথর স্তরগুলি 10 মিটার থেকে 17 মিটার পুরু। কোনও কোনও অঞ্চলে চুাপাথর ব্লাস্টফার্নেসের উপযোগী হলেও বেশির ভাগ আকরই সিমেন্টে তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

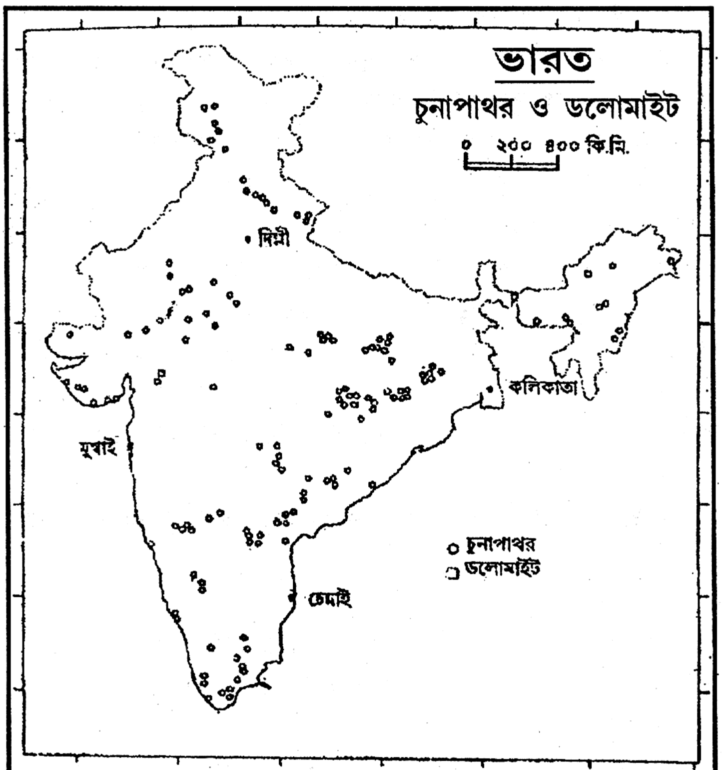

চিত্র 3.50 ঃ ভারতের চুনাপাথর ও ডলোমাইট ক্ষেত্র

ছত্তিশগড়ের দ্রুগ ও রায়পুর জেলায় সিমেন্ট নির্মাণের উপযোগী চুনাপাথর বেশ কয়েক জায়গায় পাওয়া যায়।

জব্বলপুর জেলায় চুনাপাথর এবং ডলোমাইট নানা জায়গা থেকে খনন করা হচ্ছে। ছাতারপুর জেলার লোহানি অঞ্চলে 20 থেকে 30 মিটার পুরু ডলোমাইট স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ আদিলাবাদ, কৃষ্ণা জেলার চুনাপাথর সিমেন্ট শিল্পের উপযোগী।

তামিলনাড়ু ঃ মাদুরাই এবং সালেম জেলায় চুনাপাথর সিমেন্ট উৎপাদনের উপযোগী যদিও সামান্য পরিমাণে উচ্চমানের চুনাপাথর রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। মেটুর কেমিক্যাল কোম্পানি এই চুনাপাথর দিয়ে ব্লিচিং পাউডার তৈরি করে।

দক্ষিণ আর্কট জেলায় চুনাপাথরে সিলিকার পরিমাণ 15 থেকে 46.8 শতাংশ।

রাজস্থান ঃ রায়ালো, রাজুয়াগড়, নাথদ্বোয়ারা, মাকরানা এবং কিষেনগড়ে মার্বেলপাথরের খনি আছে এবং উন্নতমানের মার্বেল সৌধ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। মাকরানার মার্বেল ভারত বিখ্যাত।

সোয়াই মাধোপুর, বুন্দি, পালি, ও চিতোর গড়োর আকর ভাণ্ডার সিমেন্ট নির্মাণের উপযোগী। পালি, যোধপুর ও চিতোরগড়োর উন্নতমানের ডলোমাইট ব্লাস্ট ফার্নেসে ব্যবহারের যোগ্য।

মেঘালয় ও আসাম ঃ মেঘালয়ে খাসি পাহাড়ের দক্ষিণে সেলা, মৌসিনরাম অঞ্চলে 2-3 টি উন্নত মানের চুনাপাথরের স্তর আছে। সেলা ভোলাগঞ্জে তিনটি 20 থেকে 25 মিটার পুরু চুনাপাথরের স্তর আছে যা রাসায়নিক সামগ্রী এবং ইস্পাত নির্মাণের উপযোগী।

চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে 9 মিটার পুরু ডলোমাইট ও 18 মিটার পুরু চুনাপাথর সিমেন্ট নির্মাণের উপযোগী।

জয়ন্তিয়া পাহাড়ের চুনাপাথরের পুরু স্তর আছে— এবং আকরগুলি উচ্চমানের। গারো পাহাড়েও সিমসং উপত্যাকায় 75 মিটার পুরু উচ্চমানের স্তর রয়েছে।

মিকির পাহাড়ে কোইলাজান অঞ্চলের চুনাপাথর স্থানীয় সিমেন্ট কারখানায় ব্যবহৃত হয়।

অরুণাচল প্রদেশ ঃ কামেং এবং সুবর্ণসিরি জেলায় উচ্চমানের ডলোমাইট পাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। রূপাতে ডলোমাইটের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু দুর্গম জায়গা এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়— সেজন্য খনি নিষ্কাশনের কোনও পরিকল্পনা হচ্ছে না। এখানকার ডলোমাইট উন্নত মানের— এবং এর থেকে ম্যাগনেশিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ জলপাইগুড়ি জেলায় জয়ন্তী-বক্সাদুয়ার অঞ্চলে দুটি ডলোমাইটের স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। উপরের স্তরটি 380 মিটার পুরু এবং সুবিস্তৃত। মজুত ভাণ্ডার অনেক।

উড়িষ্যা ঃ সুন্দরগড়, কোরাপুট এবং সম্বলপুর জেলায় চুনাপাথরের ভান্ডার আছে। বীরমিত্রপুরে চুনাপাথর ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

গুজরাট ঃ এখানকার কেলাসিত চুনাপাথরে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ 43.9 থেকে 52.9 শতাংশ। এগুলি সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

উত্তরপ্রদেশ ঃ আলমোড়া, পিথোরাগড় অঞ্চলে চুনাপাথরের ভান্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা সিমেন্টও চুন নির্মাণের উপযোগী।

ভারতের অন্যান্য খনিজ সম্পদ

স্বর্ণ (Gold)— এটি ধাতব খনিজ। খনিজ প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে বেশীরভাগ স্বর্ণ মিশ্রিত থাকে। নদী-উপত্যকা বা নদীগর্ভের বালুকণার মধ্যে অল্প পরিমাণে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। অলঙ্কার তৈরী করতে বেশীর ভাগ সোনা ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন শিল্পে ও ঔষধ প্রস্তুত করতেও সোনা লাগে।

পৃথিবীর উৎপাদিত মোট সোনার শতকরা প্রায় 2 ভাগ ভারতে পাওয়া যায়। এদেশে 1981-82 সালে মোট

2,495 কিলোগ্রাম সোনা উৎপাদিত হয়, যার মূল্য প্রায় 15.1 কোটি টাকা, সেজন্য অল্পবিস্তর স্বর্ণ এদেশে আমদানি করা হয়। ভারতের বেশীর ভাগ স্বর্ণ (প্রায় 99%) কর্ণাটকের কোলার জেলার কোলার ও রায়চুর জেলার হুট্টি স্বর্ণখনিতে পাওয়া যায়। খনিজ পাথরের মধ্য থেকে সোনা উদ্ধার করা হয়। কর্ণাটক জেলায় আনুমানিক 82,023 কিঃ গ্রাঃ সোনা সঞ্চিত আছে। অন্ধ্র প্রদেশের অনন্তপুর জেলার রামগিরি খনিতে সোনা পাওয়া যায়। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশের নদীগর্ভে এবং নদী-উপত্যকায় বালুকণার সাথে মিশ্রিত অবস্থায় অল্প পরিমাণ সোনা পাওয়া যায়।

রৌপ্য (Silver)— এটি ধাতব খনিজ। তাম্র, স্বর্ণ ও সীসার সাথে মিশ্রিত অবস্থায় সাধারণতঃ রূপা পাওয়া যায়; কোনো কোনো খনিজে শুধু রূপা পাওয়া যায়। অলঙ্কার, মুদ্রা, তৈজসপত্র ও ঔষধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। 1995-96 সালে মাত্র 35,531 কিলোগ্রাম রৌপ্য উৎপন্ন হয়েছিল। ভারতে অল্প পরিমাণ রূপা পাওয়া যায়। তথাপি 1965-66 সাল থেকে অল্প পরিমাণ রূপা প্রতিবৎসর বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের সিংভূম, হাজারীবাগ, পালামৌ অঞ্চলে, রাজস্থানের জাওয়ারে, অন্ধ্রপ্রদেশের কুডাপনা, নুধুরীও কুনুল জেলায় এবং কর্ণাটকে অন্যান্য ধাতুর সহিত রৌপ্য পাওয়া যায়।

ক্রোমাইট (Chromite)— ক্রোমাইট ধাতব খনিজ। এই খনিজ পদার্থ হতে ক্রোমিয়াম প্রস্তুত হয়। উজ্জ্বল এবং তাপরোধক ও অম্লরোধক ক্রোম স্টীল প্রস্তুত করতে ক্রোমিয়াম ব্যবহার করা হয়। চামড়া পাকা করতে, রং ও ঔষধ প্রস্তুত করতে ক্রোমিয়াম ব্যবহৃত হয়। মাটির সাথে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে যে ইট তৈরী হয়, তা তাপ-সহনশীল চুল্লী-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ভারতে সর্বপ্রকারের সঞ্চিত ক্রোমাইটের মোট পরিমাণ প্রায় 90 মিলিয়ান টন। 2002-03 সালে প্রায় 30.66 লক্ষ টন ক্রোমাইট খনি থেকে উত্তোলিত হয়। ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও তামিলনাড়ু রাজ্যের ক্রোমাইট খনি উল্লেখযোগ্য। কর্ণাটক রাজ্যের সিমোগা ও হাসান অঞ্চলে, ওড়িশার কেওনঝাড় ও কটক জেলায় এবং বিহারের সিংভূম অঞ্চলে অধিকাংশ ক্রোমাইট পাওয়া যায়। এছাড়া বিহারের ভাগলপুরে, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, ঝাড়খন্ডের রাঁচী এবং কাশ্মীরের কোনো কোনো স্থানে অল্প পরিমাণ ক্রোমাইট পাওয়া যায়।

আগে ভারতের বেশীরভাগ ক্রোমাইট ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হত। ভারতে ইস্পাত শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রোমাইটের রপ্তানি কমে আসছে।

লবন (Salt)— ভারতে সাধারণতঃ তিন উপায়ে লবন পাওয়া যায়; সমুদ্রের জল শুকিয়ে, অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং খনি থেকে এখানে লবণ উৎপন্ন হয়। গুজরাটের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী সামুদ্রিক লবণ উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়ু কেরালা, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রের উপকূলবর্তী স্থানে সমুদ্রের জল শুকিয়ে লবণ তৈরী হয়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার এই প্রকার লবণ পাওয়া যায়। হ্রদের জল থেকে প্রচুর লবণ তৈরী হয়। রাজস্থানের সম্বর হ্রদ, যোধপুরের দিদেয়ানা ও ফালোদি হ্রদ ও বিকানীরের লবণকরণসার হ্রদ হতে লবণ সংগৃহীত হয়। হিমাচল প্রদেশের মন্ডী অঞ্চলের লবণ-খনি থেকে খনিজ লবণ ও সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়।

পূর্বে এডেন, পাকিস্তান ও লোহিত সাগরের বিভিন্ন বন্দর থেকে ভারত লবণ আমদানি করত। বর্তমানে এই বিষয়ে ভারত স্বাবলম্বী হয়েছে। এদেশে বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় 80 লক্ষ মেট্রিক টন। ভারতে চাহিদা মাত্র 45 লক্ষ মেঃ টন। সেজন্য বর্তমানে ভারত জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালে লবন রপ্তানি করছে।

ম্যাগনেসাই (Magnesite)— ম্যাগনেসাইট আকরিক থেকে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়। কাঁচ, সিমেন্ট, কাগজ, রং প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করতে এটি ব্যবহৃত হয়। ভারতে সঞ্চিত ম্যাগনেসাইটের আনুমানিক পরিমাণ 415 মিলিয়ন টন। এখানে 2002-03 সালে 2 লক্ষ 73 মেঃ টন ম্যাগনোসাইট আকরিক উত্তোলিত হয়। কর্ণাটকে, তামিলনাড়ুর সালেম অঞ্চলে ও উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া জেলায় অধিকাংশ ম্যাগনেসাইট পাওয়া যায়। রাজস্থান ও ঝাড়খন্ডের এটি পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইউরোপীয় দেশসমূহে এটি রপ্তানি করা হয়।

জিপসাম (Gypsum)— বিভিন্ন শিল্পে এটি কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কাগজ, সিমেন্ট ও সারের কারখানায় এটি কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে সঞ্চিত জিপসামের আনুমানিক পরিমাণ 383 মিলিয়ান টন। রাজস্থানের বিকানীর, যোধপুর ও যশলমীর অঞ্চলে, জম্মু ও কাশ্মীরে এবং তামিলনাড়ুতে জিপসাম পাওয়া যায়। 2002-03 সালে বিভিন্ন খনি হতে এদেশে প্রায় 2,842 হাজার মেঃ টন জিপসাম উত্তোলিত হয়েছিল।

দস্তা ও সীসা (Zinc & Lead)— এই দুইটি ধাতব খনিজ। গুজরাট ও রাজস্থানে, অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্নিগুণ্ডালা ও ওড়িশার সরগিপল্লেতে সীসা সঞ্চিত আছে। ভারতে সীসা ও দস্তার সঞ্চয়ের পরিমাণ আনুমানিক 21 কোটি 2 লক্ষ মেঃ টন। ভারতে যে সামান্য দস্তা ও সীসা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশ উত্তোলিত হয় রাজস্থানের জাওয়ার ও বাঞ্জারি অঞ্চলে। সীসা শোধন করা হয় ধানবাদের কাছে টুণ্ডু ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে। দস্তা শোধন করা হয় রাজস্থানের দেবারিতে, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখপত্তনমে ও কেরালার আলওয়ে নামক স্থানে। রাজস্থান ও গুজরাটে দস্তার খনি আছে।

সারণি

দস্তা উৎপাদনের ধারা (1950-51 থেকে 2002-03)

বর্ষ	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2002-03
উৎপাদন (টনে)	2,144	9,254	15,055	52,925	136,958	485976

মোনাজাইট (Monazite)— খনি থেকে যে মোনাজাইট উত্তোলিত হয় তা থেকে থোরিয়াম ও ইউরোনিয়াম নিষ্কাশিত হয়। গ্যাস ও অন্যান্য বাতির ম্যান্টল্ তৈরী করতে ও আণবিক শক্তি উৎপাদনে এটি ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা 80 ভাগ মোনাজাইট ভারতে পাওয়া যায়। কেরালা, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে এটি প্রধানতঃ পাওয়া যায়। এই দ্রব্য আনবিক শক্তি উৎপাদনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে ভারত সরকার এর রপ্তানি বন্ধ করেছেন।

ইলমেনাইট (Ilmenite)— ইলমেনাইট আকরিক থেকে টিটোনিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়। রং ছাড়া ও আণবিক শক্তি উৎপাদনে এর প্রয়োজন হয়। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বালুকারাশির সঙ্গে এটি মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সঞ্চিত ইলমেনাইটের আনুমানিক পরিমাণ 13 কোটি 8 লক্ষ মেঃ টন। কেরালা রাজ্যে কুমারিকা অন্তরীপের কাছে ভারতের মোট উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশ ইলমেনাইট পাওয়া যায় এছাড়া তামিলনাড়ুতে কিছু ইলমেনাইট পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতে বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ মেঃ টন ইলমেনাইট উত্তোলিত হয়। ইলমেনাইট উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারত তৃতীয় স্থান এবং রপ্তানীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ভারতীয় ইলমেনাইটের প্রধান আমদানিকারক দেশ।

সিলিমানাইট (Silimanite)— ভারতে সঞ্চিত সিলিমানাইটের আনুমানিক পরিমাণ 59 মিলিয়ন টন। মেঘালয়ের সোনাপাহাড় ও মধ্য প্রদেশের পিপ্‌রা অঞ্চলে সিলিমানাইট পাওয়া যায়। কেরালা ও তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী বালুকারাশির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় সিলিমানাইট পাওয়া যায়। 2002-03 সালে ভারতে প্রায় 13674 টন সিলিমানাইট উৎপন্ন হয়েছিল।১

3.2.3 কৃষি (Agriculture)

❑ ভূমিকা

কৃষি হল ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি। স্বাধীনতা লাভের পর গত ষাট বছরে শিল্পক্ষেত্রে উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকলেও কৃষি আজও এদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম অর্থনীতিক কর্মযজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত। এদেশের জাতীয় আয়ের প্রায় 40 ভাগ কৃষি ও কৃষি আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ থেকে আসে। সে তুলনায় কানাডার 7%, যুক্তরাষ্ট্রের 5% এবং যুক্তরাজ্যের 4% জাতীয় আয় কৃষি থেকে আসে। এদেশের প্রায় 70 ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। গত একশবছরে এই অনুপাতে খুব একটা তারতম্য হয়নি। অথচ পূর্বোক্ত দেশগুলোর এক নগন্য অংশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। পশু ও মনুষ্য খাদ্য ছাড়াও কৃষি কয়েক প্রকার শিল্পের (ইক্ষু, কার্পাস, পাট) কাঁচামাল জোগান দেয়। মোট কথা, এদেশের অর্থনীতিতে কৃষির দান অনস্বীকার্য।

প্রধান প্রধান শস্য
(Major Crops)

ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, মৃত্তিকা, জলবায়ুর বৈচিত্র্য, অফুরন্ত সূর্যালোক এবং দীর্ঘ শস্য মরসুম ভারতকে বিভিন্ন শস্য জন্মাবার অনুকূল করে তলেছে। যে সমস্ত ফসল ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় এবং সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে জন্মায়, সেগুলি ভারতের যে কোন অংশে জন্মাতে পারে। ভারতের উৎপন্ন কৃষিজ ফসলকে মোটামুটি নিম্নলিখিত চারভাবে ভাগ করা যায়।

1. **খাদ্যশস্য**— যেমন ধান, গম, ভুট্টা, যব, মিলেট ইত্যাদি।
2. **অর্থকরী ফসল**— যেমন তুলা, পাট, আখ, তামাক, তৈলবীজ, চীনাবাদাম ইত্যাদি।
3. **বাগিচা ফসল**— যেমন-চা, কফি, মশলা, গোলমরিচ, লঙ্কা, আদা, রসুন, নারকেল এবং রবার।
4. হর্টিক্যালচার (ফুল ও ফলের চাষ) — আপেল, পিচ, আখরোট, এ্যালমন্ট, স্ট্রবেরী, ওয়ালনাট্, আম, কলা, লেবু জাতীয় ফল এবং সব্জি।

1. **খাদ্যশস্য (Food Crops)** ঃ কৃষি ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড এবং খাদ্যশস্যকে প্রধানত ভারতীয় কৃষির মেরুদণ্ড আখ্যা দেওয়া যায়। ভারতের মোট কর্ষিত জমির ¾ অংশ অধিকার করে আছে খাদ্য শস্য এবং কৃষি ভিত্তিক আয়ের মোটামুটি অর্ধেক খাদ্যশস্য থেকেই এসে থাকে। ভারতের কোন অংশই খাদ্যশস্য বিহীন নয় এবং ভারতের সর্বত্রই অন্যান্য ফসলের সঙ্গে খাদ্য শস্যকে মুখ্য ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রধান এবং প্রয়োজনীয় শস্য সরবরাহের জন্য খাদ্য শস্য চাষের গুরুত্ব বেড়েছে।

❑ ধান

❍ **ধান ঃ** ধান ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য। ভারতের মোট জমির ¼ অংশে ধান চাষ হয় এবং মোটামুটি ভারতের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার খাদ্যের যোগান দিয়ে থাকে। পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতের 150 সেমি. বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। সারা পৃথিবীর মোটামুটি দশ হাজার প্রজাতির ধানের মধ্যে ভারতে প্রায় চার হাজার প্রজাতির ধানের চাষ হয়ে থাকে।

❍ **ধান চাষের অনুকূল অবস্থা ঃ** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ভারতে ধানচাষের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। ভারতে 8^0 উত্তর অক্ষাংশ থেকে 25^0 উত্তর অক্ষাংশে এবং সমুদ্র সমতল থেকে 2500 মি.

উচ্চতায় ধান চাষ হয়। ধান ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। সুতরাং তা ভালোভাবে জন্মাবার জন্য অতিরিক্ত উষ্ণতা ও আর্দ্রতা প্রয়োজন।

1. **জলবায়ু ঃ**

(ক) উষ্ণতা ঃ সাধারণ ভাবে 24^0–27^0C উষ্ণতা ধান চাষে প্রয়োজন। তবে-ধান লাগাবার সময় 20^0–22^0C উষ্ণতা, ধান বৃদ্ধি পাওয়ার সময় 23^0–25^0C উষ্ণতা এবং ফসল কাটার সময় 25^0–30^0C উষ্ণতা প্রয়োজন।

(খ) বৃষ্টিপাত ঃ সাধারণ ভাবে 200 সেমি. এর উপর বৃষ্টিপাতে ধান চাষ ভাল হয়। তবে যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 200 সেন্টিমিটারের বেশি সেখানে ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সুতরাং 100 সেমি. সমবর্ষণরেখা ধান চাষের অঞ্চলকে নির্ধারিত করে। যে সমস্ত অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাত 100 সেমির কম সেই সমস্ত অঞ্চল যেমন— পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে জলসেচের সাহায্যে ধান চাষ করা হয়। ভারতের 40 শতাংশ ধান চাষ জলসেচের সাহায্যেই হয়ে থাকে। কারণ ধান চাষের জন্য সারাবছর 22 সেমি.-র উপর বৃষ্টিপাত খুবই প্রয়োজনীয়।

(গ) জমি ঃ ধান চাষের জন্য সমতল জমির প্রয়োজন। বর্ষাকালে যে জমি 10–12 সেন্টিমিটার জলের নীচে থাকে সেই জমিতে ধান বপন ভাল হয়। সেই কারণে ধান চাষের জমিসমতল ও তার চারদিক আল দিয়ে বাঁধার প্রয়োজন হয়। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ধাপ কেটে কেটে সিঁড়ির মতো ছোট ছোট সমতল ক্ষেত্র তৈরী করে ধান চাষ করা হয়। এই ধরনের চাষকে ধাপ চাষ বলে। এবং পাহাড়ের এই সমস্ত অঞ্চলে সমতল ক্ষেত্রের মতন অত বেশি জলের প্রয়োজন হয় না। পার্বত্য অঞ্চলের এই ধরনের ধান চাষকে শুষ্ক অথবা উচ্চভূমির ধান চাষ বলে।

3. **মাটি ঃ** উর্বর কাদা ও পলিযুক্ত মৃত্তিকা ধান চাষের জন্য উপযোগী, নদী উপত্যকার উর্বর পলিমাটিতে ধানের উৎপাদন অধিক হয়। কাদা-যুক্ত দোআঁশ মাটিতে ধান চাষ ভাল হয়। এই দোআঁশ মাটির ভিতর ধানের শিকড় প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া এই প্রকার মাটির জলধারণের ক্ষমতা বেশী। অপ্রবেশ কাদামাটির স্তর ভেদ করে জল গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এছাড়া কালো লাভা মৃত্তিকাতে ও ধান চাষ ভাল হয়।

❍ **কৃষি মজুর ঃ** ধান শ্রমনিবিড় কৃষি পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। কারণ মাটি তৈরী, বীজবপন, রোপন, নিড়ান, ঝাড়াইমাড়াই, ধান থেকে চাল তৈরী প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ভারত জনবহুল দেশ। সেকারণে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে ধান চাষের জন্য কৃষিমজুর পেতে অসুবিধা হয় না। তবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের ধানচাষ অভিবাসিত কৃষি মজুরের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং এককথায় বলা যায় ভারতের বিপুল জনসংখ্যার প্রচুর পরিমান খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটাবার জন্য ধান চাষে পর্যাপ্ত উত্তাপ, পর্যাপ্ত বৃষ্টি, পর্যাপ্ত পরিমাণ পলি মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন।

❑ ধান চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি ❑

ভারতের ধান চাষের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হয়।

1. **ছড়ানো পদ্ধতি (Broadcasting) ঃ** এক্ষেত্রে ধানের বীজগুলি হাতের সাহায্যে ছড়ানো হয়। যে সব অঞ্চল তুলনামূলকভাবে শুষ্ক ও কম উর্বর এবং যেখানে মাঠে কাজ করা শ্রমিকের কিছু অভাব থাকে সেখানে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ফলে এক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত শ্রম প্রয়োগ কম ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে।

2. **ছিদ্র পদ্ধতি (Drilling) ঃ** জমি চাষ এবং ফসল লাগানো এই কাজ দুইজন ব্যক্তি করে থাকে। এ ধরনের চাষ উপ-দ্বীপীয় ভারতে প্রধানত দেখা যায়।

3. **বপন পদ্ধতি (Transplantation) ঃ** এই পদ্ধতিতে চাষ প্রধানত উর্বর মৃত্তিকা, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও

উপযুক্ত কৃষিমজুর সম্বলিত অঞ্চলে হয়ে থাকে। এখানে প্রথমে বীজ ক্ষেত্রে বীজ লাগানো ও চারা তৈরী করা হয়। চার-পাঁচ সপ্তাহ বাদে চারাগুলিকে তুলে মূল চাষের জমিতে সারিবদ্ধভাবে লাগানো হয়। এই প্রকার পদ্ধতির সমস্ত কাজই হাতের সাহায্যে করা হয়। ফলে এটি শ্রম সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এই ধরনের পদ্ধতিতে প্রচুর ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে।

4. **জাপানী পদ্ধতি (Japanese) ঃ** এই ধরনের চাষে উচ্চ ফলনশীল বীজ মোটামুটি একটু উঁচু জমিতে ফাঁকে ফাঁকে সারিবদ্ধ ভাবে নিড়ানো ও সারপ্রয়োগ করার সুবিধার্থে লাগানো হয়। যেহেতু এক্ষেত্রে প্রচুর সার প্রয়োগ করা হয়, ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ও যথেষ্ট বেশী। ভারতের প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলিতে এই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়।

❑ ধান চাষের মরসুম ❑

ভারতের পূর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলে উষ্ম এবং আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে বছরে 2-3 বার ধান চাষ হয়ে থাকে।

ভারতের ধান চাষের ঋতু

শস্য	স্থানীয় নাম	বপন সময়	কাটমার সময়	জমি (%)	উৎপাদন (%)
শরৎ (খারিফ)	আউস বা কার	মে-জুন	সেপ্টেম্বর অক্টোবর	39.4	43.97
শীত (রবি)	আমন বা কার্তিক	জুন-জুলাই	নভেম্বর, ডিসেম্বর	54.2	48.79
গ্রীষ্ম (বসন্ত)	বোরো বা ডালুয়া	নভেম্বর, ডিসেম্বর	মার্চ, এপ্রিল	6.4	7.28

কিন্তু দেশের উত্তর এবং পাহাড়ী অঞ্চলে শীত বাদে বছরে মাত্র একবার ধান চাষ হয়। নীচের সারণীতে ভারতের ধান চাষের সময় উল্লেখ করা হল।

❍ **ধানের উৎপাদন ঃ** ধান উৎপাদন এবং ভোগে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, চীনের পরেই। এদেশে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা 12% ধান উৎপাদিত হয়। 1950–51 সাল থেকে 2003–04 সাল পর্যন্ত 53 বছরে ভারতে ধানের উৎপাদন চারগুণ এবং ধান চাষের জমির পরিমাণ দেড়গুণ বেড়েছে। ধান চাষের পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে 1990–91 সালে ধানের উৎপাদন টাকায় ছিল 2622786 লক্ষ। ধানের উৎপাদনের এই অভাবনীয় প্রগতি যা 2003-04 সালে ছিল 2.051 কেজি প্রতি হেক্টরে তা কিন্তু চীন (3600 কেজি), আমেরিকা (7700 কেজি), কিংবা জাপান (6246 কেজি)-এর উৎপাদনের তুলনায় অনেকই কম। সুতরাং ধানের উৎপাদন বাড়াবার যে সুবিধাগুলি এখন ও বর্তমান (যেমন-জমির পরিমান বাড়ানো), তা কার্যক্ষেত্রে গ্রহণ করা উচিত।

❑ ধান উৎপাদক অঞ্চল ❑

ভারতের প্রায় সর্বত্রই ধান উৎপাদন হলেও কিছু কিছু অঞ্চলে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের অভাবে ধান চাষ করা যায় না (চিত্র 3.43)। যেমন—হিমালয়ের 2500 মি. উচ্চতা যুক্ত অঞ্চল, মরুস্থলী, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও মালওয়া অঞ্চলে। ধান উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল নিম্ন ও মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি, ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূল অঞ্চল, ব্রহ্মপুত্রের নদী উপত্যকা, দাক্ষিণাত্যের ব-দ্বীপ অঞ্চলের কিছু অংশ। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশ

সবুজ বিপ্লবের প্রভাবে ধান চাষের উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করবার পথে অগ্রসর হচ্ছে। পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে দেখা যায় যে, ভারতের অর্ধেক ধান উৎপাদন মোটামুটি চারটি রাজ্য যেমন—পশ্চিমবাংলা, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ মোটামুটি চারটি রাজ্য যেমন—পশ্চিমবাংলা, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ। এছাড়া তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার, আসাম, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং কেরালাকে উৎপাদনের ভিত্তিতে গুরুত্ব প্রদান করা যায়।

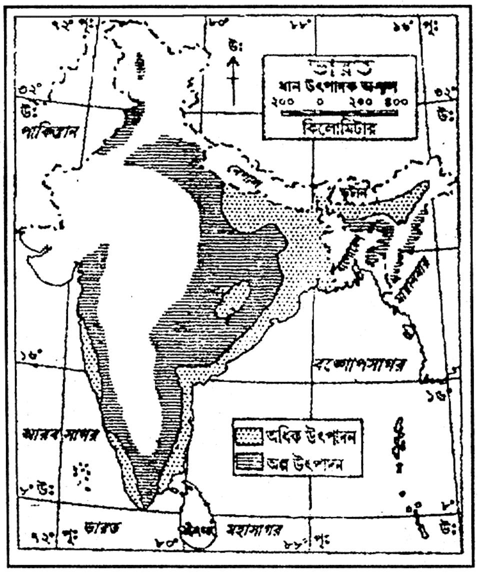

চিত্র 3.51 ঃ ভারতের ধান উৎপাদক অঞ্চল

ভারতের একশটি ধান উৎপাদক জেলার মধ্যে পশ্চিমবাংলা, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, এবং তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যগুলির দশটিরও বেশি জেলা অন্তর্ভুক্ত। তবে হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় এই রাজ্যগুলির 61-টি জেলা ধান উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রে প্রায় 32-টি জেলা ধান উৎপাদনে খ্যাত। তবে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে ভারতের 50 শতাংশ ধান উৎপাদন মোটামুটি 20-টি জেলা থেকে এসে থাকে। অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলা এবং তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুর জেলা ভারতে ধান উৎপাদনে খ্যাত। এখানে যথাক্রমে ভারতের মোট ধান উৎপাদনের 3.12 শতাংশ এবং 2.8 শতাংশ ধান উৎপাদিত হয়। অন্যান্য যে জেলাগুলি 2 শতাংশ ধান উৎপাদন করে থাকে সেগুলি হল—পূর্ব গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং নালগোন্দা (অন্ধ্রপ্রদেশ), কামরূপ (আসাম), হরিয়ানার কারনাল ও কুরুক্ষেত্র জেলা, উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলা, পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, পাতিয়ালা, ইপরোজপুর জেলা, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা।

(1) **পশ্চিমবঙ্গ ঃ** ভারতের ধান উৎপাদিত ক্ষেত্রের 13% এর অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের মোট উৎপাদনের 15 শতাংশের দাবীদার এই রাজ্য। 1990-91 সালে এখানে 4 লক্ষ 85 হাজার টাকার ধান উৎপাদিত হয়েছিল। নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমির মোট কৃষিজমি প্রায় ¾ জমিতে ধানচাষ হয়। উপযুক্ত জলবায়ু, পলির সঞ্চয় প্রভৃতি কারণে এখানে ধান চাষ হয়। এই রাজ্যের ⅔ ভাগ ধান উৎপাদন হয় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, 24-পরগণা, বীরভূম এবং দিনাজপুর জেলা থেকে। অন্যান্য ধান উৎপাদনকারী জেলাগুলি হল—হাওড়া, হুগলী, জালপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং মালদা। এই রাজ্যে প্রায় 78 শতাংশ আন, 20 শতাংশ আউশ, 2 শতাংশ বোরো ধানের চাষ হয়।

(2) **উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাঞ্চল ঃ** গত তিন দশক ধরে অভাবনীয় উন্নতি করেছে উত্তরপ্রদেশ তৃতীয় স্থান। প্রথমে যেখানে এর ধান উৎপাদন ছিল 6–8 শতাংশ (ভারতের মোট উৎপাদনের প্রেক্ষিতে) কিন্তু 2002–03 সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় তা বেড়ে প্রায় 11 শতাংশে পৌঁছায়। 1991 সালে এখানে 325732 লক্ষ টাকার ধান উৎপাদন হয়েছিল। এখানকার ¼ অংশ ভূমি ধান চাষে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানকার এই অভাবনীয় উন্নতির পেছনে রয়েছে কৃষকদের ধান চাষে উৎসাহ, উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার, সারের ব্যবহার এবং জলসেচের সুবিধা। 50টি প্রধান ধান উৎপাদক জেলার মধ্যে এই রাজ্যে সাতটি জেলা যেমন— দেরাদুন, গোরক্ষপুর, বেরেলি, মুজাফরনগর, মেরি, ফৈজাবাদ, বান্দা বারানসী, নৈনিতাল উল্লেখযোগ্য।

(3) **অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ** ধান উৎপাদনে চতুর্থ স্থানাধিকারী অন্ধ্রপ্রদেশ দেশের মোট উৎপাদনের 10 শতাংশ এবং দেশের মোট ধান্যক্ষেত্রের 7 শতাংশের অধিকারী। এই রাজ্যের ¼ অংশ জমিতে ধান চাষ হয়। রাজ্যের গোদাবরী-কৃষ্ণা ব-দ্বীপ ও তার সংলগ্ন উপকূলবর্তী অঞ্চল প্রধান ধান উৎপাদনক্ষেত্র। কৃষি উন্নতির সহায়ক প্রকল্পগুলি গ্রহণ করায় এখানে ধান উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃধ্বি পেয়েছে। 2002-03 সালে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ছিল 2602 কেজি। এই সময়ে ভারতের গড় উৎপাদন ছিল প্রতি হেক্টরে 1800 কেজি। ধান উৎপাদনকারী 20টি প্রধান জেলাগুলি হল—পশ্চিম গোদাবরী, পূর্ব গোদাবরী, কৃষ্ণা, গুন্টুর, নালগোণ্ডা, শ্রীকাকুলাম, করমনগর, নাজিমাবাদ, নেললোর, প্রকাশম, মেডফ, অনন্তপুর, মেহেবুবনগর ইত্যাদি। এই রাজ্যের পশ্চিম গোদাবরী, পূর্ব গোদাবরী, কৃষ্ণা এই তিনটি জেলা শুধু অন্ধ্রপ্রদেশের নয় সারা ভারতের উল্লেখযোগ্য ধান উৎপাদনকারী জেলা। কারণ—এরা দেশের মোট ধান উৎপাদনের 7 শতাংশ শস্য যোগান দেয়।

(4) **পাঞ্জাব ঃ** যদি ও পাঞ্জাব গম উৎপাদনকারী রাজ্য হিসাবেই দ্বিতীয় স্থান অধিকারী বেশি পরিচিত, তবুও পাঞ্জাব উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, খাল এবং কূপের সাহায্যে জলসেচ, উন্নত বীজ এবং সারের ব্যবহারের ফলে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে (2002–03)। বর্তমানে প্রতি হেক্টর 3–33 কেজি ধান উৎপাদিত হচ্ছে, যা একমাত্র তামিলনাড়ুর চাইতে কম, কিন্তু অন্যান্য সব রাজ্যের চাইতে বেশি। পাঞ্জাবে 17টি জেলার মধ্যে 12টি জেলা ধান উৎপাদন করে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাতিয়ালা, ফিরোজপুর, লুধিয়ানা, অমৃতসর, ফরিদাকোট এবং জলন্ধর। যদিও তামিলনাড়ু দেশের 9.02 শতাংশ ধান উৎপাদনের দাবীদার, তা সত্ত্বেও এই রাজ্য প্রতি হেক্টরে 3394 কেজি ধান উৎপাদন করে দেশে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই অভাবনীয় উন্নতি সবুজ বিপ্লবেরই অবদান। এখনকার 37 শতাংশ জমিতে ধান চাষ হয়। এই রাজ্যের কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলের থাঞ্জাভুর জেলা দেশের দ্বিতীয় ধান উৎপাদনক্ষেত্র, যার উৎপাদন মোট উৎপাদনের 2.৪ শতাংশ।

(5) **ছত্রিশগড় ঃ** ধান্যপাত্র হিসেবে পরিচিত ছত্রিশগড়ের 36.39 লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয় এবং দেশের মোট উৎপাদনের 3.52 শতাংশ এখানে উৎপাদিত হয়ে থাকে। এই রাজ্যের কম ধান উৎপাদন হওয়ার কারণ হিসাবে মোট ধান উৎপাদিত জমির (9 শতাংশ) পরিমানকে উল্লেখ করা যায়। মহানদী, তাপ্তী, এবং নর্মদা অঞ্চলই একমাত্র ধান উৎপাদন ক্ষেত্র। ধান উৎপাদনে প্রধান জেলাগুলি হল— বাস্তার, দুর্গ, রায়গড়, বালাঘাট, রাজনন্দন গাঁও, দান্তেওয়ারা।

(6) **ওড়িশা ঃ** দেশের মোট ধান উৎপাদনের 4.47 শতাংশ ওড়িশা থেকে আসে। এই রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ জমি ধান চাষে নিযুক্ত হলেও মোট উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট কম। এখানকার হেক্টর প্রতি মোট ধান উৎপাদন 1426 কেজি। দেশের 90 শতাংশ ধান প্রধানত সম্বলপুর, কোরাপুট, গঞ্জাম, কটক, পুরী, বোলাঙ্গীর এবং ময়ূরভঞ্জ জেলা থেকে এসে থাকে।

(7) **বিহার ঃ** 1990–91 সালে ধান উৎপাদনে চতুর্থস্থানাধীকারী বিহার 2002–03 সালে ষষ্ঠ স্থানাধীকারী হয়ে দাঁড়ায়। এই রাজ্যে দেশের 8.92 শতাংশ ধান্যক্ষেত্র রয়েছে। তা সত্ত্বেও এখানে দেশের মোট উৎপাদনের 6.8 শতাংশ উৎপাদন হয়। এখানকার প্রতি হেক্টরে ধান উৎপাদন 1390 কেজি। এখানকার ধান উৎপাদনকারী 25 টি জেলার মধ্যে প্রধান হল— রোটাস, রাঁচী, ভোজনগর, পূর্ণিয়া, পশ্চিম চম্পারণ, পূর্ব চম্বারণ, ঔরঙ্গাবাদ, গয়া, ভাগলপুর, সিংভূম, পাটনা এবং গোপালগঞ্জ।

(৪) **আসাম ঃ** এই রাজ্যের মোট উৎপাদিত জমির ¾ অংশে ধান উৎপাদিত হয়। এখানকার ব্রহ্মপুত্র, বরাক এবং সুরমা উপত্যকা প্রধান ধান উৎপাদক ক্ষেত্র। তাছাড়া এখানকার পাহাড়ী অঞ্চল ধাপ কেটেও কিছু ধানের চাষ হয়ে থাকে। কামরূপ, শিবসাগর, গোয়ালপাড়া, দারং, নওগাঁ এবং কাছাড় প্রধান ধান উৎপাদক জেলা।

(9) **কর্ণাটক ঃ** গত কহয়ক দশকে কর্ণাটক ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। এখানকার ওয়েনগঙ্গা,

তুঙ্গাভদ্রা এবং কাবেরী উপত্যকা এবং উত্তর দিকের লাল মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলে প্রধানত ধান চাষ হয়ে থাকে। ধান উৎপাদিত জেলাগুলি হল—টুমকুর, দক্ষিণ কানাড়, শিমোগা, মাইসোর, রায়চুড় এবং কোদাগু।

(10) **মহারাষ্ট্র** ঃ এখানকার কঙ্কন উপত্যকা এবং পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে ধান উৎপাদন হয়। চন্দ্রপুরা, রায়গড়, থানে, ভাণ্ডারা, কোলাপুর প্রধান ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল।

(11) **হরিয়ানা** ঃ পাঞ্জাবের মতো হরিয়ানা ও গম উৎপাদনকারী অঞ্চল হলেও বর্তমানে এখানকার কৃষিক্ষেত্রে কিছু অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখানকার কৃষি শ্রমিকদের প্রগতিশীল মানসিকতা ও তার সাথে সাথে জলসেচের উন্নতি, কৃষিবীজ ও রাসায়নিক সারের সরবরাহ এই পরিবর্তনের মূল কারণ। মাত্র কয়েক দশক আগে ও ভারতের ধান উৎপাদক হিসাবে হরিয়ানার কোন স্থান না থাকলেও বর্তমানে ঐ রাজ্য একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে। এখানকার প্রতি হেক্টর ধান উৎপাদনের পরিমান 2508 কেজি। তামিলনাড়ু ও পাঞ্জাবের পরে হেক্টর প্রতি উৎপাদনে হরিয়ানার স্থান তৃতীয়। কুরুক্ষেত্র, কার্নাল, যমুনানগর, আববালা, পানিপথ এখানকার প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চল।

(12) **কেরালা** ঃ কেরালার উপকূলবর্তী অঞ্চল (যেখানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়) প্রধান ধান উৎপাদক এলাকা। ত্রিবান্দ্রম, কুইলান, ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য।

উপরে উল্লিখিত রাজ্যগুলি ছাড়াও ভারতের উত্তর পূর্ব-পার্বত্য অঞ্চল, ত্রিপুরা, মণিপুর, অরুনাচল প্রদেশ, মিজোরাম, সিকিম, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর এবন গোয়াতে ধান চাষ হয়ে থাকে।

○ **বাণিজ্য (Trade)** ঃ ভারত ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করলেও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশি হওয়ায় এদেশে খুব সামান্য ধানই রপ্তানীর জন্য অবশিষ্ট থাকে। বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে যে অর্ন্তবাণিজ্য হয়ে থাকে তার মধ্যে 10 শতাংশ অধিকার করে ধান। উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী পাঞ্জা, হরিয়ানা অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও উত্তর প্রদেশ থেকে ঘাটতি উৎপাদনকারী পশ্চিমবাংলা, গুজরাট, কেরালা এবং দিল্লীতে ধান রপ্তানী হয়। প্রয়োজন অনুসারে সামান্য পরিমান ধান মায়ানমার, থাইল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, আরব প্রজাতন্ত্র থেকে ভারতে আমদানী করা হয়। উন্নত প্রজাতির বাসমতী চাল খুব সামান্য পরিমানে ভারত থেকে মধ্য প্রাচ্যে রপ্তানী হয়ে থাকে।

❑ গম (Wheat)

ভারতের বিভিন্ন খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের পরে গমের স্থান এবং ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষের, প্রধানত উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের জনগনের, প্রধান খাদ্যশস্য গম। এটি প্রোটিন, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ এবং মানুষকে তার প্রয়োজনীয় খাদ্যগুন সরবরাহ করে। পৃথিবীর গম উৎপাদনের 8.7 শতাংশের অধিকারী ভারতের স্থান চতুর্থ রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের পরে।

গম চাষের অনুকূল ভৌগোলক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ

ধান চাষের অনুকূল পরিবেশ অপেক্ষা গম চাষের অনুকূল পরিবেশ অনেক নমনীয়। গম একটি রবি শস্য এবও সাধারণত শীতের শুরুতে লাগান এবং গ্রীষ্মের শুরুতে কাটা হয়। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর পার্থক্যে গম রোপন এবং শস্য তোলার সময়ে বৈচিত্র্যে দেখা যায়। গম সাধারণত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে কর্ণাটক, তামিলনাডু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং নভেম্বর -ডিসেম্বর মাসে হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীরে চাষ হয়। কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ডে মার্চ-এপ্রিল মাসে এবং হিমাচলপ্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীরে এপ্রিল-মে মাসে গম কাটা হয়।

গম সাধারণভাবে মধ্য অক্ষাংশীয় অঞ্চলের তৃণভূমি, ঠাণ্ডা জলবায়ু ও মধ্যম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের ফসল। গম চাষের পরিবেশগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) ভৌগোলিক পরিবেশ ঃ

1. জলবায়ু ঃ

(i) **উত্তাপ ঃ** শীতকালীন উত্তাপ 10^0–15^0 সেলসিয়াস, এবং গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ 21^0–26^0 সেলসিয়াস গম চাষে আদর্শ। গম-চাষের প্রথম অবস্থায় শীতল আবহাওয়া আদর্শ হলেও গাছবৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে উষ্ম, শুষ্ক আবহাওয়া, এবং ফসল পাকার সময় প্রচুর উত্তাপ ও সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়। ফসল পাকবার সময় কোন কারণে উষ্মতা বেশি বৃদ্ধি পেলে তা গম চাষের পক্ষে ক্ষতিকর হয়।

(ii) **বৃষ্টিপাত ঃ** যে সমস্ত অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত 75 সেমি. সেখানে গম চাষ ভাল হয়। গম চাষের পক্ষে বার্ষিক সর্বোচ্চ 100 সেমি. বৃষ্টিপাতই আদর্শ। তবে বলা যায় যে, 200 সেমি. সমবর্ষন রেখা গম ও ধানচাষের ক্ষেত্রকে আলাদা করতে পারে। যে সমস্ত অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত 50 সেমির কম, সেখানে জলসেচের প্রয়োজন হয়। বাস্তবে দেখা যায় 20–25 সেমি. বার্ষিক বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলেও জলসেচের সাহায্যে গম চাষ করা যায়। গমের পুষ্টির সময়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি এবং শুষ্ক রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বেশি বাড়ায়। ফুল ফোটার সময় কুয়াশা এবং ফসল পাকবার সময়ে শিলাবৃষ্টি সহ ঝড় ফসলের অপূরণীয় ক্ষতি করে।

(iii) **মৃত্তিকা ঃ** বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকাতে গম চাষ হলেও কৃষ্ণমৃত্তিকা, উর্বর দোঁয়াশ মৃত্তিকা ও কাদাযুক্ত পলি মৃত্তিকায় গম চাষ ভাল হয়। ভারতের দক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা গব চাষের আদর্শ স্থান।

(iv) **ভূ-প্রকৃতি ঃ** কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধার্থে সমতল বা সামান্য ঢালু জমি গম চাষের পক্ষে উপযুক্ত । জমিতে জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত থাকাও বিশেষ প্রয়োজন।

(খ) অর্থনৈতিক পরিবেশ ঃ

(i) **শ্রমিক ঃ** গমচাষের জনয প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে চাষের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ভূমিচাষ থেকে শস্য কাটা পর্যন্ত প্রায় সব কাজই যন্ত্রের সাহায্যে করা হচ্ছে। তাচাড়া ব্যাপক প্রথায় গম চাষ করা হয়। এজন্য আজকাল গম চাষে অধিক শ্রমিক সরবরাহের প্রয়োজন হয় না।

(ii) **মূলধন ঃ** কীটনাশক ঔষধ, রাসায়নিক সার, জলসেচ, উচ্চফলনশীল বীজ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য গম চাষের প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

সুতরাং এককথায় গম চাষের অনুকূল পরিবেশগুলি হল মধ্যম বৃষ্টিযুক্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সমতল জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত ভূমিভাগ, উর্বর দোঁয়াশমাটি, উন্নত ধরনের জলসেচ ব্যবস্থা, উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার এবং বিভিন্ন যান্ত্রিক পধ্বতি।

❍ **উৎপাদন ঃ** ভারতের চাষযোগ্য জমির 17 শতাংশে গম চাষ হয়। সবুজ বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের ফলে 1967 সালের পর থেকে দেখা যায় গমের উৎপাদন গম চাষের জমির পরিমাণ, ও হেক্টর প্রতি উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। 1960–61 সালের 109.97 লক্ষ টন গমের উৎপাদন 1970–71 সালে বেড়ে হয় 238.32 লক্ষ টনে। ঐ একই সময়ে গম চাষের জমির পরিমাণ 41 শতাংশ এবং উৎপাদন ও 53.6 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। নতুন ধরনের উন্নত গম বীজ যেমন লারমারএ্যাগো, সোনারা, P.V-18, S-306, K-68, কল্যান, সোনা, সোনালিকা, সফেদ-লার্মা, ছোট লার্মা, H.D-2285, WL-711, HW-2009 ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে গম উৎপাদনে একটি বৈপ্লবিক সাফল্য এসেছে। গম চাষের এই সার্বিক উন্নতির চেষ্টা সত্ত্বেও অন্যান্য গম উৎপাদন দেশ যেমন—যুক্ত রাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া এবং চীনের চাইতে কম। উন্নত সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি ব্যবহার করে সেচ

সেবিত অঞ্চলে প্রতি হেক্টরে 4000 কেজি ও অসেচসেবিত অঞ্চলে প্রতি হেক্টর 2000 কেজি গম উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা স্থির হয়েছে। যে সমস্ত অঞ্চলে গমচাষ হয় না যেমন—আসাম উপত্যকা, ওড়িশা এই সমস্ত অঞ্চলেও গম চাষ শুরু হয়েছে। এছাড়া খারিফ শস্যের সময় মত চাষ ও পতিত জমিকেও কৃষির আওতায় আনা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণ গম চাষ হচ্ছে। আশা করা যায় এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে 2010 সালে গমের উৎপাদন 85–90 মিলিয়ন টন এ গিয়ে দাঁড়াবে। ভারতবর্ষ 1990–91 সালে 2,481, 181 লক্ষ টাকার গম উৎপাদন করেছিল।

❍ **ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল ঃ** গম চাষ প্রধানত উত্তর-পশ্চিম ভারতে সীমাবদ্ধ (চিত্র 3.44)। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, এবং হরিয়ানা এই তিনটি প্রধান গম উৎপাদক রাজ্য। এই তিনটি রাজ্যে ভারতের গম উৎপাদনের 55 শতাংশ জমিতে মোট গম উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন হয়ে থাকে। উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবকে একসঙ্গে "ভারতের শস্য ভান্ডার" বলা হয়। অন্যান্য প্রধান গম উৎপাদক রাজ্যগুলি হল মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং বিহার। এই ছয়টি রাজ্যে ভারতের 95টি গম উৎপাদক জেলা রয়েছে যারা একত্রে ভারতের প্রায় 92 শতাংশ গম উৎপাদন করে থাকে।

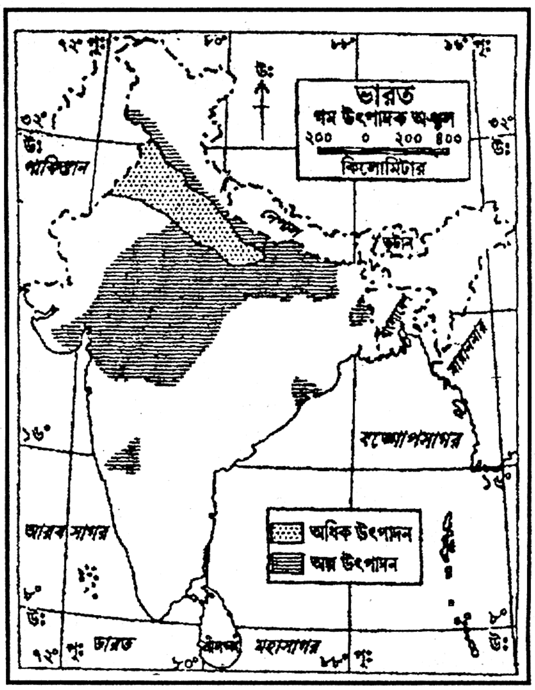

চিত্র 3.52 ঃ ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল

(1) **উত্তরপ্রদেশ ঃ** এটি একত্রে ভারতের বৃহত্তম গম উৎপাদক অঞ্চল। এই অঞ্চল দেশের গম উৎপাদনের 36% ও মোট গমচাষের জমির 37% অধিকার করে। 2002-03 সালে এখানে দেশের মোট গম উৎপাদনে 236.1 লক্ষ টন গম উৎপাদিত হয়। গঙ্গা ও তার বহু ছোট, বড় উপনদী ও তাদের পলি, অসংখ্য খাল ও তার সাথে অসংখ্য নলকূপের সাহায্যে জলসেচ এই অঞ্চলের গম উৎপাদনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এখানকার বেশি গম ক্ষেত্র গঙ্গা-ঘর্ঘরা দোয়াব অঞ্চলে অবস্থিত। এর পরের উল্লেখযোগ্য অঞ্চল গঙ্গা-যমুনা দোয়াব। এই দুটি দোয়াব অঞ্চলে রাজ্যের শতকরা 75 ভাগ গম উৎপাদিত হয়। এখানকার 43টি গম উৎপাদক জেলা উল্লেখযোগ্য। সাহারানপুর, মুজ্জফরনগর, মিরাট, মুরাদাবাদ, রামপুর, খেরী, গোন্ডা, বস্তি প্রধান উৎপাদক জেলা। বেনারসের পূর্বদিকে গম উৎপাদনের পরিমান কমে যাওয়ার কারণ অত্যধিক বৃষ্টিপাত।

(2) **পাঞ্জাব ঃ** অন্যান্য রাজ্যের চাইতে আয়তনে ছোট হলেও পাঞ্জাব গম উৎপাদনে প্রসিদ্ধ। সবুজ বিপ্লবের বাস্তবায়ন পাঞ্জাবকে গম উৎপাদনে উন্নত হতে সাহায্য করেছে। এখানকার উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা (যা অসংখ্য খাল ও টিউবওয়েলের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়), সামান্য বৃষ্টিপাত, পশ্চিমী-ঝঞ্ঝা এবং সিন্ধু-অববাহিকার পলিমাটি এই অঞ্চলকে গম চাষে উন্নত করেছে। সর্বোপরি এখানকার কৃষি-শ্রমিকেরা উন্নত প্রযুক্তি গ্রহনে যথেষ্ট আগ্রহী। দেশের মোট উৎপাদনের 22% পাঞ্জাবে উৎপাদিত হয়। 2002–03 সালে 141.75 লক্ষ টন গম উৎপাদন করে পাঞ্জাব দেশে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এখানকার বারোটি জেলা যেমন— জলন্ধর, লুধিয়ানা, পাতিয়ালা, অমৃতসর, ইপরোজপুর, ফরিদকোট, রূপনগর ইত্যাদি গম উৎপাদনে প্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে পাতিয়ালাই প্রধান উৎপাদক জেলা। এই রাজ্যে প্রচুর গম বাণিজ্যের জন্য উদ্বৃত্ত থাকে।

(3) **হরিয়ানা ঃ** প্রাকৃতিক এবং অর্তনৈতিক কারণ পাঞ্জাবের মতন অনুকূল হলেও এখানে পাঞ্জাবের চাইতে কম গম উৎপাদিত হয়। সবুজ বিপ্লবের বাস্তবায়ন হরিয়ানায় যথেষ্টই ফলপ্রসূ। হরিয়ানায় দেশের মোট গম চাষের জমির শতকরা 9 ভাগ ও মোট গম উৎপাদনের শতকরা 14 ভাগ উৎপাদন হয়ে থাকে। প্রতি হেক্টর 4050 কেজি গম উৎপাদনকারী হরিয়ানা দেশে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। কারনাল, কুরুক্ষেত্র, আমবালা, পানিপথ, সনিপথ, রোহোতাক, হিসার, সির্সা, গুরগাঁ, হরিয়ানার প্রধান গম উৎপাদক জেলা।

(4) **মধ্য প্রদেশ ঃ** দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা 10 শতাংশের অধিকারী মধ্য প্রদেশ গম উৎপাদনে দেশে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। এখানকার 41 লক্ষ হেক্টর জমিতে গম চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে প্রতি হেক্টরে গম উৎপাদনের পরিমান 1390 কেজি যা দেশের গড় উৎপাদনের 2620 'প্রতি হেক্টরে' চাইতে ও কম। দেশে গম উৎপাদনে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করবার জন্য মধ্যপ্রদেশে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এখানকার 42টি গম উৎপাদক জেলার মধ্যে 4টি উল্লেখযোগ্য।

(5) **রাজস্থান ঃ** বহু যুগ আগে থেকেই বিস্তৃত বালু মৃত্তিকা অঞ্চল, স্বল্প বৃষ্টিপাত, জলসেচের অসুবিধা রাজস্থানে গম উৎপাদনের অন্তরায় হয়ে আসছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর কিছু জলসেচ প্রকল্প প্রধানত ইন্দিরাগান্ধী খাল কাটার ফলে রাজস্থানে চাষ আবাদে পরিবর্তন এসেছে। এই রাজ্য বর্তমানে দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা 7.49 শতাংশ এবং মোট গম চাষের জমির শতকরা 7.24 শতাংশ এর অধিকারী। এখানকার 20টি জেলার মধ্যে 11টি জেলা গম চাষের পক্ষে উল্লেখযোগ্য। গঙ্গানগর, হনুমান গড়, ভরতপুর, কোটা, আলোয়ার, জয়পুর, চিতোরগড়, মাধোপুর, উদয়পুর এবং পালি রাজস্থানের উল্লেখযোগ্য গম উৎপাদক জেলা।

(6) **বিহার ঃ** দেশের মোট গম উৎপাদনের শতকরা 6.3 শতাংশ অংশ ও মোট গম চাষের জমির শতকরা 9 শতাংশ-এর অধিকারী বিহারে প্রতি হেক্টরে গম উৎপাদন মাত্র 1900 কেজি। এ থেকে প্রমাণিত হয় বিহারে গম উৎপাদনের উন্নতি হওয়া খুব জরুরি। উত্তর বিহারের সমভূমির ভোজপুর, নালন্দা, পূর্ব-পশ্চিম চম্পারণ, বেগুসরাই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গম উৎপাদক জেলা।

❍ **অন্যান্য রাজ্য ঃ** গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং হিমাচল প্রদেশ অন্যান্য গম উৎপাদক রাজ্য।

গুজরাটে প্রধানত মাহী এবং সবরমতী উপত্যকায়, জুনাগড়, ভবনগর, বারুচ, রাজকোট-এ গম চাষ হয়।

মহারাষ্ট্রে পরধানত ওয়ার্ধা, তাপী, গোদাবরী, ভীমা, পূর্ণা উপত্যকায় গম চাষ হয়ে থাকে।

উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের গম উৎপাদন ও গম চাষের জমির পরিমাণ এই দু'য়ের ক্ষেত্রেই অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। গম চাষের প্রথম অবস্থার 45.5 হাজার টন উৎপাদন বর্তমানে 887 হাজার টনে পৌঁছেছে (2002–03)। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান গম উৎপাদক জেলাগুলি হল বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া।

হিমাচল প্রদেশে গম প্রধানত কাঙড়া, মান্ডি এবং উনা জেলায় চাষ হয়ে থাকে।

জম্মু এবং কাশ্মীরের শ্রীনগর, বারামুলা, দোদা, অনন্তনাগ, জম্মু এবং পুঞ্চ প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল। কর্ণাটকের বীজাপুর, রায়চূড়, বেলগাঁও এবং ধারোয়ার জেলায় কিছু গম চাষ হয়ে থাকে।

❍ **বাণিজ্য ঃ** ভারত বর্তমানে গম উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতালাভ করেছে এবং দেশের মোট উৎপাদনের $\frac{1}{3}$ অংশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। উদ্বৃত্ত গম উৎপাদনকারী পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ঘাটতি রাজ্য মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লীকে গম সরবরাহ করে। 1970–71 সালে ভারত 27.23 লক্ষ টন এবং 1975–76 সালে 70.94 লক্ষ টন গম আমদানী করেছিল। কিন্তু তারপর থেকেই গম উৎপাদনে ভারত স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে ও গম আমদানী ও বন্ধ হয়েছে। ভারত বর্তমানে সামান্য পরিমান গম বিদেশে রপ্তানী করে।

❑ ভুট্টা

ভুট্টা একপ্রকার দানাশষ্য যা খাদ্যশস্য এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এর দান খাদ্য সরবরাহের সাথে সাথে শ্বেতসার ও গ্লুকোসও সরবরাহ করে। এর কাণ্ডগুলি পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

❍ ভুট্টা চাষের অনুকূল পরিবেশ ঃ

বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু ও মৃত্তিকায় ভুট্টা চাষ হয়ে থাকে। খারিফ শষ্য ভুট্টা প্রধানতঃ মৌসুমী বায়ুর আগমনের সাথে সাথে লাগানো হয় এবং মৌসুমী বায়ুর পশ্চাৎ অপসারণের পর কাটা হয়। কিন্তু তামিলনাড়ুতে এটি রবিশষ্য হিসাবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে শীতকালীন বৃষ্টির শুরুতে লাগানো হয়।

(1) **জলবায়ু ঃ উত্তাপও বৃষ্টিপাত ঃ** ভুট্টা চাষে 50–100 সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। কিন্তু 100 সে.মি.-এর উপর বৃষ্টিপাত ভুট্টা চাষে একেবারেই অনুপযুক্ত। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সামান্য জলসেচে এই ফসলের চাষ হয়। পাঞ্জাব এবং কর্ণাটকে ভুট্টা চাষের জমির প্রায় শতকরা 50 ভাগে জলসেচ করা হয়। বর্ষাকালে কোনো সময়ে দীর্ঘদিন বৃষ্টিশূন্য হলে তা ভুট্টা চাষের পথে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ভুট্টা পরিপক্ক হওয়ার সময় ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন।

ভুট্টা চাষে 21 ডিগির সেলসিয়াস থেকে 27 ডিগ্রি সেঃ উষ্মতা উপযুক্ত। তবে 35 ডিগ্রি সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা এই গাছ সহ্য করতে পারে। তুষারপাত ভুট্টা চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং যে সমস্ত অঞ্চলে মোটামুটি $4\frac{1}{2}$ মাস তুষারপাত মুক্ত থাকে সেখানেই ভুট্টার চাষ হয়।

(2) **মৃত্তিকা ঃ** জল নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর পলিমাটি এবং লাল দো-আঁশ মৃত্তিকায় ভুট্টা চাষ ভালো হয়। নাইট্রোজেনযুক্ত মৃত্তিকা ভুট্টা চাষের উপযোগী।

(3) **ভূপ্রকৃতি ঃ** সমতল জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত ঢালু জমি ভুট্টা চাষের উপযোগী। সে কারণে পাহাড়ের ঢালু অংশেও ভুট্টার চাষ হয়। ভারতবর্ষে মশলা সব্‌জি ও তৈলবীজের সাথে সাথে ভুট্টার চাষ হয়।

❍ উৎপাদন ঃ ভারতের আর একটি প্রধান খাদ্যশষ্য ভুট্টা যা মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা 4 ভাগ অংশে চাষ হয়ে থাকে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভুট্টা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। 1950–51 সালের 17.29 লক্ষ টন উৎপাদন 1960–61 সালে 40.80 লক্ষ টন ও 1970–71 সালে 74.86 লক্ষ টন এ পৌঁছায়। 1985–86 সালে ভারতে 66 লক্ষ 44 হাজার মেঃটন ভুট্টা উৎপাদন হয়। কিন্তু তারপর থেকে এর উৎপাদন ক্রমবর্ধমান। 2003–04 সালে ভারত 14.7 মিলিয়ন টন ভুট্টা 7.4 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে উৎপাদন করে ছিল। 1950–51 ও 2003–04 সালে ভারতে ভুট্টা চাষের অঞ্চল বেড়ে দ্বিগুন হলেও উৎপাদন কিন্তু প্রায় 5 গুন বেড়ে যায়।

❍ ভুট্টা উৎপাদক অঞ্চল ঃ বিহার, উত্তরাঞ্চল, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হিমাচল প্রদেশ ভারতের প্রধান ভুট্টা উৎপাদক রাজ্য। প্রধান ভুট্টা উৎপাদন রাজ্য বিহার দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা 16 শতাংশ উৎপাদন করে। উত্তরের গাঙ্গেয় সমভূমির সব জেলা ও পালামৌ ঝাড়খণ্ডের ভুট্টা উৎপাদক অঞ্চল হলেও প্রধানত বিহারের সমস্তিপুর, বেগুসরাই, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, চম্পারণ জেলাই ভুট্টা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

উত্তরাঞ্চলের উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি প্রধান ভুট্টা উৎপাদক অঞ্চল। রাজস্থানে প্রধানত উদয়পুর, ভিলওয়ারা, চিতোরগড়ে ভুট্টার চাষ হয়। হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য ঢালে ভুট্টার চাষ হয়। কাংড়া, ছাম্বা, মাণ্ডি জেলাগুলি ভুট্টা উৎপাদনে প্রসিন্ধ।

অন্যান্য ভুট্টা উৎপাদক রাজ্যগুলি হল গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা এবং মহারাষ্ট্র। কিন্তু পাঞ্জাবে ভুট্টা অপেক্ষা অন্যান্য খারিফ শষ্য বেশী গুরুত্ব পাওয়ায় এর উৎপাদন অনেক কমে গেছে।

❑ মিলেট

❍ **মিলেট ঃ** কম সময়ে উৎপাদিত (3–4 মাস) এই নিকৃষ্ট দানাশষ্য প্রধানত উষ্ম আবহাওয়ায় ভালোমত চাষ হয়ে থাকে। মানুষের খাদ্যশষ্য সরবরাহের সাথে সাথে একটি পশুখাদ্যও সরবরাহ্ করে। জোয়ার, বাজরা, রাগিকে মিলেট বলে।

❑ জোয়ার

❍ **জোয়ার ঃ** জোয়ারকে ইউরোপ ও আমেরিকায় সোরগম বলে। উৎপাদন ও জমির আয়তনের অনুপাতে ধান ও গম-এর পরেই জোয়ারের স্থান। 2003-04 সালে ভারতে মোট দানাশষ্য উৎপাদনের জমির 9.5 শতাংশ, ও মোট উৎপাদনের 7. 3 শতাংশের অধিকারী ছিল মিলেট। ডঃ ভোলকার জোয়ারের খাদ্যগুণের উল্লেখ করেছেন।

❍ **জোয়ার চাষের অনুকূল অবস্থা ঃ** খারিফ ও রবি দুই-ধরনের শষ্য হিসাবে জোয়ারের চাষ হয়ে থাকে।

❍ **উত্তাপ ঃ** জোয়ার চাষের জন্যে 26^0 সে. থেকে 32^0 সে. উষ্মতা প্রয়োজন। কিন্তু রবিশষ্য হিসাবে জোয়ার 16^0 সে.-এর উপর উষ্মতায় জন্মে থাকে।

❍ **বৃষ্টিপাত ঃ** 30 সে.মি. বৃষ্টিপাত জোয়ার চাষে উপযুক্ত। তবে 100 সে.মি.-এর উপর বৃষ্টিপাতে জোয়ার চাষ হয় না। কিন্তু বৃষ্টি ও খরা সহ্য করতে পারলেও অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও অত্যধিক উষ্মতা জোয়ারের পক্ষে ক্ষতিকর।

❍ **মৃত্তিকা ঃ** সব রকমের মৃত্তিকায় জোয়ারের চাষ হলেও কৃষ্মমৃত্তিকা ও লাল দোঁআশ মৃত্তিকায় জোয়ার ভালো জন্মায়। তাছাড়া পলিমৃত্তিকাও জোয়ার চাষের পক্ষে আদর্শ। প্রধানতঃ সমভূমি অঞ্চলে জন্মালেও এটি 1200 মিঃ উচ্চতার ঢালযুক্ত জমিতেও জন্মায়।

জোয়ার উৎপাদন এবং উৎপাদক অঞ্চল

অন্যান্য খাদ্যশষ্যের চাষ জোয়ারের চাষকে যথেষ্ট বাধাদান করে। ফলে দেখা যাচ্ছে দিন দিন ভারতে জোয়ার চাষের জমির পরিমান কমছে। 2002-03 সালের জোয়ার চাষের জমির পরিমান কমে দাঁড়ায় 92.04 লক্ষ হেক্টর যা 1960–61 সালে ছিল 184.12 লক্ষ হেক্টর। এর সাথে সাথে উৎপাদনের পরিমাণও কমছে। 1994–95 এবং 2002–03 সালে উৎপাদন ছিল যথাক্রমে 70.76, 91.98 লক্ষ টন।

শুষ্ক অঞ্চলের অনুর্বর জমিতে বিশেষত উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জোয়ারের চাষ হয়। জোয়ার উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থানাধিকারী মহারাষ্ট্র দেশের প্রায় 50 শতাংশ উৎপাদন করে থাকে। এখানকার 22টি জেলা যেমন ওসমানাবাদ, বুলদানা, পারভানি, কোলাপুর, অমরাবতী, এবং আহমেদনগর জোয়ার উৎপাদনে প্রসিদ্ধ।

মহারাষ্ট্র মালভূমি অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশষ্য জোয়ার এবং এখানে তা বছরে দু'বার চাষ হয়। পুনের দক্ষিণ-এর চাষযোগ্য জমির 40 শতাংশ জমিতে জোয়ারের চাষ হয়। এর কাণ্ড 2মিঃ মত লম্বা হয় ও তা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দেশের উৎপাদনের 16.38 শতাংশের অধিকারী কর্ণাটক জোয়ার উৎপাদনে ভারতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। এখানকার শতকরা 80 শতাংশ উৎপাদন ধারওয়ার, বিজাপুর, রায়চুর, গুলবর্গা, চিত্রদূর্গ, এবং বিদার থেকে এসে

থাকে। প্রতি হেক্টরে জাতীয় উৎপাদন 779 কেজি. হলেও কর্ণাটক প্রতি হেক্টরে 756 কেজি জোয়ার উৎপাদন করে।

মধ্যপ্রদেশ জোয়ার উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও মহারাষ্ট্রের চাইতে-এর উৎপাদন অনেক কম। দেশের মোট উৎপাদনের মাত্র 7.81 শতাংশ মধ্যপ্রদেশ উৎপাদন করে। উজ্জয়িনী, দেওয়াস, সাজাপুর, পূর্ব এবং পশ্চিম নিমা ইত্যাদি প্রধান বাজরা উৎপাদক জেলা। এখানকার 31টি জেলায় বাজরা উৎপাদিত হয়ে থাকে।

অন্ধ্রপ্রদেশ উৎপাদন এবং জমির পরিমাণ দুই ক্ষেত্রেই কয়েক বছর থেকে পিছিয়ে পড়ছে। কর্ণেল, মেহেবুবনগর, আদিলাবাদ, কুডাপ্পা, নালগোন্ডা, মেডক, অনন্তপুর, গুনটুর অন্ধ্রপ্রদেশের প্রধান উৎপাদক জেলা।

তামিলাডুর হেক্টর প্রতি উৎপাদন ভারতবর্ষে (1134 কেজি) সর্বোচ্চ। ধানের পরে জোয়ার এখানকার প্রধান খাদ্যশস্য। জোয়ার উৎপাদনের প্রধান জেলাগুলি হল— কোয়েম্বাটুর, তিরুচিরাপল্লী, মাদুরাই এবং ধর্মপুরী। রাজস্থানের শুষ্ক বায়ু এবং বালু মৃত্তিকা জোয়ার চাষে আদর্শ। এখানকার কোটা, মাধোপুর, জয়পুর উল্লেখযোগ্য জোয়ার উৎপাদক অঞ্চল।

উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে গো-খাদ্য হিসাবে জোয়ারের চাষ হয়।

গুজরাট রাজ্যের সুরাট, ভারুচ, মাহাসানা, এবং ভাদোদরায় পশু-খাদ্য হিসাবে জোয়ারের চাষ হয়।

❑ বাজরা

❍ **বাজরা ঃ** মিলেটের অন্তর্ভুক্ত আরেকটি ক্ষুদ্র দানাশস্য হল বাজরা যা ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে উৎপাদন হয়ে থাকে। এই শস্যের কাণ্ডও পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কাণ্ডকে ঘরের ছাউনি হিসাবেও ব্যবহার করা হয়।

❍ বাজরা চাষের উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ ঃ শুষ্ক ও উষ্ম অঞ্চলের ফসল বাজরা চাষের জন্য 40–50 সে.মি. বৃষ্টিপাত দরকার। 100 সে.মি.-এর বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে বাজরা কমই উৎপাদন হয়। বাজরা চাষের উপযুক্ত উষ্মতা 25^0–30^0C। বাজরা চাষের প্রথম অবস্থায় সামান্য বৃষ্টিপাতের পর রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া প্রয়োজন। অনুর্বর বালুমৃত্তিকা, কৃষ্ম ও লোহিত মৃত্তিকায়ও বাজরা চাষ হয়। এই খারিফ শস্য মে-সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে লাগান হয় এবং অক্টোবর ও ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে কাটা হয়। তুলা, জোয়ার এবং রাগির সাথে এই ফসল চাষ হয় এবং এর চাষে জলসেচ প্রয়োজন হয় না।

❍ **উৎপাদন এবং বণ্টন ঃ** 1950–51 সালের 25.95 লক্ষ টন উৎপাদন 2003–40 সালে পৌছায় 118.0 লক্ষ টন। 104.0 লক্ষ হেক্টর জমিতে 118.0 লক্ষ টন বাজরা উৎপাদন হয় যার প্রতি হেক্টরের উৎপাদন 1,134 কেজি (2003–04)। ভারতের 80 শতাংশ বাজরা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানে উৎপন্ন হয়। রাজস্থান বাজরা উৎপাদনে চতুর্থ স্থানের অধিকারী। 2002–03 সালে এখানে 7.16 লক্ষ টন বাজরা উৎপন্ন হয়েছিল। প্রধান বাজরা উৎপাদক জেলাগুলি হল—বারমার, নাগাউর, যোধপুর, পালি, সিকার, চুরু, গঙ্গানগর, হনুমানগড়, বিকানের, আলওয়ার, ভরতপুর, জয়শলমীর।

মহারাষ্ট্র বাজরা উৎপাদনে প্রথম স্থানাধিকারী। 2002–03 সালে 9.07 লক্ষটন বাজরা উৎপাদন করে মহরাষ্ট্র দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা 19.6 শতাংশ-এর অধিকারী হয়। এখানকার মধ্য মালভূমির অনুর্বর মৃত্তিকা ও শুষ্ক জলবায়ুতে বাজরা চাষ হয়ে থাকে। নাসিক, সাতারা, পুনে, শাঙলি, ঔরঙ্গাবাদ, শোলাপুর, জলগাঁও প্রধান বাজরা উৎপাদক জেলা। প্রতিবেশী গুজরাট বাজরা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এবং 2002-03 সালে এর উৎপাদন ছিল 9.07 লক্ষ টন। এখানকার প্রায় মরু অঞ্চলে প্রধানত বাজরা চাষ হয়ে থাকে। কচ্ছ, ভবনগর, আমরেলি, জামনগর, রাজকোট, জুনাগড় বাজরা উৎপাদক জেলা। উত্তর প্রদেশের উৎপাদন 8.98 লক্ষ টন (2002–03 সাল)। এখানকার মথুরা, আগ্রা, আলিগড়, মুরাদাবাদ, শাহজাহানপুর প্রধান বাজরা উৎপাদক জেলা।

2002–03 সালে হরিয়ানার উৎপাদন ছিল 4.60 লক্ষ টন। রাজস্থান সংলগ্ন হরিয়ানা রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চলে প্রধানত বাজরা চাষ হয়। গুরগাঁও, রোহটক, হিসার প্রধান বাজরা উৎপাদক জেলা। অন্যান্য বাজরা উৎপাদক রাজ্যগুলি হল—তামিলনাডু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ।

❑ রাগি

❍ **রাগি ঃ** মিলেটের অন্তর্ভুক্ত আরেকটি দানাশষ্য রাগি দক্ষিণভারতের শুষ্ক অঞ্চলে এবং উত্তর ভারতে কিছু কিছু অংশে চাষ হয়। এর চাষের 20^0–30^0 সে. উষ্ণতা এবং 50–100 সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। লাল, কালো এবং বালু মিশ্রিত দোঁয়াশ মৃত্তিকায় রাগির চাষ হয়ে থাকে। খারিফশস্য রাগি মে-অগষ্ট মাসের মধ্যে লাগানো হয় এবং সেপ্টেম্বর-জানুয়ারী মাসের মধ্যে কাটা হয়। 2002-03 সালে ভারতে রাগির উৎপাদন ছিল 14.45 লক্ষ টন। প্রধান উৎপাদনকারী কর্ণাটকের রাগি উৎপাদন এর পরিমান ছিল 7.71 লক্ষ টন। এখানকার 7.7 লক্ষ হেক্টর জমিতে বিশেষত ব্যাঙ্গালোর, টুমকুর, চিত্রদুর্গ কোলার, হাসান ইত্যাদি জেলায় রাগির চাষ হয়। রাগি উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হলেও তামিল নাডুর উৎপাদন কর্ণাটক এর চাইতে অনেক কম। তামিলনাডু উৎপাদন মাত্র 2.11 লক্ষ টন। এখানকার সালেম, কোয়েম্বাটুর, উত্তর আরকট, দক্ষিণ আরকট এবং নীলগিরি জেলা প্রধান রাগি উৎপাদনক অঞ্চল। এছাড়া মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশেও সামান্য রাগির চাষ হয়ে থাকে।

❑ বার্লি

❍ **বার্লি ঃ** মিলেটের মতই একটি নিকৃষ্ট শষ্য বার্লি। খাদ্য ছাড়াও মদ তৈরীতে বার্লি ব্যবহৃত হয়।

❍ **বার্লি উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ঃ** উচ্চতাপ এবং বেশি আর্দ্রতা সহ্য করতে না পারা বার্লি প্রধানত বছরে তিনমাস 10–15 সে. উষ্মতাযুক্ত অঞ্চল এবং গড় বৃষ্টিপাত 75–100 সে.মি. যুক্ত অঞ্চলে উৎপাদন হয়। কাদা এবং পলি মৃত্তিকা বার্লি চাষে আর্দ্র। পশ্চিম হিমালয়ের উপত্যকায় ও উত্তর ভারতের সমভূমিতে বার্লি রবিশষ্য হিসাবে চাষ হয়। উত্তরাখণ্ডের 1300 মি. উচ্চতাতে বার্লি চাষ হয়ে থাকে।

❍ **উৎপাদন ও বন্টন ঃ** গত তিন দশক ধরে বার্লির উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাপে কমেছে। প্রধান খাদ্যশস্যের (গম) চাষে বেশি গুরুত্ব ও বেশি জমি ব্যবহার করারই উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং পশ্চিমবঙ্গে বার্লি চাষ হয়ে থাকে।

❑ রেপসিড ও সর্ষে

চীনাবাদামের পরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ তৈলবীজ হল রেপসীড ও সর্ষে। এই বীজের মধ্যে তেলের পরিমাণ হল 25–45% যা রান্নার কাজে ও খাদ্যদ্রব্য উত্তম রাখবার কাজে ব্যবহার করা হয়। এর খৈল পশুখাদ্য ও সার রূপে ব্যবহৃত হয়।

অনুকূল পরিবেশ ঃ গম এবও ছোলার মত এটিও ঠাণ্ডা জলবায়ুতে ভালো জন্মায়। ফলে একে রবিশষ্য হিসাবেই চাষ করা হয়। রেপসীড ও সর্ষের প্রধান উৎপাদক অঞ্চল হল শতদ্রু সমভূমি। এই ফসল কিছু পরিমাণে দক্ষিণ ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চলে জন্মে থাকে।

উৎপাদন ও বন্টন ঃ জমির পরিমাণ ও উৎপাদন এই দুই ক্ষেত্রেই ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। গত তিন দশকে রেপসীড ও সর্ষের উৎপাদনে ভারত অভাবনীয় উন্নতি করেছে। 1995–95 খৃষ্টাব্দে ভারতে এই ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 60.7 লক্ষ টন। আর 2002–03 সালে 39.18 লক্ষ টন।

রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ ঃ এই দুটি রাজ্যে রেপসীড ও সর্ষের উৎপাদনের প্রধান স্থান অধিকার করে ও ভারতের মোট উৎপাদনের 53 শতাংশ উৎপাদনের দাবীদার। উত্তরপ্রদেশ এই দুই শস্যের উৎপাদনে বহুদিন থেকে আধিপত্য বিস্তার করলেও 2002–03 সালের পরিসংখ্যান প্রমান দেয় যে রাজস্থান উৎপাদনের দিক থেকে তাকে ছাড়িয়ে গেছে।ঐ সময় রাজস্থানের উৎপাদন ছিল 1318 হাজার টন।ঐ সময়ে উত্তর প্রদেশের উৎপাদন ছিল 759 হাজার টন। রাজস্থানের প্রধান প্রধান উৎপাদক জেলা হল গঙ্গানগর, ভরতপুর, কোটা, আলওয়ার, জয়পুর, ও পালি এবং উত্তর প্রদেশের প্রধান জেলাগুলি হল আগ্রা, ফৈজাবাদ, মিরাট, কানপুর, সাহারানপুর, ইটা এবং এটাওয়া।

হরিয়ানা ভারতবর্ষের তৃতীয় উৎপাদক রাজ্য। এখানকার উৎপাদন 694 হাজার টন। হিসার, সির্যা, মহেন্দগড়, রেওয়ারী, গুঁরগাও এবং ভিওয়ানী প্রধান উৎপাদক জেলা। মধ্যপ্রদেশের উৎপাদন 210 হাজার টন ও ভারতের মোট উৎপাদনের পাঁচ শতাংশের অংশীদার। এখানকার বস্তার, মোরেনা প্রধান উৎপাদক জেলা। অন্যান্য উৎপাদক রাজ্যগুলি হল গুজরাট, আসাম, বিহার, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব, এবং জম্মু ও কাশ্মীর। ইদানীং পশ্চিমবঙ্গ এক গুরুত্বপূর্ণ তৈল উৎপাদক রাজ্যে পরিণত হয়েছে। 2002–03 সালে এখানে 329 হাজার টন উৎপাদন হয়েছিল।

❑ তিসি

তিসির বীজে তেলের পরিমাণ 35–47 শতাংশ। অতসীর বীজকে তিসি বলা হয়। রং ও বার্ণিশের কাজে এই তেল ব্যবহৃত হয়। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে একে খাদ্য তেল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

তিসি উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ঃ বিভিন্ন জলবায়ুতে এই শষ্য জন্মালেও প্রধানতঃ ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়াই তিসি চাষের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। 20^0 সে. উষ্মতা ও 75 সে.মি. বৃষ্টিপাত, কাদাযুক্ত দোঁয়াশ মাটি, কৃষ্ম মৃত্তিকা ও পলিমৃত্তিকা এই শষ্যের পক্ষে একান্ত উপযোগী। সমুদ্রতল থেকে 800 মিটার উচ্চতাযুক্ত অঞ্চলে এই ফসলের চাষ হয়। এটি রবি শষ্য। সাধারণতঃ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এটি লাগানো হয় ও মার্চ-এপ্রিল মাসে কাটা হয়।

উৎপাদন ও বণ্টন ঃ পৃথিবীর তিসি উৎপাদনের 10 শতাংশ উৎপাদন করে খারত পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে রাশিয়া ও কানাডা। ভারতের গড় বার্ষিক উৎপাদন 3.5 লক্ষ টন। ভারত 1995–96 সালে 309 হাজার টন তিসি উৎপাদন করেছিল। কিন্তু 2002–03 সালে তা কমে দাঁড়ায় 173 হাজার টনে।

মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র ভারতের প্রধান তিসি উৎপাদক রাজ্য এবং এরা একত্রে ভারতের তিন চতুর্থাংশ উৎপাদন করে থাকে। মধ্যপ্রদেশের উৎপাদন সর্বচেয়ে বেশী এবং এখানকার উৎপাদক অঞ্চলগুলি হল দ্রুগ, বিলাসপুর, বালাঘাট, রেওয়া, হোসাঙ্গাবাদ, রায়পুর।

দ্বিতীয় উৎপাদক রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশের সব জেলাতেই মোটামুটি অন্যান্য শষ্যের সঙ্গে তিসি উৎপাদন হলেও কানপুর, আগ্রা, এটাওয়া, মির্জাপুর, এলাহাবাদ, গোণ্ডা প্রধান তিসি উৎপাদক জেলা।

তৃতীয় তিসি উৎপাদক রাজ্য হল মহারাষ্ট্র এবং ভারতের মোট উৎপাদনের 7% এখান থেকে উৎপাদন হয়। বিহার ভারতের তিসি উৎপাদনের 15 শতাংশের অংশীদার। পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা বুজঃফরপুর, চম্পারন প্রধান উৎপাদক জেলা। এছাড়া রাজস্থান, ওড়িষ্যা ও কর্ণাটকে তিসি উৎপাদন হয়ে থাকে।

❑ বাগিচা শষ্য ❑

একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে যখন সারিবদ্ধভাবে কোনো নির্দিষ্ট ফসলের চাষ হয়, তখন তাকে **বাগিচা শষ্য** বলে। অন্যান্য শষ্যের মত এটি বছরের প্রধান ফসল নয় এবং এই গাছ থেকে উৎপাদন পেতে 3–5 বছর সময় লাগে।

কিন্তু একবার ফসল দিতে শুরু হলে একটি গাছ থেকে 35–40 বছর পর্যন্ত ফসল পাওয়া যায়। গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদনের জন্য প্রথম অবস্থায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয় ও উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও প্রয়োজন। ভারতের মত বৃহৎ দেশে এই ফসল সামান্য উৎপাদন হলেও, এদেশে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী। চা, কফি, রবার প্রধান বাগিচা ফসল হলেও মসলাকেও এর অর্ন্তভুক্ত করা হয়। চা ও কফি পাণীয় হিসাবে বিখ্যাত। ভারতে এই ফসলের চাষে কয়েক লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

❑ চা

চা একজাতীয় গাছের শুকনো পাতা। এটি ক্যাফিনযুক্ত, মাদক বর্জিত, মৃদু উত্তেজক পানীয়। এটি খুব হাল্কা ও উত্তেজক পানীয়। সে কারনে ভারতবর্ষে এটি পানীয় হিসাবে বহুল প্রচলিত। ক্যামেলিয়া সাইনেসসিস নামের একরকম চিরহরিৎ শ্রেণীর গাছের পাতা থেকে চা তৈরী করা হয়। এছাড়া আসামিকা প্রজাতিও চা উৎপাদন এর উপযুক্ত। যদিও শোনা যায় চা গাছের আবিষ্কার ও প্রাচুর্য দুই-ই রয়েছে চীনের অধিকারে, কিন্তু 1823 খৃঃ মেজর রবার্ট ব্রুস বলেছিলেন যে ভারতে আসামের পার্বত্য ঢালে এই ঝোপ জন্মাতে পারে। ফলে 1840 সালে চায়ের বীজ চীন থেকে এনে ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকায় লাগানো হয়। সে সময় উচ্চ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতে চা-এর চাষ হলেও পরবর্তীতে নিম্ন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও দার্জ্জিলিঙ-এ চায়ের চাষ শুরু হয়। 1859 সালে কেবলমাত্র আসামেই 30টি চায়ের বাগান ছিল। এরপর দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল তরাইয়ে ও হিমাচলপ্রদেশে চায়ের চাষ শুরু হয়।

ভৌগোলিক পরিবেশ ঃ বিশ্বের ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রধানতঃ চা-এর চাষ হয় অর্থাৎ উষ্ম ও আর্দ্র জলবায়ু চা চাষের উপযোগী। চা-এর গুণমান, উৎপাদন ও জলবায়ুর মধ্যে একটা খুব সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে।

● চা চাষের উপযুক্ত উষ্মতা 20^0–30^0C কিন্তু 35^0C-এর উপর ও 10^0C-এর নীচের উষ্মতা চা গাছের পক্ষে ক্ষতিকর।

● চা চাষে বার্ষিক 150–300 সে.মি. বৃষ্টিপাত আদর্শ হলেও তা সারা বছর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একটানা খরা যেমন এই ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর তেমনি অতিরিক্ত আর্দ্রতা, তুহিন ও সকালের কুয়াশা এই গাছে দ্রুত নতুন পাতা জন্মাতে সাহায্য করে।

● তাছাড়া, উষ্ম ও শীতল বাতাসও এর পাতা জন্মাবার পক্ষে উপযুক্ত।

● এই গাছ ছায়া পছন্দ করে, ফলে ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষের নীচে এরা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

● জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর, অম্লধর্মী ও লৌহ ও ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত মৃত্তিকা চা চাষের পক্ষে উপযোগী। মৃত্তিকা জৈব পদার্থ, ফস্‌ফরাস ও পটাশ মিশ্রিত হলে চাষের উৎকর্ষতা বাড়ে। যেমন দার্জিলিঙ এর চা।

● যদিও চা গাছ বেশী বৃষ্টি পছন্দ করে তবুও তা স্থায়ী হলে গাছের শিকড়ের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। সে কারণে পাহাড়ের ঢাল যেখানে বেশী হয় কিন্তু জল দাঁড়ায় না, তা চা চাষের সবচেয়ে উপযোগী।

● ভারতের বেশীর ভাগ চা চাষের ক্ষেত্র 600 থেকে 1800 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত।

● চা চাষের বহু শ্রমিকের প্রয়োজন এবং এদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যও এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। বিশেষতঃ চা পাতা আহরনের জন্য যথেষ্ট নিপুনতার দরকার। এক্ষেত্রে শিশু ও নারী শ্রমিক খুবই উপযোগী।

● চা বাগানের পরিচর্যা, শ্রমিকের মজুরি, যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক প্রভৃতির জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

● উন্নত পরিবহন ব্যবস্থাও চা শিল্পের অগ্রগতির জন্য জরুরী।

চা চাষের পদ্ধতি ঃ সাধারণতঃ পাহাড়ের ঢালু অংশ পরিষ্কার করে চা গাছ লাগানো হয় ও সেখানে আগে

থেকেই ছায়া প্রদানকারী গাছ লাগানো থাকে। বীজ ক্ষেত্রে চারা তৈরী করে সেগুলি সারিবধ্বভাবে বাগানে লাগানো হয়। চা বাগান নির্দিষ্ট দিন অন্তর অন্তর পরিষ্কার করা ও কোপানো হয় ও আগাছা পরিষ্কারকরা হয়। ফলে গাছগুলিকে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। চা বাগানে সব সময় সার প্রয়োগ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে জৈব সারও ব্যবহার করা হয়। চা চাষের ক্ষেত্রে গাছ ছাঁটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কারণ তাতে গাছের আকৃতি ও উচ্চতা সঠিক বজায় থাকে। তাছাড়া, নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঠিকভাবে গাছ ছাঁটলে নতুন ডালপাতা বের হয় যা থেকে বেশী পরিমাণ চা-পাতা সংগ্রহ করা যায়।

উৎপাদন ঃ ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতে চায়ের চাষ শুরু হয়েছে আসামে এবং তখন থেকেই এর চাষে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার সময়ে ভারতে মোটামুটি 3,011 লক্ষ হেক্টর জমিতে 2.61 লক্ষ টন চা উৎপন্ন হত। F.A.O.-র হিসাব মত সারা পৃথিবীতে মোট 26.22 লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপন্ন হয়। পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ভারতে গত 44 বছরে অর্থাৎ 1950-51 সাল ও 1994-95 সালের মাঝামাঝি সময়ে চায়ের উৎপাদন বেড়েছে তিন গুন। এই সময়ে 700 চা কোম্পানী, 13.6 হাজার চা বাগান ছিল যার মোট পরিমাণ ছিল 4.1 লক্ষ হেক্টর ও উৎপাদন ছিল 7.37 লক্ষ টন চা পাতা।

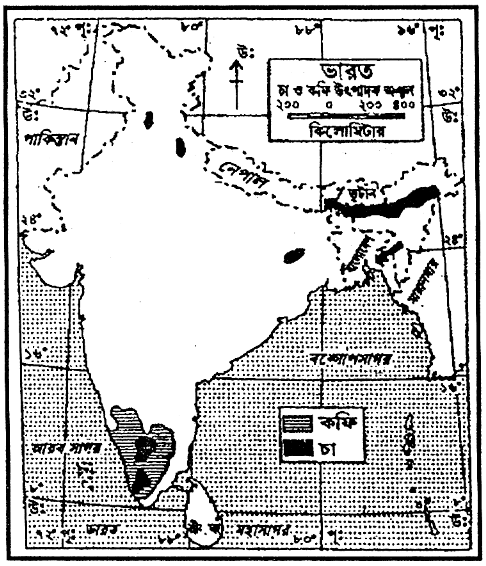

চিত্র 3.53 ঃ ভারতের চা ও কফি উৎপাদক অঞ্চল

বণ্টন ঃ ভারতের কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই চা চাষ সীমাবধ্ব, তবে গুরুত্ব হিসাবে তিনটি প্রধান অঞ্চল হল যথাক্রমে ঃ (১) উত্তর-পূর্ব ভারত (২) দক্ষিণ ভারত (৩) উত্তর-পশ্চিমে ভারত।

● (1) **উত্তর-পূর্ব ভারত ঃ** এটি প্রধানতঃ আসাম ও পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে গঠিত একটি ত্রিভুজাকার অঞ্চল। এর বিস্তৃতি 23^0 উঃ থেকে 28^0 উঃ অক্ষাংশ ও 88^0 পূর্ব থেকে 96^0 পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত। এটি ভারতের প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চল, এবং দেশের 76 শতাংশ উৎপাদন ও 80 শতাংশ চা ক্ষেত্র এখানেই অবস্থিত।

আসাম ঃ জমির পরিমান ও উৎপাদন দুই ক্ষেত্রেই প্রায় 55 শতাংশের অধিকারী আসাব ভারতে চা চাষে প্রথম স্থানাধিকারী। এখানকার গড় উৎপাদন 17.9 কুইন্টাল প্রতি হেক্টরে (2002–03)। এখানকার চা উৎপাদক দুটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল ঃ (a) **ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকা ঃ** সদিয়া থেকে গোয়ালপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলটি আসামের প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চল। ভারতে উৎপাদিত চায়ের 44% এবং দেশের মোট চা চাষের জমির 40%-র দাবীদার এই ক্ষেত্র। এখানকার 676টি চা বাগান প্রধানতঃ ডিব্রুগড়, লখিমপুর, শিবসাগর, দরং, কামরূপ, নওগাঁ এবং গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থিত। গ্রীষ্মকালের 30^0C উষ্ণতা এবং শীতকালে 10^0C-র উপর উষ্ণতা, সারা বছর তুহিন মুক্ত আবহাওয়া, বার্ষিক বৃষ্টিপাত 300–400 সে.মি. ও বছরের প্রায় 9 মাস বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলকে চা চাষের আদর্শ অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত করেছে। এখানকার চা বাগানগুলি প্রধানতঃ 450 মি. উচ্চতার উপর অবস্থিত, ফলে জল গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো সমস্যা এখানে হয় না।

(b) **সুর্মা উপত্যকা ঃ** আসামের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য চা উৎপাদক ক্ষেত্র সুর্মা উপত্যকা। কাছার জেলায় অবস্থিত এই ক্ষেত্রটি দেশের চা উৎপাদনে 5 শতাংশ ও মোট চা চাষের জমির 9 শতাংশের ভাগীদার। এখানকার

চা ক্ষেত্রগুলি ছোটো ছোটো টিবির ওপর অবস্থিত, স্থানীয় ভাষায় যাকে 'টিলা' বলা হয়। সুন্দর জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত নদী উপত্যকায় চা ক্ষেত্র অবস্থিত। এখানে সারা বছর জুড়ে বৃষ্টিপাত হয় ও তার পরিমাণ 300–400 সে.মি। এখানে মূলতঃ কড়া স্বাদের সি.টি.সি. চা উৎপাদিত হয়।

পশ্চিম বাংলা ঃ ভারত এর দ্বিতীয় চা উৎপাদক অঞ্চল পশ্চিম বাংলা। ভারতের উৎপাদিত মোট চায়ের 2/5 অংশ দিয়ে থাকে পঃ বাংলা। এখানে দেশের মোট চা চাষের জমির 1/4 অংশ রয়েছে। 2002–03 সালে পঃ বাংলায় চায়ের উৎপাদন ছিল 180 হাজার টন ও যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 33,000 লক্ষ টাকা। পশ্চিম বাংলার

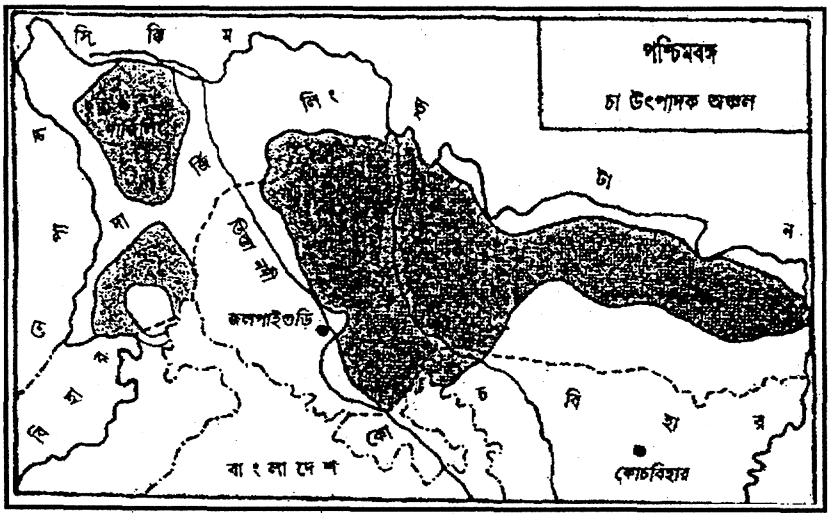

চিত্র 3.54 ঃ পশ্চিমবঙ্গের চা উৎপাদক অঞ্চল

বেশীর ভাগ চা উত্তরের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে উৎপন্ন হয়। এই জেলাগুলি মোটামুটি ভাবে আসামের চা উৎপাদক জেলাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত। পঃ বাংলার চা উৎপাদক অঞ্চলকে মোটামুটি দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

ডুয়ার্স ঃ হিমালয়ের পাদদেশে 16 কি.মি., চওড়া অঞ্চল যা কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত। এখানে চা সামান্য উঁচু ঢালু জমিতে চাষ করা হয়, যা জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত। এখানে চা বাগিচাগুলি 900–1200 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত।

দার্জিলিঙ ঃ এই জেলা চা চাষের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবী বিখ্যাত, বিশেষতঃ এর স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়তার জন্য। এখানকার 300 সে.মি. বৃষ্টিপাত, মাঝারি উষ্ণতা ও উর্বর মৃত্তিকা চায়ের এই বিশেষ সুগন্ধ দিয়ে থাকে। কিন্তু এখানকার প্রতি হেক্টরের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম। এখানকার চা বাগিচা 900–1800 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত দেখা যায়, কারণ তার বেশী উচ্চতার অতি ঠাণ্ডা আবহাওয়া চা চাষের পক্ষে অনুকূল নয়।

ভারতের কিছু চা বাগান অরুনাচল প্রদেশ, ও মনিপুর অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও দেখা যায়।

● (2) **দক্ষিণ ভারত ঃ** দক্ষিণ ভারতে প্রধানতঃ নীলগিরি, কার্ডামম, পালনি এবং আনাইমালাই পাহাড়ে চা চাষ হয়। এই অঞ্চলের বিস্তৃতি 9^0 উত্তর থেকে 14^0 উত্তর পর্যন্ত। এই অঞ্চল থেকে দেশের চা উৎপাদনের 22 শতাংশ উৎপাদিত হয়। এখানকার চা চাষের জমির পরিমান দেশের মোট পরিমানের 19 শতাংশ। এখানকার চা বাগানগুলি প্রধানতঃ পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলের 300–1800 মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় অবস্থিত। এখানে চা বাগিচার সংখ্যা বেশী হলেও আয়তনে তারা যথেষ্ট ছোটো। এখানে উষ্ণতা বেশী, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

400 সে.মি. ও তুহিনযুক্ত আবহাওয়াও রয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় যে এই রকম আবহাওয়া চা চাষের মোটামুটি উপযুক্ত। এখানে প্রতি হেক্টরে মাত্র 15–25 কুইন্টাল চা উৎপাদিত হয়ে থাকে। এখানকার চা নিকৃষ্ট মানের হলেও কোথাও কোথাও কিছু উৎকৃষ্ট চা উৎপন্ন হয়ে থাকে।

দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুই প্রধান চা উৎপাদন রাজ্য এবং এখানে দেশের 11 শতাংশ জমি থেকে 14 শতাংশ চা উৎপাদন হয়ে থাকে। ভারতে যেখানে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন 18 কুইন্টাল সেখানে তামিলনাড়ুতে প্রতি হেক্টরের উৎপাদন 25 কুইন্টাল। তামিলনাড়ুর চায়ের 46 শতাংশ নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চল থেকে ও 33 শতাংশ আনাইমালাই পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপাদন হয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতের আর একটি উল্লেখযোগ্য চা উৎপাদনকারী রাজ্য কেরালা। দেশের মোট উৎপাদনের 7.81 শতাংশ এখান থেকে উৎপাদিত হয়। কোট্টায়াম, কোলাম, তিরুবন্তপুরম প্রধান চা উৎপাদক জেলা।

এছাড়া কর্ণাটকের হাসান ও চিকমাগালুরে কিছু চা উৎপাদিত হয়।

● (3) **উত্তর-পশ্চিম ভারত ঃ** উত্তর পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন, আলমোরা ও গাড়োয়াল জেলা ও হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকা ও মাণ্ডি জেলায় কিছু চা উৎপাদন হয়। এখানে সবুজ চাএ উৎপাদন হয়। এখানকার পাহাড়ী ক্ষেত্রে নতুন নতুন চা বাগান তৈরী হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, হাজারিবাগ ও পূর্ণিয়া জেলাতেও চা উৎপাদন হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, ও বৃটিশ যুক্তরাজ্যে মাথাপিছু চায়ের ভোগের পরিমাণ 3.2 কেজি, 3.9 কেজি, 4.2 কেজি ও 4.8 কেজি, সেখানে ভারতে তা মাত্র 643 গ্রাম। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে যদি এই ভোগের পরিমাণ বাড়ানো যায় তবে রপ্তানি করার জন্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ কিন্তু কমে যাবে। সুতরাং ভোগ ও রপ্তানি বাড়াতে গেলে যা বিশেষ প্রয়োজনীয় তা হোলা নতুন গাছ লাগানোর ও নতুন পদ্ধতিতে চাষ করা। জমির পরিমাণ বাড়ানোতে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে ভারতের 52 শতাংশ জমি পুরোনো চা গাছ আচ্ছাদিত, কারও বয়স 40 বছর, কারো 100। ফলে ফসনও যথেষ্ট কম। সে কারণে এই মুহূর্তে নতুন চারা রোপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। নতুন প্রজাতির চারা গাছ TV-29 উৎপাদন দিয়ে থাকে সাধারন বীজ থেকে 4গুন বেশি। ফলে পুরোনো গাছগুলির জায়গায় এই নতুন প্রজাতি রোপন করা বেশি উৎপাদন পাওয়ার জন্য খুবই জরুরী। দেশের বাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং বিদেশে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানীর লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছাবার জন্য নতুন চারা রোপন, জলসেচের ব্যবস্থা, জলনিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতিরও চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

চা রপ্তানির ক্ষেত্রেও ভারতকে অন্যান্য চা রপ্তানিকারক দেশগুলি যেমন শ্রীলঙ্কা, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, এবং কিছু আফ্রিকার দেশের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। 1950–04 সালে তা কমে দাঁড়ায় 15 শতাংশ। কোনো কোনো সময়ে শ্রীলঙ্কার রপ্তানি ভারতকে ছাড়িয়েও গেছে। ভারত 40টি দেশে চা রপ্তানি করলেও ভারতের মূল বাজার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান, সুদান, ইরান, ইরাক, মিশর এবং সর্বোপরি গ্রেটবৃটেন। সাম্প্রতিককালের ভারতীয় চায়ের প্রধান ক্রেতা হল ইরাক। প্রধানতঃ কোলকাতা বন্দর মাধ্যমে চা রপ্তানি হলেও চেন্নাই, ম্যাঙ্গালোর, ও কোচিন বন্দর মারফৎ ও কিছু চা রপ্তানি হয়।

সারণি

ভারত থেকে চা রপ্তানী

বর্ষ	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2003–04
পরিমাণ '000 টন	199.2	199.1	299.2	199.1	202.4	178

❑ কফি

ভারতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পানীয় ও অন্যতম বাগিচাশস্য কফি। এটি মৃদু উত্তেজক পানীয়। একপ্রকার গাছের ফল শুকিয়ে, মৃদু আঁচে ভেজে ও গুঁড়ো করে কফি প্রস্তুত করা হয়। আফ্রিকার ইথিওপিয়ার উচ্চভূমির কাফা জেলায় প্রথম কফি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে আরব থেকে প্রথম কফির চারা এনে বাবাবুদান পাহাড়ে লাগানো হয়। বৃটিশেরা কফি চাষে খুব উৎসাহিত হওয়ায় ভারতের প্রথম কফি বাগান প্রধানতঃ চিক্‌মাগালুরে (কর্ণাটক) এ 1826 সালে পত্তন হয়। ভারতে বর্তমানে 52000 এর বেশী কফি বাগান আছে যেখানে প্রায় 3 লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

সারণি

কফির উৎপাদন ও এলাকা ২০০২—০৩

রাজ্য	উৎপাদন ০০০ টন	এলাকা	
		০০০ হেক্টর	%
কর্ণাটক	191	204	60.18
কেরালা	64	85	25.07
তামিলনাড়ু	16	31	9.14
অন্ধ্রপ্রদেশ	4	19	5.61

কফি চাষের অনুকূল অবস্থা ঃ কফি গ্রীষ্ম প্রধান দেশের ফসল।

● কফি চাষে প্রচুর উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। সাধারণতঃ 15^0C থেকে 28^0C উষ্ণতা ও 150 সেমি থেকে 250 সেমি বৃষ্টিপাত কফি চাষে আদর্শ। কুয়াশা, তুষারপাত ও 30^0C এর উপর উষ্ণতা কফি গাছ সহ্য করতে পারে না।

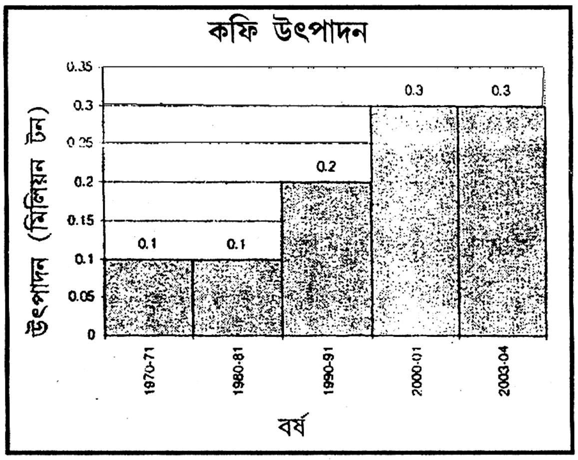

● কফি গাছ অত্যধিক উষ্ণতা সহ্য করতে না পারায় এদের মাঝে মাঝে ছায়া প্রদানকারী গাছ লাগানো হয়। একটানা খরাও কফি চাষে ক্ষতিকর। তবে ফল পাকবার সময় শুষ্ক আবহাওয়া দরকার।

● গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ালে কফি গাছের ক্ষতি হয়। সে কারনে পাহাড়ের ঢালু জমি ও 600 থেকে 1600 মিঃ উচ্চতায় কফি চাষ করা হয়ে থাকে।

● উর্ব্বর লাভা মৃত্তিকা বা উর্ব্বর লাল দোঁয়াশ মৃত্তিকাতে কফি চাষ ভালো হয়।

● ভূমি জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত ও ঢালু হওয়া প্রয়োজন।

● তবে কফি চাষের মৃত্তিকা জৈব পদার্থ যুক্ত, লৌহ ও ক্যালসিয়াম মিশ্রিত হলেও উৎপাদন বাড়ে। মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বজায় রাখার জন্য জমিতে মাঝে মাঝে সার প্রয়োগ করতে হয়।

● কফি গাছ লাগানো, গাছ থেকে ফল সংগ্রহ, তাকে ভাজা, গুঁড়ো করা, প্যাক করা প্রভৃতি কাজে বহু দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

উৎপাদন ও বন্টন ঃ কফির উৎপাদন ও কফি বাগিচায় নিয়োজিত জমির পরিমান দুই ক্ষেত্রেই ভারত পৃথিবীর মোট উৎপাদন ও পরিমানের 2.5 শতাংশের অধিকারী। সুতরাং এককথায় বলা যায় কফি উৎপাদনে ভারত উল্লেখযোগ্য হলেও ব্রাজিল, কলম্বিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়ার উৎপাদনের ধারে কাছে ভারত পৌঁছতে পারেনি। তবে উৎপাদনের দিক দিয়ে প্রথম অবস্থায় উন্নতি হলেও পরবর্তীতে তা কমে গেছে। পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় 1991–92 সাল পর্যন্ত ভারতে কফির উৎপাদন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তারপর থেকেই তা কমতে শুরু করে। ভারতে রোরার্স্ট। ও আরবীয় এই দুই ধরনের কফি জন্মায়।

ভারতের জলবায়ুগত পরিবেশ কফি চাষকে প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতের সামান্য অঞ্চলে (চিত্র 3.45) প্রধানতঃ নীলগিরি পর্বতের আশেপাশের অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করেছে। ভারতের কফি উৎপাদন প্রধানতঃ কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ুতেই হয়ে থাকে।

কর্ণাটক দেশের মোট কফি উৎপাদনের 70% হার অধিকারী। কর্ণাটকের 50% জমি কফি চাষে নিয়োজিত এখানে প্রতি হেক্টরে 10.3 কুইন্টাল কফি উৎপাদিত হয়। 1990–91 সালে এখানে 51,360 লক্ষ টাকার কফি উৎপাদন হয়েছিল। কফি বাগিচাগুলি প্রধানতঃ 1370 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত যেখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমান 125–150 সেমি। চিকমাগালুর ও কোদাগু প্রধান কফি উৎপাদক অঞ্চল। অন্যান্য কফি উৎপাদক জেলাগুলি হল শিমোগা, হাসান, এবং মহীশূর।

কেরালা ভারতে কফি উৎপাদনে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অঞ্চল হলেও এখান থেকে দেশের মাত্র 23 শতাংশ কফি উৎপাদন হয়। এখানকার হেক্টর প্রতি উৎপাদনও যথেষ্ট কম, মাত্র 7.9 কুইন্টাল। এখানকার বেশির ভাগ কফি বাগানগুলি 1200 মিটার উচ্চতায় ও 200 সেমি. বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত। কেরালার কোজিকোড, মাল্লাপুরম, কুইলণ, পালঘাট প্রভৃতি জেলাতে কফি চাষ হয়ে থাকে।

6 শতাংশ উৎপাদন এর দাবীদার তামিলনাড়ু কফি উৎপাদনে তৃতীয় স্থানাধিকারী (2002–03) এখানকার প্রায় অর্ধেক কফি নীলগিরি জেলাতে উৎপাদন হয়ে থাকে। এখানকার মাদুরাই, সালেম, কোয়েম্বাটোর জেলাতে কিছু কফি উৎপাদন হয়।

মহারাষ্ট্রের সাতারা ও রত্নগিরি জেলায় আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনা দেশে গৃহিত হওয়ায় কিছু কিছু অঞ্চল যেখানে আগে কখনও কফি চাষ হয়নি সেখানও কফি চাষ হচ্ছে যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্য সমূহ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

সারণি

ভারত থেকে কফি রপ্তানী

বর্ষ	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–01	2003–04
পরিমান (000 টন)	19.7	32.2	87.3	86.5	184.9	188
মূল্য কোটি টাকায়	7	25	214	252	1185	1066

Source : The Economic survey, 2004–05

বাণিজ্য ঃ ভারতীয় কফি তার উৎকর্ষতার জন্য খুবই সমাদৃত ও বিদেশে তার চাহিদাও যথেষ্ট বেশী। ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কফি রপ্তানি করে থাকে যেমন গ্রেট বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ইরাক, ও মধ্য ইউরোপের দেশ। চেন্নাই, ম্যাঙ্গালোর ও কালিকট প্রধান রপ্তানি বন্দর। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে ভারতে কফির রপ্তানি ও তা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমান যথেষ্ট বেড়েছে। 1995 সালে ভারত কফি থেকে 1,503 কোটি টাকা আয় করে। কিন্তু 2003–04 সালে তা কমে 1,066 কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়।

❑ ডাল বা কলাই ❑

ডাল বা কলাই বলতে এক প্রকার শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদ বা দানাকে বোঝায়, যা প্রধানত নিরামিষাশী লোকেদের খাদ্যে প্রোটিনের যোগান দিয়ে থাকে। এছাড়া এ থেকে পশুর খাদ্যের যোগানও হয়ে থাকে। ডাল জাতীয় শস্য মাটির নাইট্রোজেন ধারণ করার ক্ষমতা ঠিকঠাক বজায় রাখে এবং মাটির উর্বরতাও বজায় রাখে। যদিও ডাল বলতে প্রধানত ছোলাও অড়োহরকে বোঝান হয় কিন্তু মুগ মুসুর কলাই, খেসারী, মটর এ সমস্ত ডালও বিভিন্ন রাজ্যে উৎপন্ন হয়।

ছোলা ঃ ভারতবর্ষে সমস্ত ডালের মধ্যে ছোলা প্রধান এবং মোট ডালের উৎপাদনের 37% হল ছোলা। ছোলা বিভিন্ন জলবায়ুতে জন্মালেও প্রাধানতঃ মৃদু ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক আবহাওয়াতে প্রধানত জন্মায়। ছোলা জন্মাবার জন্য 200–250 সে. উষ্ণতা এবং 40–50 সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এটি রবিশস্য এবং প্রধানত দোঁয়াশ মাটিতেই সেপ্টেম্বর এবং নভেম্বর মাছের মাঝামাঝিতে লাগানো হয়। এবং ফেব্রুয়ারী থেকে অপ্রিল মাসের মধ্যে কাটা হয়। এই ছোলা সাধারণতঃ গম, বার্লি শস্যের সঙ্গে একসাথে চাষ করা হয়। আবার আলাদা ভাবেও চাষ করা হয়।

উৎপাদন ও বণ্টন ঃ অন্যান্য দ্বিতীয় সারির ফসলের মতো ছোলা চাষও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। 1960–61 সালে 62.50 লক্ষ টন ছোলা উৎপাদিত হয়েছিল, কিন্তু 1993–94 সালে তা কমে দাঁড়ায় 49.81 লক্ষ টনে। এর সাথে সাথে ছোলা চাষের জমির পরিমাণও কমে গেছে 1960–61 সালের 92.76 লক্ষ হেক্টর জমি 1993–94 সালে কমে দাঁড়ায় 63.9 লক্ষ হেক্টরে। এস্বত্বেও দেখা যায় হেক্টর প্রতি ছোলার উৎপাদন বেড়েছে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোলার চাষ হয়। মধ্য প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট একত্রে দেশের 90 শতাংশ ছোলা উৎপন্ন করে। 1990–91 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশে ছোলার উৎপাদন সবচেয়ে বেশি।

তুর বা অড়োহর ঃ ভারতবর্ষে ছোলার পরেই অড়োহরের স্থান। এটি প্রধানত খারিৎ শস্য। কিন্তু স্বল্প ঠাণ্ডা অঞ্চলে এটি রবিশস্য হিসাবে চাষ হয়। অন্যান্য খারিফ শস্য যেমন জোয়ার, বাজরা, রাগি, ভুট্টা, তুলা, বাদাম এদের সাথে অড়োহরের চাষ হয়ে থাকে। অন্যান্য ডাল চাষে যে রকম জলবায়ুর (40 সে.মি. বৃষ্টিপাত ও সামান্য উষ্মতা) প্রয়োজন অড়োহর চাষের ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরকম পরিবেশের প্রয়োজন হয়ে থাকে। গত তিন দশক ধরে অড়োহরের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক প্রধান অড়োহর উৎপাদক অঞ্চল।

❑ বাণিজ্যিক শস্য ❑

মুদ্রা উপার্জনকারী ফসল বলতে সেই ফসলকেই বোঝান হয় যা প্রধানতঃ কাঁচা অবস্থায় বা সামান্য পরিবর্তিত অবস্থায় বিক্রি করা হয়। সুতরাং এই ফসলের বৈশিস্ট্য হল কৃষকের জনয মুদ্রা উপার্জন। প্রধান মুদ্রা উপার্জনকারী শস্য হল তুলা, পাট, ইক্ষু, তামাক এবং তৈলবীজ। এই শস্যগুলি কোন দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু দেখা যায় দেশের চাষযোগ্য জমির মাত্র 15 শতাংশ বাণিজ্যিক ফসলের চাষ হয়। কিন্তু এদের উৎপাদন মোট শস্য উৎপাদনের 40 শতাংশ। আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই ফসলগুলি শিল্পেও কাঁচামালের যোগান দেয়।

❑ তুলা

তুলা কেবলমাত্র ভারতের নয়, সারা পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য তন্তু ফসল। কার্পাস বয়ন শিল্পের কাঁচা মাল তুলাই সরবরাহ করে থাকে। এর বীজ বনস্পতির শিল্পে ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধপ্রদায়ী পশুর খাদ্য রূপে এই বীজ ব্যবহৃত হয়, কারণ এতে দুগ্ধের গুনমান উন্নত হয়।

কার্পাস বা তুলা উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ঃ ● ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল তুলা চাষে 21^0 সেঃ থেকে 30^0 সেঃ উষ্ণতার প্রয়োজন। উষ্ণতা 20^0 সেঃ এর কম হলে তুলা চাষ বিঘ্নিত হয়।

● তুহিন তুলা চাষের প্রধান শত্রু। সে কারণে তুলা চাষে 21টি তুহিন মুক্ত দিনের প্রয়োজন।

● তুলা চাষে 50 থেকে 100 সেন্টিমিটার বৃষ্টির প্রয়োজন।

● এর চাইতে কম বৃষ্টি হলে জল সেচের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষে তুলা চাষের দুই তৃতীয়াংশ জমিতে জলসেচ করা হয়।

● আর্দ্র আবহাওয়া, অত্যধিক বৃষ্টিপাত তুলা সংগ্রহের সময় ক্ষতিকর। সে কারণে তুলা চাষের প্রথম অবস্থায় বেশি বৃষ্টিপাত ও ফসল পাকবার সময় সূর্যকিরণোজ্জ্বল আবহাওয়া প্রয়োজন।

● তুলা খারিৎ শস্য এবং এই ফসল পরিপক্ক হতে 6 থেকে 8 মাস সময় লাগে। ভারতের বিভিন্ন অংশে জলবায়ুর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময় এই ফসলের চাষ হয়। পাঞ্জাবে এবং হরিয়ানায় এপ্রিল-মে মাসে তুলা লাগানো হয় এবং ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে ফসল তোলা হয়। উপদ্বীপীয় ভারতে অক্টোবর মাসে ফসল লাগানো হয় এবং জানুয়ারি ও মে মাসের মাঝামাঝি ফসল তোলা হয়, কারণ দক্ষিণ ভারতে তুহিনের সমস্যা কম। তামিলনাড়ুতে তুলা ফারিফ ও রবিশস্য হিসাবে চাষ হয়। অন্যান্য খারিফ শষ্য যেমন ভুট্টা, জোয়ার, রাগি, সিসাম ও চীনাবাদামের সঙ্গে তুলার চাষ হয়ে থাকে।

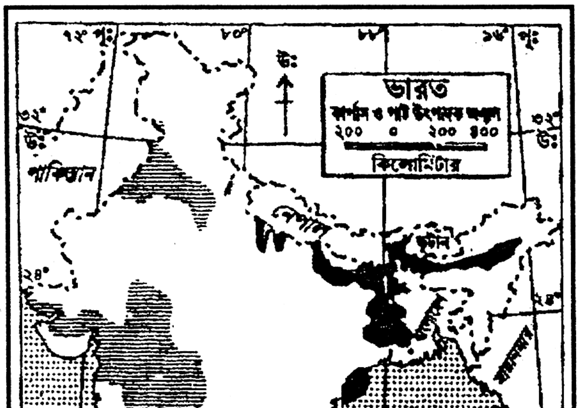

চিত্র 3.55 ঃ ভারতের কার্পাস ও পাট উৎপাদক অঞ্চল

দাক্ষিণাত্যের মালব মালভূমি এবং গুজরাটের কৃষ্ণ মৃত্তিকায় তুলা চাষ ভালো হয়ে থাকে। শতদ্রু-গঙ্গা অববাহিকার উর্ব্বর পলিমাটিতে ও দাক্ষিণাত্যের লাল ও ল্যাটেরাইট মাটিতেও তুলার চাষ হয়ে থাকে। তুলা মাটির উর্বরতা খুব সহজেই নষ্ট করে সে কারণে তুলা চাষের জমিতে নিয়মিত সার দেওয়া দরকার হয়।

তুলা সংগ্রহ একটি জটিল ব্যাপার। সে কারণে যথেষ্ট সংখ্যক কম শ্রমিকের দরকার, যতদিন না তুলা সংগ্রহে যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। মোটামুটি তুলা সংগ্রহ ও বীজ থেকে তন্তু সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট শ্রমিকের দরকার।

তুলার শ্রেণিবিভাগ ঃ তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য শক্তি ও গঠনের উপর ভিত্তি করে ভারতে তিন প্রকার তুলা উৎপন্ন হয়।

1. **দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস ঃ** এতে তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য সর্ববৃহৎ অর্থাৎ 24 থেকে 27 মি.মি.। এই আঁশ লম্বা,

সূক্ষ্ম ও চক্‌চকে হয়। উৎকৃষ্ট পোশাক তৈরীতে এটি ব্যবহৃত হয়। ও এর মূল্য সর্বাধিক। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই তুলা চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে উৎপন্ন কার্পাসের অর্ধেক এই জাতীয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশে এই তুলার চাষ ভালো হয়।

2. **মাঝারি আঁশযুক্ত কার্পাস ঃ** এই কার্পাসের আঁশের দৈর্ঘ্য 20 মি.মি. থেকে 24 মি.মি.। ভারতে উৎপন্ন তুলার 44 শতাংশ এই জাতীয়। পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু মধ্যপ্রদেশ, উঃপ্রদেশ, কর্ণাটক, ও মহারাষ্ট্র এই ধরণের তুলা প্রধানতঃ চাষ হয়ে থাকে।

3. **ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাস ঃ** এই নিম্নমানের তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য 20 মি.মি. এর কম। সাধারণতঃ নিম্নমানের কাপড় তৈরীতে এই তুলা ব্যবহৃত হয় ও এ থেকে অল্প পরিমাণ আয় হয়। মোটামুটি উৎপাদিত তুলার (ভারতে) 6 শতাংশ এই জাতীয়। উঃ প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব এই জাতীয় তুলা উপাদনের প্রধান ক্ষেত্র।

উৎপাদন ঃ চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের পর উৎপাদনে তৃতীয় স্থানাধিকারী ভারতে কার্পাস চাষের জমির পরিমাণ সর্বাধিক। 1950–51 ও 1960–61 সালের মাঝামাঝি সময় ছাড়া ভারতে কার্পাস চাষের জমির পরিমাণ বাড়েনি। কিন্তু 1980–81 সালের পর থেকে কার্পাস চাষের জমির পরিমাণ কমেছে কেবলমাত্র 1995–96 সাল বাদ দিয়ে। জমির পরিমাণ না বাড়লেও ভারতে ফসল উৎপাদন বেড়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছ বাণিজ্যিক ভাবে চাষ ও উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারের ফলে। উৎপাদন তিনগুন বাড়লেও পৃথিবীর প্রতি হেক্টর 245 কে.জি. উৎপাদনের তুলনায় ভারতের উৎপাদন প্রায় অর্ধেক।আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি হেক্টর (731 কে.জি) উৎপাদনের তুলনায় আমাদের দেশের উৎপাদন অনেক নীচে। পাকিস্থানের প্রতত হেক্টরে 756 কেজি মিশরের (816) এবং মিশরের উৎপাদনের তুলনায় ভারতের উৎপাদন নগণ্য।

ভারতের তুলা উৎপাদক অঞ্চল ঃ ভারতের তুলা উৎপাদক ক্ষেত্রকে দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় (চিত্র 3.48)। যেমন দক্ষিণাঞ্চল যার অন্তর্ভুক্ত মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ এবং **উত্তরাঞ্চল** এর অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি হোলো পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান। নীচের সারণীতে উৎপাদন 2002–03 শতকরা হিসাবে দেখানো হোল।

মহারাষ্ট্র	গুজরাত	অন্ধ্রপ্রদেশ	পাঞ্জাব	হরিয়ানা	মধ্যপ্রদেশ	কর্ণাটক	রাজস্থান	তামিলনাড়ু	অন্যান্য
29.8	19.3	12.5	12.4	11.9	4.3	4.2	2.9	1.8	0.9

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতে 2/3 ভাগ তুলা উৎপাদন মোট উৎপাদন 87.17 লক্ষ বেল প্রধানতঃ মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে আসে। তাছাড়া দেশের দুই-তৃতীয়াংশ তুলা চাষের জমির অংশীদার এই রাজ্যগুলি।

পাঞ্জাব ঃ দেশের প্রধান কার্পাস উৎপাদক রাজ্য। এখানে প্রতি হেক্টর 16 কুইন্টাল তুলা উৎপাদন হয় (2002–03) যা দেশের গড় উৎপাদনের দুই গুন। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানত উর্বর পলি মৃত্তিকা, জলসেচ এর উন্নত ব্যবস্থাপনা, অধিক পরিমান সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এবং সর্বোপরি কৃষকের দৃঢ় মানসিকতার জোরে। ভাতিণ্ডা, ফরিদকোট, ফিরোজপুর ও সাংগ্রর প্রধান তুলা উৎপাদক জেলা এবং এখান থেকে পাঞ্জাবের তিন-চতুর্থাংশ উৎপাদন হয়ে থাকে।

মহারাষ্ট্র ঃ ভারতের মোট উৎপাদনের 29.78 শতাংশ মহারাষ্ট্র উৎপাদন করে থাকে। মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে প্রথম স্থান অধিকার করবার ব্যাপারে এবং বিভিন্ন বছরে তারা এই স্থান ভাগাভাগিও করে নেয়। তবে পাঞ্জাবের প্রতি হেক্টরের উৎপাদনের চাইতে মহারাষ্ট্র এর প্রতি হেক্টরের উৎপাদন

অনেক কম (1.6 কুইন্টাল)। তবে মহারাষ্ট্রের তুলার চাষ অনেক প্রাচীন। সে তুলনায় পাঞ্জাবে অনেক পরে তুলার চাষ শুরু হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের লাভা মৃত্তিকা যা কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা নামে পরিচিত তা তুলা চাষের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। ভারতের 87টি প্রধান তুলা উৎ২াদক জেলার মধ্যে মহারাষ্ট্রেই রয়েছে 17-টি।

গুজরাট ঃ গুজরাট ভারতের তুলা উৎপাদক অঞ্চলের 19.33% এবং ভারতের তুলা উৎপাদনের 21.33 অধিকার করে। এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তুলা উৎপাদক অঞ্চল (2003–03)। এখানে গড়ে প্রতি হেক্টরে 24 কুইন্টাল উৎপাদন হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রের মত গুজরাটে তুলা উৎপাদন ও কমেছে। 1977-78 সালে দেশের মোট উৎপাদনের 23.44 শতাংশ উৎপাদন করলেও 1990–91 সালে তা কমে হয় 13.44 শতাংশ। 1991–91 সালে গুজরাট 66,977 লক্ষ টাকার তুলা উৎপাদন করে। এর পেছনে যে কারণগুলি সহায়ক ছিল তা হোলো 1.5 মিটার পুরু কৃষ্ণ মৃত্তিকা স্তর, 80–100 সে.মি. বৃষ্টিপাত এখানকার 18-টি জেলা তুলা উৎপাদনে বিখ্যাত।

হরিয়ানা ঃ ভারতের তুলা উৎপাদনের 11.91 শতাংশ উৎপাদন করে হরিয়ানা ভারতের তুলা উৎপাদনে পঞ্চম স্থান অধিাকর করে। 1991–91 সালে হরিয়ানা 52,615 লক্ষ টাকার তুলা উৎপাদন করেছিল। এখানে প্রতি হেক্টরে 4 কুইন্ট্যাল উৎপাদন হয়। এখানকার 40 শতাংশ উৎপাদনের হিসার ও সিরসা জেলা থেকে আসে। পাঞ্জাবের মত এখানেও দীর্ঘ আঁশযুক্ত আমেরিকান প্রজাতীয় তুলা উৎপাদন হয়। এছাড়া আম্বলা ও জিন্দ অন্যান্য কার্পাস উৎপাদক জেলা।

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ দেশের মোট কার্পাস চাষের জমির 10.47% ও মোট উৎপাদনের 12.46% অধিকার করে চতুর্থ স্থানাধিকারী অন্ধ্রপ্রদেশ। এখানকার দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন দুটি জেলা যেমন গুন্টুর ও কাকুলাম থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া আদিলাবাদ, কুর্পুল ও অনন্তপুর থেকে বাকী উৎপাদন হয়ে থাকে।

রাজস্থান ঃ দেশের মোট উৎপাদনের 2.89 শতাংশ অধিকার করে রাজস্থান যার কার্পাস চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মোট জমির 5%। এখানে প্রতি হেক্টরে 3.4 কুইন্টাল উৎপাদন হয় যা কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও হরিয়ানার চাইতে কম কিন্তু দক্ষিণ ভারতের যেকোন রাজ্যের চাইতে বেশী। গঙ্গানগর এই রাজ্যের প্রধান কার্পাস উৎপাদন অঞ্চল এবং রাজ্যের 80% কার্পাস এখান থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই জেলা পাঞ্জাব ও হরিয়ানার তুলা উৎপাদক অঞ্চল সংলগ্ন। ফলে তুলা উৎপাদনের সহায়ক কারণগুলি ঐ রাজ্যের মতই এখানে বিদ্যমান। রাজস্থান এর অন্যান্য কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলগুলি হোলো ভিলওয়ারা, আজমীর, চিতোরগড়, পালি, হনুমানগড় ইত্যাদি।

কর্ণাটক ঃ ভারতের মোট কার্পাস উৎপাদনের 4 শতাংশ উৎপাদন কর্ণাটক থেকে আসে এবং এখানকার 9টি জেলা তুলা উৎপাদনে প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রতি হেক্টরে 19 কুইন্টাল উৎপাদন ভারতের যে কোনো রাজ্যের চাইতে কম। উত্তর কর্ণাটক মালভূমি এখানকার প্রধান তুলা উৎপাদক অঞ্চল। ধারওয়ার, রায়চুর, বেলারী, এবং গুলবার্গ প্রধান কার্পাস উৎপাদক জেলা।

তামিলনাড়ু ঃ দেশের কার্পাস চাষের জমি এক শতাংশ অধিকারী তামিলনাড়ু দেশের মোট উৎপাদনের দুই শতাংশের অংশীদার। এখানকার 7-টি জেলা কার্পাস উৎপাদনে খ্যাত। কোয়েম্বাটুর, সালেম, মাদুরাই, তিরুচিরাপল্লী, রামনাথপুরম, দক্ষিণ আর্কট, চেনগালপাট্টু ইত্যাদি প্রধান কার্পাস উৎপাদক জেলা।

মধ্যপ্রদেশ ঃ এখানকার 10-টি জেলা কার্পাস উৎপাদনে খ্যাত। এই রাজ্যেও প্রতি হেক্টরে উৎপাদন বেশ কম। লাভা সমৃদ্ধ মালব অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী কার্পাসের চাষ হয়।

ভারতের অন্যান্য রাজ্য যেমন উঃপ্রদেশ, কেরালা, উড়িষ্যা, মেঘালয় ও মিজোরাম কিছু পরিমাণ তুলা উৎপাদন করে।

বাণিজ্য ঃ ভারত একাধারে তুলা আমদানি ও রপ্তানী দুই-ই করে থাকে। ভারত থেকে নিম্নমানের তুলা গ্রেটব্রিটেনে রপ্তানী হয় এবং সেখানে উৎকৃষ্ট তুলার সাথে তা মেশানো হয়। ভারত উৎকৃষ্ট মানের দীর্ঘ আঁশযুক্ত

তুলা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, সুদান ও কেনিয়া থেকে আমদানী করে। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন বাড়ায় আমদানীর পরিমাণ কমছে ও সাথে সাথে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

❑ পাট

ভারতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ তন্তু ফসল পাট যার স্থান তুলার পরে। পাটের চাহিদা ভারতবর্ষে খুবই বেশি, কারণ এটি সস্তা, শক্ত, দীর্ঘ আঁশ যুক্ত এবং এর তন্তুগুলি সমআঁশ যুক্ত। পাট বিভিন্ন কাজে যেমন থলে, দড়ি, কার্পেট, ত্রিপল, কাপড় ইত্যাদি তৈরীতে এবং সাজানো গোছানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

পাট চাষের অনুকূল পরিবেশ ঃ উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে পাট চাষ ভালো হয়। পাট চাষের জন্য 24^0–35^0 সেলসিয়াস উষ্ণতা এবং 120–150 সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। পাটচাষের সময়ে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা 80–90 শতাংশ হলে ভালো হয়। সামান্য প্রাক্ মৌসুবী বৃষ্টিপাত (25 সে.মি. – 55 সে.মি.) পাটচাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। কারণ মৌসুমী বায়ু আসবার আগে এই সামান্য বৃষ্টিপাত গাছ জন্মানোর পক্ষে খুবই উপযোগী। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবত খরা পাট চাষে ক্ষতিকর। পাট লাগাবার প্রধম অবস্থায় 2.5 সে.মি. – 5.7 সে.মি. বৃষ্টিপাত গাছের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। তবে নির্দিষ্ট দিন বা সময়ের ব্যবধানে 2–3 সে.মি. বৃষ্টিপাত গাছ বৃদ্ধির পক্ষে খুবই উপযুক্ত। জল কেবল চাষের জন্যই প্রয়োজনীয় তা নয় পাট গাছ পচিয়ে পাটের আঁশ বের করার জন্য তা প্রয়োজনীয়।

উর্বর পলিমাটি কিংবা দোআঁশ মাটি পাট চাষের পক্ষে উপযুক্ত। যেহেতু পাট মাটির উর্বরতা শক্তি দ্রুত নষ্ট করে, সে কারণে নদীর প্লাবন ভূমি পাট চাষের পক্ষে উপযুক্ত। সস্তা ও নিপুন শ্রমিক পাট চাষ ও তা সংক্রান্ত কাজগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পাট চাষের পদ্ধতি ঃ নিম্নভূমিতে সাধারণত ফেব্রুয়ারী মাসে উচ্চভূমিতে মার্চ থেকে মে মাসে পাট লাগানো হয়। পাট পরিপক্ব হতে সাধারণত 8–10 মাস সময় লাগলেও বিভিন্ন প্রজাতির পাট চাষে সময়ের তফাত হয়। সাধারণত পাট কাটা হয় জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। মাটি সমান করে গাছ কাটা হয় ও তাদের আঁটি বন্ধ করা হয়। এই আঁটি 2–3 সপ্তাহ স্থির জলে ভেজানো হয়। জলের উষ্ণতা বেশী হলে এই ভেজানো বা পচানোর কাজটি দ্রুত হয়। পচানো বা ভেজাবার কাজ সম্পূর্ণ হলে গাছের ছাল ছাড়িয়ে আঁশ বের করা হয়। এর পর আঁটি বাঁধা, ধোয়া, পরিষ্কার করা, ও শুকানো এই কাজগুলি করা হয়। পাট চাষের এই সব কাজগুলি হাতে করা হয়। সেকারণে দক্ষ ও সস্তা শ্রমিক খুব প্রয়োজনীয়। তবে আমাদের দেশে পাটচাষের অঞ্চলে যেহেতু ঘনবসতিপূর্ণ, তাই শ্রমিক পেতে অসুবিধা হয় না।

উৎপাদন ঃ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতের পাটের উৎপাদন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ 75 শতাংশ পাট চাষের অঞ্চল বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তবে পাটের কলগুলি বেশি ভাগই এদেশে থেকে যায়। স্বাধীনতার পরবতী সময়ে এই মিলগুলির কাঁচা মাল সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পাটের উৎপাদন বাড়াতে প্রচণ্ড কষ্ট করতে হয়। 1983–84 খ্রিস্টাব্দে ভারতে পাটের উৎপাদন ছিল 11 লক্ষ টন। 1985–86 খ্রিঃ ভারত প্রায় 20 লক্ষ টন পাট উৎপাদন করে সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। তবে ভারতের 98 শতাংশ পাট উৎপাদন প্রধানত চারটি রাজ্য যেমন পশ্চিমবাংলা, বিহার, আসাম এবং উড়িষ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

1. **পশ্চিমবঙ্গ ঃ** পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমির 74 শতাংশ পাট চাষে নিয়োজিত এবং এখানে ভারতের পাট উৎপাদনের 82 শতাংশ উৎপাদন হয় (2002–03)। পশ্চিমবাংলার পাট উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশগুলি হল পলিযুক্ত মৃত্তিকা, উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং সস্তা শ্রমিকের প্রাচুর্য। যদি পশ্চিম বাংলার সব জেলাতেই পাট উৎপাদন হয় তবে উত্তরে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, একেবারে দক্ষিণ দিকে গঙ্গা ব-দ্বীপের নীচু জমি এবং পশ্চিমের

পাথুরে জমিতে পাট চাষ কম হয়। সেকারণে পাটের উৎপাদন প্রধানত নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, 24 পরগনা, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, বর্ধমান, মালদা, এবং মেদিনীপুর জেলাতেই বেশী হয়। এই উৎপাদিত পাটের প্রায় সবটাই হুগলি নদী উপত্যকার পাটকলগুলিতে ব্যবহৃত হয়। 1991–91 সালে পশ্চিমবাংলা 54–96 লক্ষ বেল পাট উৎপাদন করে যার মূল্য 50495 লক্ষ টাকা।

বিহার ঃ দ্বিতীয় প্রধান উৎপাদক রাজ্য বিহার দেশের পাট উৎপাদনের 10 শতাংশ পাট উৎপাদন করে। এবং পাট চাষের মোট জমি 17 শতাংশ পাট উৎপাদন করে এই রাজ্যে প্রথমস্থান অধিকার করে। কাটিহার, সহর্ষ ও দ্বারভাঙ্গা অন্যান্য পাট উৎপাদক জেলা।

আসাম ঃ পাট, উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকারী আসাম। দেশের মোট উৎপাদনের 7 শতাংশ উৎপাদন করে ও পাট উৎপাদনে আসামের স্থান তৃতীয় এখানকা প্রধান উৎপাদন অঞ্চল হল ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদী উপত্যকা এছাড়া গোয়ালপাড়া, কামরুপ, নওগাঁ, দরং, এবং শিবসাগর পাট উৎপাদক জেলা।

অন্যান্য ঃ পাট উৎপাদক অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে উড়িষ্যার পুরী, কটক ও বোলাঙ্গী জেলা উল্লেখযোগ্য। উত্তর প্রদেশে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে পাট চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া মহারাষ্ট্র, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও অন্ধ্রপ্রদেশে কিছু পাট চাষ হয়ে থাকে।

বাণিজ্য ঃ পাট উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে ভারতের পক্ষে রপ্তানী বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সে কারণে ভারতবর্ষ বাংলাদেশ থেকে কিছু পাট আমদানীও করে থাকে। তবে পাটের গুণমান ও দাম বছর বছর পরিবর্তিত হয়ে থাকে। 2003–04 সালে ভারত প্রায় 94 কোটি টাকার পাট আমদানি করেছিল।

❑ ইক্ষু

ইক্ষু বাঁশ জাতীয় বৃক্ষের অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। চিনি গুড় এবং খান্ডসারি তৈরীর মূল উপাদান ইক্ষুর দুই তৃতীয়াংশ গুড় এবং খান্ডসারি তৈরীতে এবং এক অংশ চিনি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সুরাসার তৈরীতেও ইক্ষুর ব্যবহার হয়ে থাকে। বর্তমানে ইক্ষুর ছিবড়া জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার না করে কাগজ তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিছু কিছু তৈল্য জাত পদার্থের পরিবর্ত বস্তু রূপেও এটি ব্যবহৃত হয়। এর কিছুঅংশ পশু খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে ইক্ষু যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং অনেক বাণিজ্যিক ফসলের চাইতে এটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

যে সমস্ত অঞ্চলের পরিবেশ ইক্ষুচাষের উপযোগী সেখানে কৃষকরা ইক্ষুচাষকেই বেশি পছন্দ করে।

ইক্ষুচাষের উপযোগী অবস্থা ঃ ইক্ষু দীর্ঘ সময়ের পরিপক্ক হওয়ার ফসল এবং সাধারণত 10–15 এবং কখনো কখনো তা পরিপক্ক হতে 18 মাস সময় লাগে।

❍ **জলবায়ু ঃ**

উষ্মতা ঃ উষ্ম ও আর্দ্র অঞ্চলের ফসল ইক্ষুচাষের 21^0–27^0 সেলসিয়াস উষ্মতার প্রয়োজন।

বৃষ্টিপাত ঃ ইক্ষুচাষের জন্য 70–100 সে.মি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। বৃষ্টিপাত বেশী হলে শর্করার পরিমাণ কমে যায় আবার বেশী বৃষ্টিপাত হলে আঁশের অংশ বাড়ে কম বৃষ্টি হলে জলসেচের দরকার হয়। ইক্ষু পাকবার সময়ে অল্প দিনের জন্য ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া খুবই আবশ্যক। তুহিন ইক্ষুচাষের পক্ষে ক্ষতিকর।সেকারণে কুয়াশা হওয়ার আগেই এর চাষ করা হয়। আবার উষ্ম, শুষ্ক বায়ু ও ইক্ষুচাষের অনুপযোগী।

মৃত্তিকা ঃ বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকাতেও ইক্ষুচাষ হয়, যেমন— দোঁআশ মাটি, কাদাযুক্ত দোঁআশ মাটি, কৃষ্মকার্পাস মৃত্তিকা, বাদামী বা লাল বর্ণের দোঁআশ মাটি, আবার কখনো কখনো ল্যাটেরাইট। যে কোন ধরনের মাটি যা জল ধারণ করতে পারে তাতে ইক্ষুর চাষ হয়। তবে চুন ও লবণ মিশ্রিত দোঁআশ মৃত্তিকা ইক্ষুচাষের উপযোগী। মৃত্তিকা

নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম এবং ফসফোরাস সমৃদ্ধ হলে এবং তার অম্লতার পরিমাণ কম থাকলে ইক্ষুচাষ ভালো হয়। ইক্ষু মাটির উর্বরাশক্তি খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট করে। সেজন্য ইক্ষু চাষের জন্য তাড়াতাড়ি সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। সমভূমি কিংবা মালভূমি অঞ্চল সামান্য ঢালযুক্ত হলে সেখানে ইক্ষুচাষ ভালো হয়।

শ্রমিক ঃ ইক্ষু চাষের সব কাজগুলি যেহেতু হাতে করতে হয় সেজন্য সুলভ শ্রমিকের দরকার। দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের সরবরাহ ইক্ষুচাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা।

উৎপাদন ঃ পৃথিবীর যে কোন দেশের চাইতে ভারতে ইক্ষুচাষের জমির পরিমাণ বেশি। এবং ইক্ষু উৎপাদনে ভারতের অবস্থান একমাত্র ব্রাজিলের পরেই। 1951–61 সালে ভারতে ইক্ষু উৎপাদন নাটকীয় ভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু 1960–61 ও 1971–71 সালে মাঝামাঝি সময়ে ইক্ষুর উৎপাদন কমে যায়, কারণ অভ্যন্তরীন ইক্ষু বাজার নষ্ট হওয়ায় কৃষকেরা ইক্ষুচাষে বিরত হয়। কিন্তু 1971–81 সালের মাঝামাঝি সময়ে এই চাষ আবার বৃদ্ধি পায় নতুন নতুন ইক্ষু কল চালু হওয়ায়। 90-এর দশকে ভারতবর্ষে ইক্ষু উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া, মিশর এবং মেক্সিকোর উৎপাদন ভারতের তুলনায় প্রতি হেক্টরে 50 শতাংশ বেশী। ভারতের হেক্টর প্রতি উৎপাদন (59 টন) কম হওয়ার কারণ উৎকৃষ্ট সারের অভাব, জলবায়ুর অনিশ্চয়তা, অপ্রতুল জলসেচ ব্যবস্থা, নিম্নমানের ইক্ষু, খণ্ডিকৃত জমি এবং পুরাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ।

1912 সালে তামিলনাড়ুর কোয়েমবাটুরে ইক্ষু উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখান থেকে উৎকৃষ্ট ধরনের ইক্ষুর চাষের বীজ প্রধানত উত্তর ভারতে সরবরাহ হয়। তাছাড়া এখানেই ইক্ষুচাষে ক্ষেত্রে রেটুন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়।

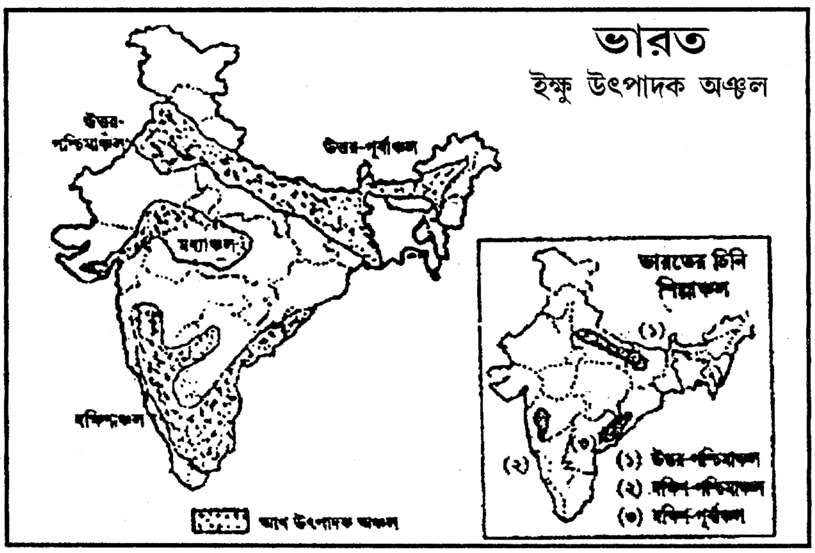

চিত্র 3.56 ঃ ভারতের ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল

এই পদ্ধতিতে ইক্ষুদণ্ডের সামান্য কিছুটা মাটিতে রেখেই কাটা হয় এবং তা থেকে 4 থেকে 8 বার ফসল সংগ্রহ করা যায়। ভারতের বিভিন্ন অংশে এই পদ্ধতিতে ইক্ষুচাষ করা হয়, কারণ এতে খরচ কম পড়ে এবং ইক্ষু পাকতে কম সময় লাগে।

ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল

ইক্ষুচাষের সহায়ক কারণগুলির উপর ভিত্তি করে ভারতের ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চলকে তিনটি বলয়ে ভাগ করা যায়।

1. শতদ্রু-গঙ্গা সমভূমি পাঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত এই অঞ্চল ভারতের ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চলের 51 শতাংশ জমির অধিকারী এবং মোট উৎপাদনের 60 ভাগ এখান থেকে আসে।

2. পশ্চিম ঘাট পর্বতের পূর্বঢালে মহারাষ্ট্র থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল।

3. অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল ভাগ ও কৃষ্ণ নদীর উপত্যকা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উত্তর ভারতের ইক্ষুচাষ দক্ষিণ ভারতের তুলনায় কতকগুলি কারণে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় যেমন গরম কালে 30^0–35^0 সেলসিয়াস উষ্ণতা ও লু' নামে গরম বাতাসের প্রবাহ। আবার শীতকালে অর্থাৎ ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ইক্ষুর স্বাভাবিক বৃধ্বি ব্যাহত হয় অত্যাধিক ঠাণ্ডা ও কুয়াশার ফলে। সেই তুলনায় দক্ষিণ ভারতের প্রতি হেক্টরে উৎপাদন বেশি, কারণ গ্রীষ্মকালে লু' নামক বাতাসের প্রভাব থাকে না, শীতকাল কুয়াশা বিহীন এবং উষ্ণতাও বেশী থাকে। এছাড়া উপকূল ভাগ সমুদ্রবায়ুর প্রভাব পড়ে যা ইক্ষু চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ ভারতে ইক্ষু চাষের উপযুক্ত পরিবেশ বর্তমান থাকলেও ভারতের ইক্ষু উৎপাদনে প্রধান ক্ষেত্রগুলি উত্তর ভারতে অবস্থিত। এই বৈচিত্র্যময় অবস্থার কারণ হিসেবে দুটি বিষয়কে উল্লেখ করা যায়।

(ক) প্রথম বিশ্বযুধ্বের আগে এই অঞ্চলে প্রধানত নীল উৎপাদন হত যা কৃষকদের সবচেয়ে পছন্দের বাণিজ্যিক শস্য চিল কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুধ্বের পরে নীল তার বাজার হারানোর এই জায়গা দখল করে ইক্ষু।

(খ) ইক্ষুকে তুলা, তামাক, চিনাবাদাম, নারকেল ইত্যাদির সঙ্গে জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় দক্ষিণ ভারতে।

উত্তরপ্রদেশ ঃ উত্তরপ্রদেশে ভারতের প্রায় অর্ধেক ইক্ষু ক্ষেত্র রয়েছে (42.5%)। এবও এই রাজ্য দেশের মোট ইক্ষু উৎপাদনের 40 শতাংশ উৎপাদন করে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিমের কিছু শুষ্ক অঞ্চল, উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ী অঞ্চল বাদে এই রাজ্যের সর্বত্রই ইক্ষু উৎপাদিত হয়। বিস্তৃত পাললিক মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল, উপযুক্ত জলবায়ু, জলসেচের ব্যবস্থাপনা ও সারের প্রয়োগেই উত্তরপ্রদেশ আজ ইক্ষু চাষে এই প্রথম স্থান দখল করেছে। এখানকার ইক্ষু চাষ প্রধানতঃ উচ্চ গঙ্গা-যমুনা দোয়াব, রোহিলখণ্ড অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এবং এই অঞ্চল এই রাজ্যের 70% ইক্ষু উৎপাদন করে। উত্তরপ্রদেশের 31-টি জেলা ইক্ষু উৎপাদন করে। এখানকার মুজঃফ্‌রনগর, মিরাট, বীজনোর, মোরদাবাদ, সাহারানপুর, খেরি, দেওরিয়া, বুলন্দশহর, গাজিয়াবাদ, বেরেলি, এবং সীতাপুর প্রধান ইক্ষু উৎপাদক জেলা।

মহারাষ্ট্র ঃ যদিও ইক্ষু উৎপাদনে মহারাষ্ট্র ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, তবুও ইক্ষু উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ ও উৎপাদন দুই ক্ষেত্রেই মহারাষ্ট্র উত্তরপ্রদেশ থেকে অনেক পিছিয়ে। দেশের মোট ইক্ষু উৎপাদনের 13% এবং মোট নিয়োজিত জমির 14%-এর অংশীদার মহারাষ্ট্র। কিন্তু হেক্টর প্রতি উৎপাদন ও গুনমানের দিক থেকে মহারাষ্ট্রের স্থান অনেক উপরে। ভারতের প্রধান 100টি প্রধান উৎপাদক জেলার মধ্যে 30টি মহারাষ্ট্রে রয়েছে। লাভাযুক্ত কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে প্রধানতঃ ইক্ষু উৎপাদন হয়ে থাকে। মহারাষ্ট্রের প্রধান ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চলগুলি হল আহমেদ্‌নগর, কোলাপুর, পুনে নাসিক, শোলাপুর, সাতরা, ওসমনাবাদ, এবং ঔরাঙ্গবাদ।

তামিলনাড়ু ঃ যদিও দেশের উৎপাদন ও চাষযোগ্য জমির যথাক্রমে 11% ও 6% অধিকারী তামিলনাড়ু, কিন্তু এখানকার প্রতি হেক্টরে উৎপাদন 10549 কুইন্টাল। এখানকার 40% উৎপাদন প্রধানতঃ উত্তর আর্কট, আম্বেদকর, দক্ষিণ আর্কট, ভাল্লালরে, পেরিয়ার, সালেম, তিরুচিরাপল্লী ও কোয়েম্বাটুর থেকে এসে থাকে। বাকী উৎপাদন ধরমপুরী, মাদুরাই, খাঞ্জাভুর ও রামানাথপুরম জেলা থেকে এসে থাকে।

কর্ণাটক ঃ ইক্ষু উৎপাদন ভারতে তৃতীয় স্থানাধিকারী কর্ণাটক দেশের মোট উৎপাদনের 11% এবং মোট ইক্ষু উৎপাদন এলাকার 7%-এর অধিকারী। প্রধানতঃ জলসেচের সাহায্যেই এখানে ইক্ষু চাষ হয়ে থাকে। বেলগাঁও, মহীশূর, বীজাপুর, শিমোগা এবং চিত্রদুর্গ প্রধান ইক্ষু উৎপাদক জেলা।

বিহার ঃ বিহারের প্রধান ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল উত্তরপ্রদেশের ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল সংলগ্ন। বর্তমানে

বেশীরভাগ জমিতে গমের চাষ করায় ইক্ষু চাষের জমির পরিমান কমে গেছে। চম্পারণ, গয়া, সারণ, মুজফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, এবং পাটনা প্রধান ইক্ষু উৎপাদক জেলা।

হরিয়ানা ঃ গত কয়েক বছরে জলসেচের ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় হরিয়ানা ইক্ষু চাষে উন্নতি করেছে। উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত কর্ণেল, আম্বালা, কুরুক্ষেত্র, হিসার, পানিপথ, গুরুগাঁও এবং ফরিদাবাদের প্রধান অর্থকরী ফসল হল ইক্ষু। তবে রাজের শুষ্ক পশ্চিম অঞ্চলে চাষাবাদ হয় না।.

পাঞ্জাব ঃ সবুজ বিপ্লব পাঞ্জাবে কার্যকরী হওয়ায় গম চাষ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ইক্ষু চাষে ব্যাঘাত ঘটেছে। তবে এখানকার গুরুদাসপুর, অমৃতসর, জলন্ধর, রূপনগর, ফিরোজপুরে এখনও উল্লেখযোগ্য ভাবে ইক্ষু উৎপাদন হয়ে থাকে।

অন্যান্য ঃ উড়িষ্যার কোরাপুট, কটক, পুরী এবং সম্বলপুর, মধ্যপ্রদেশের মেরেনা ও রাতমাল জেলা, আসামের ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকা, পঃবাংলার বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী, মালদা, উঃ 24 পরগণা নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজস্থানের গঙ্গানগর, কোটা, চিত্রদুর্গ, ভিলওয়ারা ও উদয়পুর জেলা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল।

❑ তামাক

ভারতের আরও একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল তামাকের বীজ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এনে এদেশে তামাক চাষের সূচনা হয়। তারপর থেকে এর চাষ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভারত পৃথিবীতে তামাক চাষে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। তামাক থেকে প্রধানত সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, জর্দ্দা, নস্যি প্রভৃতি তৈরী করা হয়। তাছাড়া, কীটনাশক ওষুধ তৈরীতে তামাক ব্যবহৃত হয়। তামাক সাধারণতঃ শস্যাবর্তন প্রথায় চাষ আবাদ হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু এই ফসলে অর্থগম বেশী হয়, সে কারণে একই জমিতে বছর বছর এই ফসলের চাষ হ'য়ে থাকে ভারতের মহারাষ্ট্রে ও অন্ধ্রপ্রদেশে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে একই জমিতে বারবার তামাক লাগালে তার গুনমান বাড়ে।

ভারতে তামাক উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা ঃ তামাক ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল এবং এই ফসল উষ্ণতার চরমতাও সহ্য করতে পারে।

জলবায়ু ঃ তামাক চাষে সাধারণতঃ 16^0 সে. থেকে 35^0 সে. উষ্ণতা প্রয়োজন। বার্ষিক বৃষ্টিপাত 40 সে.মি. হলেই তামাক চাষ করা যায়, তবে কোনো কোনো অঞ্চলে 50 সে.মি. বৃষ্টিপাতেও তামাক চাষ করা যায়, তবে সেটি ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে হওয়া প্রয়োজন। যেখানে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত এবং কম সেখানে জলসেচের প্রয়োজন হয়। কুয়াশা তামাক চাষে খুবই ক্ষতিকর। ফসল পাকার পরে বৃষ্টিপাত তামাক ফসল চাষে ক্ষতিকর, এতে পাতার গন্ধ কমে যায়। সে কারণে এই সময় শুষ্ক ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া দরকার। জল নিকাশী ব্যবস্থা যুক্ত লাল বা হলুদ দোঁয়াশ মাটি তামাক চাষে আদর্শ। তবে তামাক চাষের মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ কম ও খনিজ লবণের পরিমাণ বেশী থাকে বলে গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তামাক চাষে জলবায়ুর তুলনায় মৃত্তিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সে কারণে তামাক চাষের অঞ্চল মৃত্তিকার গুণাগুনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তামাক সমভূমি অঞ্চল থেকে শুরু করে 800 মিটার উচ্চতাযুক্ত অঞ্চলে জন্মে থাকে। তামাকের চারা রোপন, পাতা সংগ্রহ, শোধন ও বাজারে পাঠানোর আগে পর্যন্ত সমস্ত কাজ সুষ্ঠু ভাবে করার জন্য দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের দরকার হয়।

তামাকের প্রকারভেদ ঃ ভারতে দু'ধরণের তামাকের চাষ হয়।

1. নিকোটিয়ানা টোবাকাম — এটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, হুকা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এই গাছগুলি লম্বা, দীর্ঘ পত্রযুক্ত ও হলুদ ফুল সমৃধ হয়। ভারতের উৎপন্ন তামাকের 90 শতাংশ এই প্রজাতির।

2. নিকোটিয়ানা রাস্টিকা — এই প্রকার তামাক ঠাণ্ডা জলবায়ু পছন্দ করে, সে কারণে ভারতে উত্তর ও উত্তর পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে এই প্রজাতির তামাকের চাষ হয়। এই প্রজাতির গাছ আকৃতিতে ছোটো হয়, পাতাগুলি

গোলাকার হয়ে তাকে ও গাছে হলুদ ফুল হয়। এটি হুকাতে ও খৈনি খেতে ব্যবহৃত হয়। ভারতে উৎপন্ন তামাকের 80% এই ধরনের।

উৎপাদন ঃ তামাক উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। চীনের পরেই ভারতের স্থান।

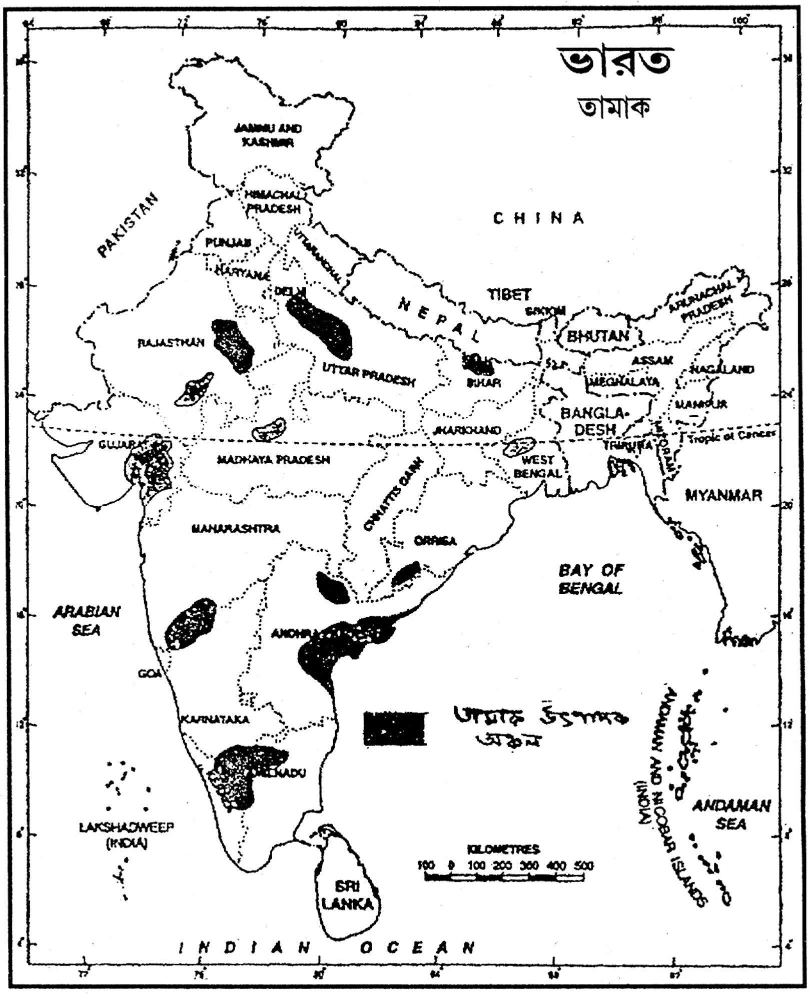

চিত্র 3.57 ঃ ভারতের তামাক উৎপাদক অঞ্চল

পৃথিবীর তামাক উৎপাদনের 4 শতাংশ ভারতে উৎপাদিত হয়। তামাক চাষ ভারতে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1950–51 সালের 2.61 লক্ষ টন উৎপাদন 2002–03 সালে 4.92 টনে পৌঁচেছে। ঠিক একই ভাবে ভারতে তামাক চাষের জমির পরিমাণ ওঠানামা করেছে নিম্নলিখিত ভাবে ঃ 1950–51 সালে 3.57, 1990–91 সালে 4.12 এবং 2002–03 সালে 3.27 লক্ষ হেক্টর। আবার হেক্টর প্রতি উৎপাদনও এই সময়ে বেড়েছে ঃ যেমন 1950–51 সালে 73 কুইন্টাল এবং 2002-03 সালে 15.1 কুইন্টাল।

উৎপাদক অঞ্চল ঃ ভারতের প্রায় 15টি রাজ্যেই তামাক উৎপন্ন হয়। তবে ভারতের (চিত্র 3.50) অন্ধ্রপ্রদেশ ও গুজরাট মিলিত ভাবে দেশের মোট উৎপাদনের 58 শতাংশ তামাক উৎপাদন করে।

গুজরাট ঃ ভারতে তামাক উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী গুজরাটের মোট উৎপাদন অন্ধ্র প্রদেশের পরেই।

তবে বর্তমানে এর উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে 2002–03 সালে এখানে 866 হাজার হেক্টর জমিতে 1973 হাজার টন তামাক উৎপাদিত হয়েছিল। এখানকার প্রধান তামাক উৎপাদক অঞ্চল হল খেদা ও ভাদোদরা জেলা।

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ তামাক উৎপাদনে প্রথম স্থানাধিকারী অন্ধ্রপ্রদেশ কখনও কখনও গুজরাটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এরা পালা করেই প্রথম স্থান দু'এক বছর বাদে বাদে দখল করে। 2002–03 সালে অন্ধ্রপ্রদেশ 117 হাজার হেক্টর জমি থেকে 144 হাজার টন তামাক উৎপাদন করেছিল। কিন্তু এই উৎপাদন গুজরাটের তুলনায় কম। প্রকাশম, পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী, কৃষ্মা, কুর্ণুল এবং নেলোর প্রধান তামাক উৎপাদক অঞ্চল।

অন্যান্য ঃ ভারতে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য তামাক উৎপাদক রাজ্যগুলি হল উত্তর প্রদেশ, কর্ণাটক, পশ্চিম বাংলা, বিহার, তামিলনাড়ু মহারাষ্ট্র এবং উড়িষ্যা।

বানিজ ঃ উৎপাদিত তামাকের 40 শতাংশ দেশেই ব্যবহৃত হয় আর বাকী 20% বিদেশে রপ্তানি করা হয়। তামাক রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। 1994–95 ভারত 53.7 মিলিয়ন কেজি তামাক বিদেশে রপ্তানি করে 377 কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছিল। ভারতের তামাক প্রধানতঃ রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেনে রপ্তানি হয়। এছাড়া ভারত থেকেও জাপান, মিশর, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানী ও সিঙ্গাপুরেও তামাক রপ্তানি হয়। প্রধানত চেন্নাই বন্দর মারফত তামাক রপ্তানি হলেও কোলকাতা, মুম্বাই ও বিশাখাপত্তনমও রপ্তানি বানিজ্যে অংশগ্রহণ করে।

❑ তৈলবীজ

তৈলবীজও ভারতে অর্থকরী ফসলের পর্যায়যুক্ত। তৈলবীজ থেকে নিষ্কাশিত তেল আমাদের খাদ্যেণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং রং, বার্নিশ, হাইড্রোজেন, তেল, সাবান, সুগন্ধ দ্রব্য, পিচ্ছিলকারক পদার্থ তৈরীতে কাজে লাগে। তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাষণের পর যে খৈল বা ছিবড়া অবশিষ্ট থাকে যা পশুখাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তৈলবীজ চাষের জমির পরিমান ও উৎপাদন দুই ক্ষেত্রেই ভারত শীর্ষ স্থানের অধিকারী। প্রধান পাঁচ প্রকার তৈলবীজ যেমন চীনাবাদাম, তিল, রেপসীড, সর্ষে, তিসি, এবং রেড়ির বীজ 177 লক্ষ হেক্টর জমি অধিকার করে যা মোট কর্ষিত জমির শতকরা 12 ভাগ। অন্যান্য তৈলবীজ যেমন সয়াবীন, সূর্যমুখী, তুলার বীজ, ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করলে তৈলবীজ অধিকৃত জমির পরিমাণ হবে 252.6 লক্ষ হেক্টর। এটি হবে মোট কর্ষিত জমির শতকরা 19 ভাগ। ভারতের 9টি প্রধান তৈলবীজ উৎপাদন 2002–03 সালে 15,059000 টনে পৌঁচেছিল। তবে সব সময়েই আমাদের দেশে তৈলবীজের একটা চাহিদা থেকেই যাচ্ছে ও সে কারণে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় বা ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাহিদা মেটাবার জন্য উৎপাদন বাড়ানো দরকার।

চীনাবাদাম ভারতের প্রধান তৈলবীজ এবং দেশের মোট তৈলবীজ উৎপাদনের অধিকাংশই চীনাবাদাম। চীনাবাদামের শাঁস ভিটামিন, প্রোটিন সমৃদ্ধ ও উচ্চ ক্যালরিযুক্ত। এ থেকে শতকরা 40–50 ভাগ খাদ্য তেল ও বনস্পতি তৈরী হয়। চীনাবাদাম তেল থেকেই মার্জারিন উল ও স্লিক ও কৃত্রিম চামড়া, সাবান তৈরী হয়। চীনাবাদাম কখনও ভেজে মিষ্টি বা নোন্‌তা করে ও খালিও খাওয়া হয়। এর ছিবড়াও পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চীনাবাদাম শয্যাবর্তনের ফসল করেন এর চাষে বায়ুর নাইট্রোজেনের মাত্রা ঠিক থাকে ও মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ে।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ঃ এটি ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল ও এর চাষে 20^0 সে. থেকে 30^0 সে. উষ্ণতা প্রয়োজন। 50–75 সে.মি. বৃষ্টিপাত তৈলবীজ চাষে উপযোগী। 100 সমবর্ষন রেখা তৈলবীজ ক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণ করে। কুয়াশা, দীর্ঘ খরা, একটানা বৃষ্টিপাত ও আবদ্ধ জল এর চাষে ক্ষতিকর। ফসল পাকার সময় সূর্যকরোজ্জ্বল আবহাওয়া প্রয়োজন খারিফ ও রবি দুই ধরনের শস্য হিসাবেই এর চাষ হলেও মোটামুটি 90 শতাংশ বাদাম খারিফ শষ্য হিসাবেই চাষ হয়ে থাকে। ভালো জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত এঁটেল বা দোঁয়াশ মাটি, লাল, কালো ও হলদে মাটি তৈলবীজ চাষে উপযোগী।

উৎপাদন ও উৎপাদন অঞ্চল ঃ পৃথিবীর মোট তৈলবীজ উৎপাদনের দুই তৃতীয়াংশ ভারতে উৎপাদন হয়। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে 1950–51 সালে ভারতের উৎপাদন ছিল 346 লক্ষ টন যা 1992–93 সালে 856 লক্ষ টনে পৌঁছায়। এটি রেকর্ড উৎপাদন ছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও তৈলবীজ উৎপাদনে ওঠা নামা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হিসাবে বৃষ্টিপাতের বন্টন ও পরিমানকেও দায়ী করা যায়।

বিভিন্ন বছরের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু ও গুজরাট ভারতের তিনটি প্রধান চীনাবাদাম উৎপাদন রাজ্য এবং এখান থেকে দেশের শতকরা 65 ভাগ বাদাম উৎপাদিত হয়। দেশের মোট উৎপাদনের 18% (2002–03) উৎপাদনকারী অন্ধ্রপ্রদেশের স্থান ভারতবর্ষে তৃতীয়। এই রাজ্যের চিতোর, কুর্ণূল ও অনন্তপুর জেলা প্রধান উৎপাদক অঞ্চল। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী তামিলনাডু দেশের শতকরা 22 ভাগ চীনাবাদাম উৎপাদন করে। উত্তর আর্কট, আম্বেদকর, দক্ষিণ আর্কট সালেম, তিরুচিরাপল্লী এবং কোয়েম্বাটুর জেলা মিলে এই রাজ্যের মোট উৎপাদনের 70% উৎপাদন করে। চীনা বাদাম উৎপাদনে প্রথম স্থানের অধিকারী গুজরাটের উৎপাদন দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা 25 ভাগ। মহারাষ্ট্র 10 শতাংশ উৎপাদন করে থাকে। জলগাঁও, নাসিক এবং অমরাবতী জেলা এই রাজ্যের চীনাবাদাম উৎপাদনের দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে থাকে। কর্ণাটক দেশের 12% উৎপাদন করে থাকে (2002–03)।

এছাড়া, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বাংলা, কেরালা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং বিহার কিছু পরিমান চীনাবাদাম উৎপাদন করে থাকে।

বানিজ্য ঃ দেশের মোট চীনাবাদাম উৎপাদনের 75% আন্তর্বানিজ্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই বানিজ্যে প্রধানতঃ অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং পাঞ্জাব অংশ গ্রহণ করে। দেশে ভুক দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাদাম ও তার সাহায্যে প্রস্তুত বিভিন্ন দ্রব্যের রপ্তানি কমে গেছে। তবে এখনও কিছু কিছু ইউরোপীয় দেশে ও রাশিয়ায় বাদামজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়।

তিল ঃ তিল তেল প্রধানতঃ রান্নার কাজে এবং সুগন্দী দ্রব্য ও ঔষুধ তৈরীর কাজে লাগে। তিল এর বীজ ভেজে গুড় অথবা চিনির সঙ্গে মিশিয়ে নাড়ু করে খাওয়া হয়। দুগ্ধ প্রদায়ী পশুকে এর খৈল খাওয়ানো হয়।

তিল চাষের উপযোগী অবস্থা ঃ মোটামুটি বৃষ্টিপাত যেমন 45–50 সে.মি. বৃষ্টিপাতে তিল গাছ জন্মায়। যে সমস্ত অঞ্চলের উষ্মতা 21°C থেকে 23°C সেখানে তিল ভালো জন্মায়। কুয়াশা, দীর্ঘদিন খরা, আবার দীর্ঘদিন ধরে বেশী বৃষ্টিপাত তিল চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত হাল্কা দোঁয়াশ মাটি তিল চাষে উপযুক্ত। সমভূমি থেকে শুরু করে 1300 মিটার, উচ্চতা পর্যন্ত এর চাষ হয়। উত্তর ভারতে তিল খারিফ শষ্য ও দক্ষিণ ভারতে রবি শস্য হিসেবে চাষ হয়ে থাকে।

উৎপাদন ও বন্টন ঃ তিল চাষের জমির পরিমান ও তিল উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ও পৃথিবীর মোট তিল উৎপাদনের দুই তৃতীয়াংশ ভারতে উৎপাদন হয়। যদিও তিল চাষে বৃষ্টি খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে, সে কারণে এর উৎপাদনে ও উঠানামা দেখা যায়। তবুও ভারতে তিল উৎপাদনে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। 1950–51 সালে তিল এর উৎপাদন ছিল 4.5 লক্ষ টন যা 1990–91 সালে বেড়ে হয় 8.5 লক্ষ টনে। তারপর তিলের উৎপাদনে ঘাটতি দেখা যায়। 2002–03 এর উৎপাদন ছিল 4.3 লক্ষ টন।

ভারতের সর্বত্র তিলের চাষ হলেও প্রধানত উড়িষ্যা, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট (28.03%) ও পশ্চমবঙ্গ প্রধান তিল উৎপাদক অঞ্চল। উড়িষ্যার কটক, পুরী, গঞ্জাম, সম্বলপুর, ঢেনকানাল হল প্রধান তিল উৎপাদক অঞ্চল। তিল উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পশ্চিমবঙ্গ হলেও এর উৎপাদন দেশের মোট উৎপাদন এর 20.73%।

এর পরের স্থানগুলি হল যথাক্রমে মহারাষ্ট্র (8.06%), তামিলনাডু (7.14%), কর্ণাটক (6.7%), মধ্যপ্রদেশ (5.3%) এবং রাজস্থান (2.5% – 2002–03 সাল)।

কৃষি অঞ্চল (Agricultural Regions)

❑ ভূমিকা

কৃষি অঞ্চল বলতে আমরা এমন এলাকা বুঝি যেখানে কৃষিজমির ব্যবহার ও শস্য ধাঁচের সমতা (Homogenity) লক্ষ্য করা যায়। এখানে উৎপাদিত ফসলের প্রকৃতি, তাদের সম্মিলিত ধাঁচ, চাষবাসের প্রকৃতি এবং কৃষিকাজের পদ্ধতির মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে পাঞ্জাবে ধান চাষের প্রবর্তন এবং নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিতে গবের জনপ্রিয়তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন-জলবায়ু, মৃত্তিকা, ভূ-প্রকৃতি, এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ যেমন জনসংখ্যার ঘনত্ব, কৃষিতে কারিগরী বিদ্যা, শষ্যভিত্তিক জমির ব্যবহার, নগরায়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি উপাদানগুলির দ্বারা কৃষি অঞ্চল প্রভাবিত হয়। বিভিন্ন কৃষিবিজ্ঞানীগণ ভারতবর্ষকে বহু প্রকার কৃষি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। এদের মধ্যে D. Thorner, L.D. Stamp, M.S. Randhawa, Ramchandraan, R.L. Singh, O. Slamper, F. Siddiqui, R.B. Mandal-র নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ ভারতকে কয়েকটি কৃষিঅঞ্চলে ভাগ করেছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই তিন থাক বিশিষ্ট কৃষি অঞ্চলের কথা বলেছেন (a) Macro অঞ্চল (কৃষি বলয়), Meso অঞ্চল এবং Micro অঞ্চল।

রানধাওয়া-র কৃষি অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Agricultural Regions by M.S. Randhawa) ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের অবস্থা, শস্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রণালীর ওপর ভিত্তি করে Randhawa ভারতবর্ষকে প্রধান 5-টি অঞ্চলে ভাগ করেছেন (চিত্র 3.51)।

(1) **নাতিশীতোষ্ম হিমালয় অঞ্চল ঃ** পশ্চিমে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে পূর্বে অরুনাচল পর্যন্ত গোটা হিমালয় অঞ্চল এর অন্তর্গত। এর 2টি ভাগ আছে ঃ (1) চা ও ধান-প্রধান পূর্ব দিক যথা-সিকিম, উজান আসাম ও অরুনাচল প্রদেশ এবং (2) ফল, ভুট্টা ও আলু-প্রধান পশ্চিম দিক যেমন-জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাঞ্চল। ফলের মধ্যে আপেল, চেরী, এ্যাপ্রিকট, ওয়ালট, বাদাম, পীচ, ন্যাসপাতি, ইত্যাদি। পশম ও মাংসের জন্য ছাগল ও ভেড়া পালন করা হয়। হিমাচল প্রদেশে মৌমাছি পালন গুরুত্বপূর্ণ পেশা।

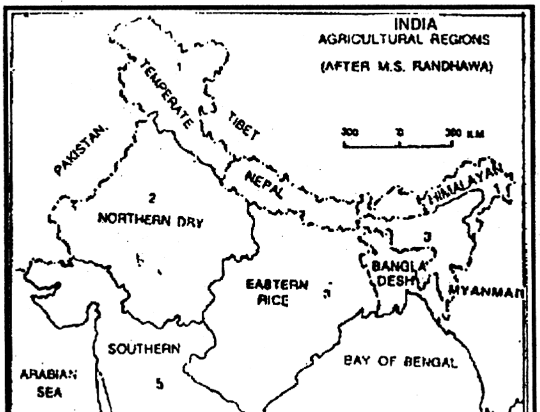

চিত্র 3.58 ঃ রানধাওয়ার কৃষি অঞ্চল

(2) **শুষ্ক উত্তর (গম) অঞ্চল ঃ** পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত 75 সেমির কম। গম, ভুট্টা, কার্পাস, ডাল ও মিলেট প্রধান শস্য। উট প্রধান প্রাণী, যদিও ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গাধাও সচরাচর দেখা যায়।

(3) **পূর্বের আর্দ্র (ধান) অঞ্চল ঃ** ভারতের উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলি আসাম, মেঘালয় মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ছত্তিশগড়, পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত 150 সেমি। মাটি প্রধানত পাললিক এখানে ধান, পাট, ইক্ষু ও চা উৎপাদিত হয়।

(4) **পশ্চিমের আর্দ্র (মালাবার) অঞ্চল ঃ** মহারাষ্ট্র থেকে কেরালা পর্যন্ত পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 250 সেমির বেশী। ধান প্রধান ফসল, যদিও নারকেল ও রবার, কফি, মশলা, কাজুবাদামের এখানে যথেষ্ট চাষ হয়।

(5) **দক্ষিণের তন্ডুল জাতীয় শস্য (মধ্যম বৃষ্টিপাত অঞ্চল) ঃ** দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশ, দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ গুজরাট, পূর্ব মহারাষ্ট্র, পশ্চিম অন্ধ্রপ্রদেশ, পূর্ব কর্ণাটক এবং পশ্চিম তামিলনাড়ু এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে 100 সেমির কম বৃষ্টিপাত হয়। জোয়ার, বাজরা, বাদাম, কার্পাস ও রেড়ির তেলবীজ প্রধান শস্য।

ওটোকার স্লাম্পা-র শ্রেণীবিভাগ (Classification of Otokar Slampa) ঃ কৃষিতে প্রভাব বিস্তারকারী 3টি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও কারীগরী বিষয়ক। তাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতার পর উন্নয়নের স্তর অনুযায়ী Slamper ভারতকে 13-টি কৃষি অঞ্চলে ভাগ (চিত্র 3.52) করেছেন। যথা—

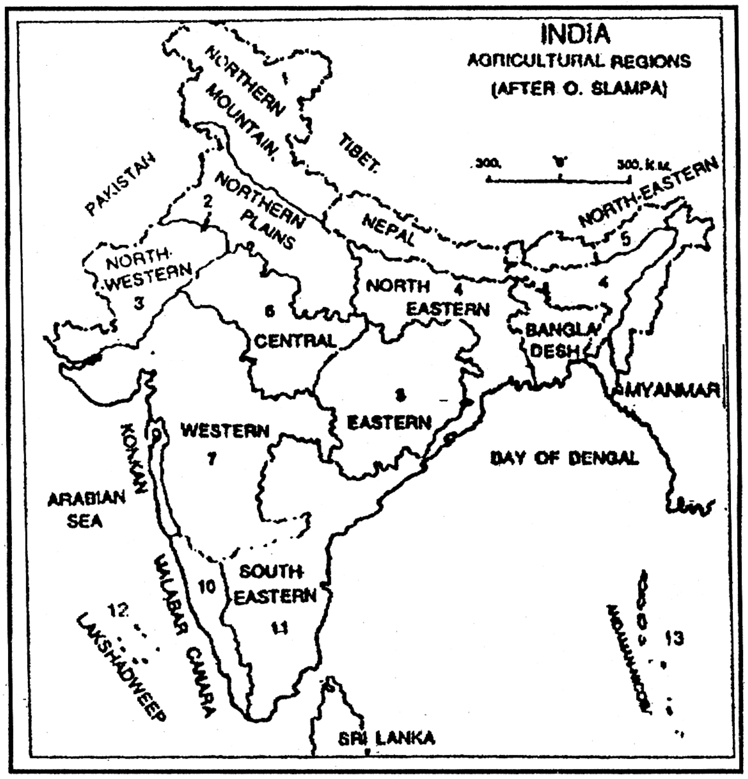

চিত্র 3.59 ঃ Otokar Slampa-র শস্য অঞ্চল

(1) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ঃ** 100–200 সে.মি. বাৎসরিক বৃষ্টিপাতযুক্ত এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হল অল্প সংখ্যক জনতা, ব্যাপক অরণ্য এলাকা, পর্যাপ্ত পশুপালন ক্ষেত্র এবং সীমিত কৃষি। প্রধান ফসল ধান ছাড়াও গম, ভুট্টা আলু এবং ফলও জন্মায়।

(2) **উত্তরের সমভূমি ঃ** বাৎসরিক 110 সে.মি. বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ জমিতে কৃষিকাজ হয় এবং মোট কৃষিজমির 30 শতাংশে বছরে দুবার চাষ হয়। ভারতবর্ষের এই কৃষি প্রধান অঞ্চলে গম, বার্লি, ডাল, ভুট্টা এবং বিক্ষিপ্তভাবে ধান চাষ হয়। বাণিজ্যিক ফসল হিসাবে আখ, তৈলবীজ ও তুলার চাষ হয়। স্থায়ী পশুচারণ

ক্ষেত্রের অভাব বিদ্যমান। কৃষির পাশাপাশি পশুপালন করা হয়। পশ্চিমাংশে মেষপালন প্রধান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম।

(3) **উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ঃ** বাৎসরিক 10–30 সে.মি. বৃষ্টিপাতযুক্ত এই এলাকায় জোয়ার, বাজরা এবং গম ইত্যাদি উত্তরাংশে চাষ করা হয় এবং পূর্বদিকে ভেড়া ও ছাগল প্রতিপালিত হয়। শুষ্ক পশ্চিমাংশে উট পালন অন্যান্য অর্থনৈতিক জীবিকা।

(4) **উত্তর-পূর্বাঞ্চল ঃ** বার্ষিক 150 সে.মি. বৃষ্টিযুক্ত (মেঘালয় ও আসামে 300 সে.মি.) এই অঞ্চলে প্রধান ফসল ধান ছাড়াও পাট, তৈলবীজ ও চা (উত্তর-পূর্বে) চাষ করা হয়।

(5) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল ঃ** অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ও মেঘালয় নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলে স্থানান্তর কৃষিকাজ করা হয়। ধান এখানকার প্রধান ফসল।

(6) **মধ্যাঞ্চল ঃ** বার্ষিক 50–70 সে.মি. বৃষ্টিপাত এবড়ো-খেবড়ো মালভূমি সমন্বিত এই অঞ্চলে বৃহৎ বনাঞ্চলের উপস্থিতি হেতু কৃষিকার্যের সুযোগ সীমিত। গম, জোয়ার, ডাল, তিল, কলাই, তিসিবীজ ও আখ এখানকার প্রধান ফসল।

(7) **পশ্চিমাঞ্চল ঃ** বার্ষিক 50–75 সে.মি. বৃষ্টিপাতযুক্ত ও কৃষ্ণমৃত্তিকাযুক্ত এই অঞ্চলে জোয়ার, বাজরা, তুলা, বাদাম, তিল ও তিসির চাষ হয়।

(8) **পূর্বাঞ্চল ঃ** 140–160 সে.মি. বৃষ্টিপাতযুক্ত এই অঞ্চলে ধান প্রধান ফসল। এখানে ডাল, জোয়ার, বাজরা, মিষ্টি আলু, সরিষা ও তিসি বীজ চাষ করা হয়।

(9) **কোঙ্কন অঞ্চল ঃ** পশ্চিম উপকূলের এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় 100–200 সে.মি.। ধান প্রধান ফসল। জোয়ার, তিসি বীজ ও নারকেলের চাষ হয়।

(10) **মালাবার ও কানাড়া অঞ্চল ঃ** 200 সে.মি.-র বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত কর্ণাটক ও কেরালা উপকূলে ধান, নারকেল, রবার, চা, কফি ও মশলা প্রধান ফসল।

(11) **দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ঃ** এই অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয়। ধান, জোয়ার, বাদাম, কার্পাস, তামাক প্রধান ফসল। এছাড়া কলা এবং আখও চাষ হয়।

(12) **লাক্ষাদ্বীপ ঃ** নারকেল প্রধান ফসল। মৎস্যশিল্পের বড় সম্ভাবনাময় অঞ্চল।

(13) **আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ঃ** নারকেল, ধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। মাছধরা ও শিকার এখানকার অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম।

R. L. Singh-র মতে কৃষিঅঞ্চল যথার্থই শস্য সমন্বিত অঞ্চল। এদেশের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য হল ধান, গম, মিলেট, ভুট্টা, ডাল, কার্পাস, বাদাম, নারকেল। R. L. Singh প্রথম ক্রমের (First order) শষ্য অঞ্চলকে আটভাগে ভাগ করেছেন। যথা—(1) ধান প্রধান অঞ্চল, (2) গম প্রধান অঞ্চল, (3) ডাল প্রধান অঞ্চল, (4) মিলেট প্রধান অঞ্চল, (5) বাদাম প্রধান অঞ্চল, (6) কার্পাস প্রধান অঞ্চল, (7) ভুট্টা প্রধান অঞ্চল এবং (8) নারকেল প্রধান অঞ্চল।

ধান প্রধান অঞ্চল ঃ এই অঞ্চলটি উত্তর-পূর্ব ভারত, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল, তামলনাডুর উপকূল ও পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। ভৌগোলিক অবস্থার পার্থক্যের ভিত্তিতে এই অঞ্চলটিকে 21টি তৃতীয় ক্রমের (Third order) কৃষি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা—(1) ধান-গম-আখ, (2) ধান-গম-ভুট্টা, (3) ধান—ডাল-পাট ইত্যাদি, (4) ধান—তৈলবীজ, (5) ধান—গম-ডাল, (6) ধান—গম-তৈলবীজ, (7) ধান—ভুট্টা-মিলেট-তৈলবীজ, (8) ধান—তৈলবীজ-মিলেট, (9) ধান—মিলেট-ভুট্টা, (10) ধান—মিলেট-তৈলবীজ, (11) ধান—মিলেট-ডাল, (12) ধান— তৈলবীজ-পাট-ভুট্টা, (13) ধান—পাট-

তৈলবীজ, (14) ধান—কার্পাস-ভুট্টা, (15) ধান—চা-তৈলবীজ, (16) ধান—মিলেট-বাদাম, (17) ধান—মিলেট-কার্পাস, (18) ধান—নারকেল-মশলা, (19) ধান—তৈলবীজ-ইক্ষু। (20) ধান—ভুট্টা-কার্পাস এবং (21) ধান—ভুট্টা-গম।

(2) **গম প্রধান অঞ্চল ঃ** উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওপর গম অঞ্চল প্রসারিত হয়েছে। Prof. R.L. Singh পুনরায় একে 7-টি তৃতীয় ক্রমের কৃষি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। যথা— 2.1) গম-ভুট্টা-ধান, 2.2) গম-ইক্ষু-ধান, 2.3) গম-ধান-ডাল, 2.4) গম-মিলেট-ডাল, 2.5) গম-ধান-ভুট্টা, 2.6) গম-ডাল-মিলেট, 2.7) গম-মিলেট-ডাল।

R.L. Singh ডাল, মিলেট, কার্পাস, বাদাম, ভুট্টা ও নারকেল অঞ্চলকে মোট 48টি তৃতীয় কৃষি অঞ্চলে ভাগ করেছেন।

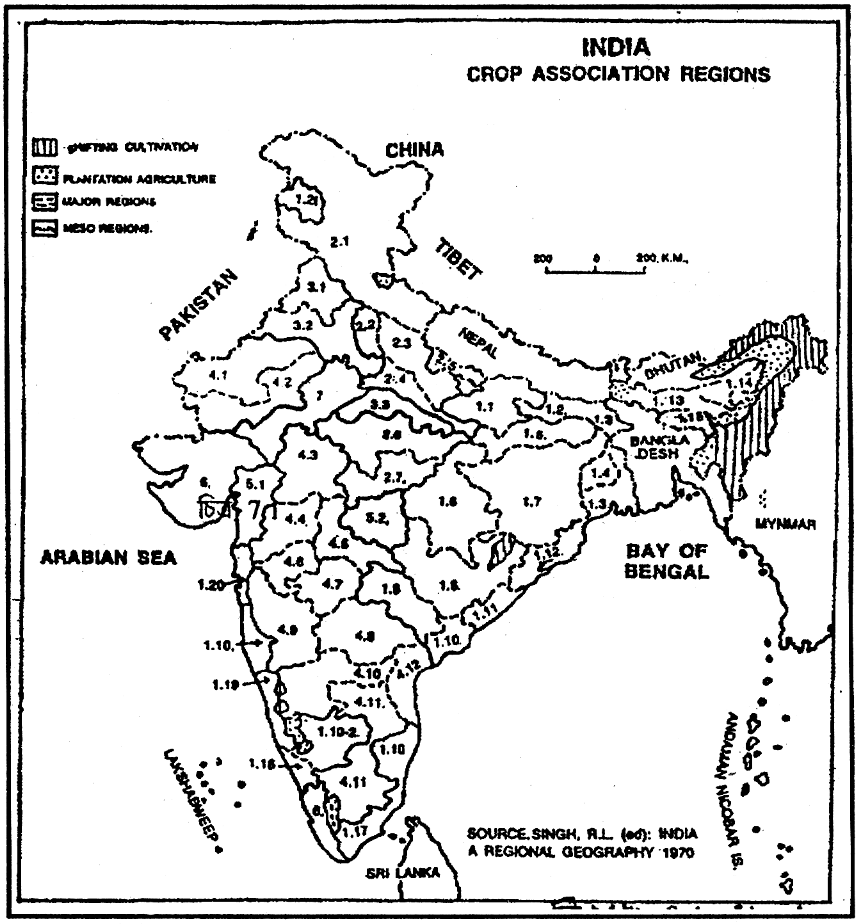

চিত্র 3.60 ঃ R. L. Singh-র শস্য অঞ্চল

এছাড়া অপর এক কৃষিবিশারদ Jasbir Singh কৃষি অঞ্চলীকরণ করতে গিয়ে প্রাথমিক ও গৌণফসলের ভিত্তিতে দ্বি-থাক বিশিষ্ট ফসল সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তিনি দেশে 12টি প্রধান ও 60-টি উপপ্রধান গৌণ ফসল সমন্বয় অঞ্চলকে শনাক্ত করেছেন।

তাঁর প্রধান শস্য অঞ্চলগুলো নিম্নরূপ।

(1) **ধান অঞ্চল ঃ** পূর্ব ভারত, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল সমভূমি এবং কাশ্মীর উপত্যকা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। শস্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে 21টি গোণ অঞ্চল রয়েছে।

(2) **জোয়ার অঞ্চল ঃ** দক্ষিণ-পূর্ব মহারাষ্ট্র, পশ্চিম অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটকের অভ্যন্তরীন এলাকা যেখানে 50–100 সে.মি. বৃষ্টিপাত হয় তা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এর 9টি গৌণ অঞ্চল রয়েছে।

(3) **বাজরা অঞ্চল ঃ** দেশের শুষ্কভাগের পশ্চিমাংশ এর অবস্থান। রাজস্থান, কচ্ছ উপদ্বীপ এবং মহারাষ্ট্রের ধুলে-নাসিক এলাকার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শষ্য হচ্ছে জোয়ার, রাগী, ডাল ও তৈলবীজ। এখানে 5টি গৌণ অঞ্চল আছে।

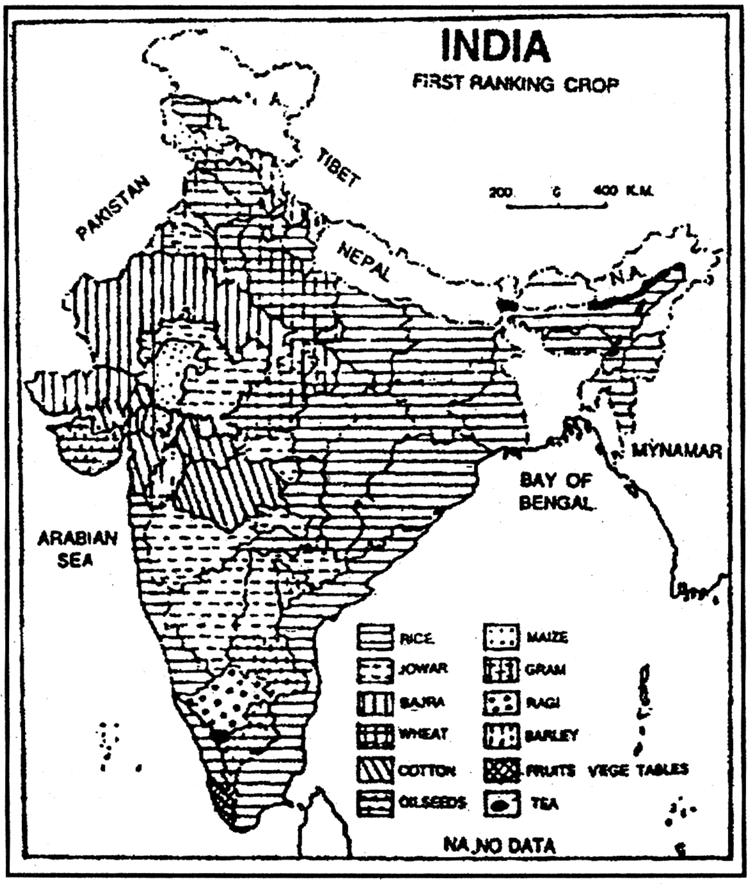

চিত্র 3.61 ঃ Jasbir Singh-র শস্য অঞ্চল

(4) **গম অঞ্চল ঃ** পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ (পশ্চিম), পশ্চিম বিন্ধ্য অঞ্চল এবং পূর্বে মালব মালভূমি নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। সেচ প্রধান এলাকায় গম চাষের পর কার্পাস, ইক্ষু, ধান, ভুট্টা এবং বৃষ্টিপাত যুক্ত এলাকায় ডাল, বাজরা, তৈলবীজের চাষ হয়।

(5) **কার্পাস অঞ্চল ঃ** মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মালব মালভূমির প্রধান ফসল হল কার্পাস। গৌণ শস্যের ভিত্তিতে এখানে 4টি শস্যের সমন্বয় দেখা যায়। যথা—কার্পাস-জোয়ার, কার্পাস-মিলেট, কার্পাস-জোয়ার-পশুখাদ্য, জোয়ার-ডাল-তৈলবীজ।

(6) **তৈলবীজ (বাদাম) অঞ্চল ঃ** কাথিয়াবাড়, দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর সালেম, কোয়েম্বাটোর অঞ্চলের 2টি গৌণ শস্য সমন্বয় আছে—(ক) বাদাম-জোয়ার-বাজরা (খ) বাদাম-জোয়ার-ধান-ডাল (তামিলনাড়ুর উচ্চভূমি, উচ্চ কাবেরী অববাহিকা এবং রায়লাসীমা মালভূমি)।

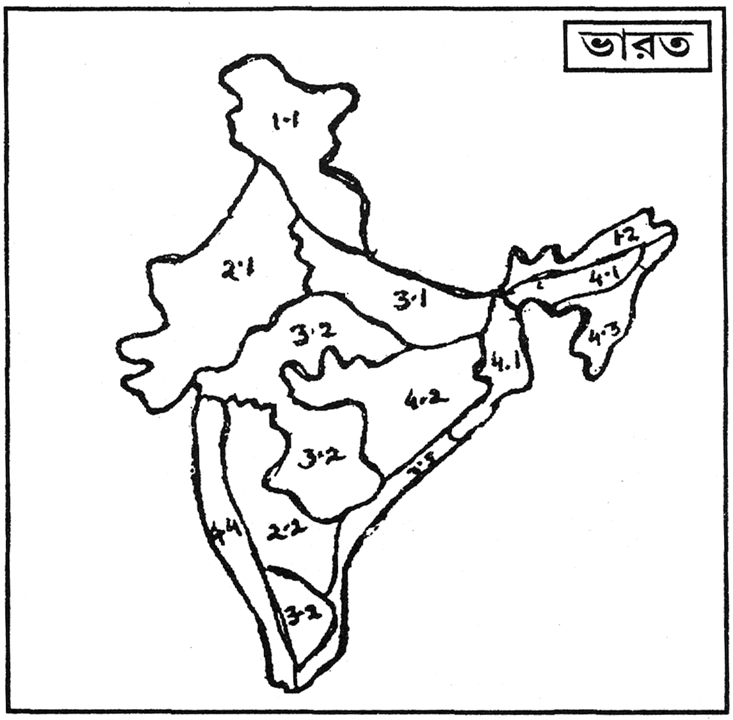

চিত্র 3.62 ঃ R. B. Mandal-র শস্য অঞ্চল

(7) **ডাল অঞ্চল ঃ** বুন্দেলখণ্ড, গঙ্গানগর, হিসার, ভাতিন্দা এলাকার ডাল প্রধান ফসল। বুন্দেলখণ্ডে ডাল, গম-মিলেট চাষ হয় এবত পরের দুটি স্থানে (a) ডাল-তৈলবীজ-বাজরা-ভুট্টা এবং (b) ডাল-বাজরা-পশুখাদ্য গমের চাষ হয়।

(8) **ভুট্টা অঞ্চল ঃ** ডোডা ও উধমপুর, ছাম্বা (কাশ্মীর) ও পূর্ব রাজস্থান মালভূমিতে ভুট্টা উল্লেখযোগ্য ফসল। 3টি উল্লেখযোগ্য ফসল সমন্বয় হল—(ক) ভুট্টা-গম-ধান, (খ) ভুট্টা-ধান-মিলেট। এবং (গ) ভুট্টা-গম-তৈলবীজ-কার্পাস।

(9) **রাগী অঞ্চল ঃ** দক্ষিণ কর্ণাটকের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে রাগী চাষ হয়। রাগী কোথাও এককভাবে, আবার কোথাও রাগীর সাথে তৈলবীজ ও ডালের চাষ হয়।

(10) **বার্লি অঞ্চল ঃ** উত্তরাঞ্চল এবং হিমালচলপ্রদেশ পাহাড়ী এলাকায় বার্লি প্রধান ফসল। বার্লি ছাড়াও একই জমিতে গম ও ডালের চাষ হয়।

(11) **ফল অঞ্চল ঃ** দক্ষিণ কেরালায় ফলই প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। ফলের সাথে আবাদী ফসল (মশলা, রবার) নারকেল ও ধানের চাষ হয়।

(12) **চা অঞ্চল ঃ** চা উত্তর-পূর্ব ভারত এবং নীলগিরিতে চাষ হয়। চায়ের সাথে কফিও চাষ হয়।

R.B. Mandal-র শ্রেণীবিভাগ ঃ R.B. Mandal-র ভাষায় কৃষির আঞ্চলিকীকরণে জলবায়ুর ভূমিকা প্রধান। জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আবার বৃষ্টিপাত প্রধান। তাই ভারতকে কৃষি অঞ্চলে ভাগ করার আগে সমভাবাপন্ন জলবায়ু অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে আমরা ভারতকে 4টি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ভাগ করতে পারি। (1) হিমালয় অঞ্চল, 1000-250mm বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল, (2) পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চল 700mm বৃষ্টিপাতযুক্ত, (3) আর্দ্র অঞ্চল, 1250mmর বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল।

এই 4টি বৃহৎ অঞ্চলকে কয়েকটি গৌণ অঞ্চলে ভাগ করা যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে তার ভিত্তিতে গৌণ ভাগগুলো করা যায়। যেমন—

(1) হিমালয় অঞ্চল	(1.1) পশ্চিম হিমালয় পার্বত্য প্রদেশের কৃষি অঞ্চল, কাশ্মীর উপত্যকা। (1.2) পূর্ব হিমালয়; দার্জিলিং, সিকিম, হিমালয়, অরুনাচল হিমালয়।
(2) শুষ্ক অঞ্চল	(2.1) উত্তর পশ্চিম শুষ্ক অঞ্চল। (2.2) উপদ্বীপের শুষ্ক অঞ্চল।
(3) অব-আর্দ্র অঞ্চল	(3.1) উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি (3.2) অব-আর্দ্র উপদ্বীপীয় মালভূমি, (3.3) অব-আর্দ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
(4) আর্দ্র অঞ্চল	(4.1) নদী অববাহিকা ও দ্বীপ অঞ্চল, (4.2) উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চল, (4.3) পর্বত ও পূর্বের মালভূমি, (4.4) পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল।

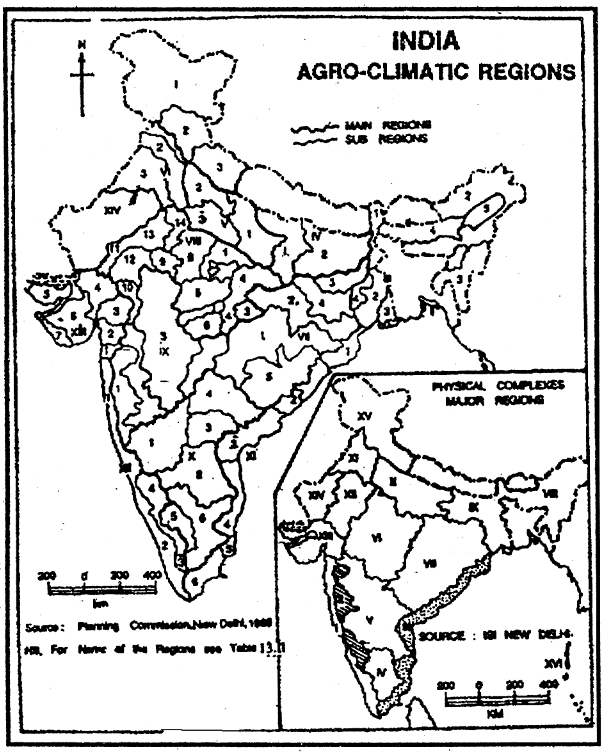

চিত্র 3.63 ঃ কৃষি জলবায়ু অঞ্চল (যোজনা-আয়োগ কৃত)

উপসংহার— খুব সম্ভবত জলবায়ু হল কৃষির প্রধান উপকরণ। আর এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ভারতের যোজনা কমিশন 1989 সালে Agro Climatic Regions of India নামে এক নতুন শ্রেণীবিভাগ করেছেন যাতে 15-টি শ্রেণীর রয়েছে। কৃষিজলবায়ু উপাদানের মধ্যে ঐ প্রতিষ্ঠান মৃত্তিকারধরণ, বৃষ্টিপাত, উষ্মতা, জলসম্পদ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়েছে। এবং নতুন এক কৃষি শ্রেণীবিভাগ করেছে। 15-টি শ্রেণী আবার উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত। চিত্রে যোজনা আয়োগ এর প্রধান শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল।

3.2.4 জলসেচ ব্যবস্থা (Irrigation Systems)

❑ ভূমিকা

কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি, ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, দোফসলী ও বহুফসলী চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ভারতে জলসেচের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো নির্দিষ্ট জমিতে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদনের জন্য সঠিক সময়ে প্রয়োজনমত কৃত্রিমভাবে জল সরবরাহকে জলসেচ বলা হয়। পতিত ও অনাবাদী জমির ব্যবহার এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জলসেচ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জলসেচের প্রয়োজনীয়তা ঃ ভারতের কৃষিকার্যে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারত মৌসুমী বৃষ্টিপাতের দেশ, তাসত্বেও ভারতে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা আছে। এর কারণগুলি হল—

(ক) ভারতে সর্বত্র সমপরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না। ভারতের প্রায় অর্ধাংশে 25 সে.মি. 125 সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ফলে মাঝারি ও কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে জলসেচের প্রয়োজন হয়।

(খ) ভারতে কেবলমাত্র বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হয়, সুতরাং রবিফসল চাষ করার সময় শীতকালে প্রায় সর্বত্র জলসেচের প্রয়োজন হয়।

(গ) বর্ষাকালে ও বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা শতকরা 20 ভাগ কম হয়, তাহলে শস্যের উৎপাদন কিছু কম হয়, কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমান স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত অপেক্ষা 40 ভাগ কম হলে ব্যাপক শস্যহানি ঘটে ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ অসুবিধা দূর করার জন্য জলসেচের প্রয়োজন।

(ঘ) জলসেচের মাধ্যমে নদীগুলিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ও পরিমিত জলের সাহায্যে চাষ করলে শস্য ভালো হয়।

(ঙ) অনেক স্থানে মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম থাকে। ফলে জলসেচের প্রয়োজন দেখা দেয়।

জলসেচ পদ্ধতি (Methods of Irrigation) ঃ ভারতে জলসেচের একমাত্র যোগান বৃষ্টির জল, জমানো জল বা বরফগলা জল। এই জল দু'ভাবে পাওয়া যায়— (ক) মাটির উপরস্থ নদী ও জলাশয় থেকে খাল ও নদী জলোত্তোলন প্রকল্পের মারফত এবং (খ) ভূ-নিম্নের জল নলকূপ মারফৎ। ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা ও বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের জন্য জলসেচের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতে প্রধানত তিন প্রকারের জলসেচ পদ্ধতি বর্তমান আছে। যথা— (i) কূপ ও নলকূপ, (ii) পুকুর ও জলাশয় এবং (iii) খাল। ভারতের মোট কৃষিজমির 38% জলসেচের আওতা-ভুক্ত।

কূপ ও নলকূপ (Well & Tubewell) ঃ ভারতের মোট সেচযুক্ত কৃষির প্রায় 53% জমিতে কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে জলসেচ করা হয়। কূপ ও নলকূপের সাহায্যে ভারতের বহুস্থানে, বিশেষতঃ উত্তর ভারতে, জলসেচ হয়ে থাকে। ভারত সরকারের সাম্প্রতিক তথ্যাদিতে দেখা যায় যে ভূ-নিম্নের জলভাণ্ডার থেকে কূপ ও নলকূপের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি জমিতে সেচের জল সরবারহ করা হয়। ভারতে পরিগঠিত সমভূমিযুক্ত রাজ্যগুলিতে কৃষকেরা নিজেদের শক্তিচালিত নলকূপের (গ্রামাঞ্চলে এগুলি Shallow বা অগভীর টিউব ওয়েল বলে সুপরিচিত) সাহায্য সবুজ বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়া সরকারী গভীর নলকূপগুলি যাদের সেচোন ক্ষমতা নলকূপ প্রতি 100 হেক্টর, সেগুলিও ঐ রাজ্যগুলিতে যথা— পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু, প্রত্যেক রাজ্যে কয়েক হাজার নলকূপ আছে—যেগুলি বিদ্যুৎচালিত।

লক্ষ লক্ষ কাঁচা এবং বাঁধানো কূপ নদীগুলির নিকটের সমভূমিতে সেচের কাজে লাগানো হয়। এগুলি গরু ও অন্যান্য পশুর সাহায্যে চলে। তবে এগুলিতে ক্রমশ ডিজেল ইঞ্জিন যুক্ত করা হচ্ছে। নলকূপগুলির মত কূপগুলিতে বারোমাস জল থাকে না। কেবলমাত্র গভীর নলকূপগুলি খরার সময়েও কৃষিক্ষেত্রে জলের যোগান দেয়। তবে কূপ ও নলকূপের বেশী ব্যবহারে নানারকম সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। যথা— (i) ভূ-নিম্নের জল

অতিরিক্ত বেশি পরিমাণে তোলার ফলে বড় বড় গাছের ক্ষতি হয় এবং জ্বালানী কাঠের অভাব দেখা যায়।

(ii) গভীর নলকুপ জলে নানা রকম ক্ষার এবং লৌহ প্রচুর পরিমাপে থাকায় কৃষিজমি ক্রমশ উর্বরতা হারায়।

(iii) গভীর নলকূপের এলাকায় সমস্ত কূপ গ্রীষ্মকালের আগেই শুকিয়ে যায়, কারণ জলস্তর নেমে যায়। সুতরাং কূপের সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় এখন কম কার্যকর।

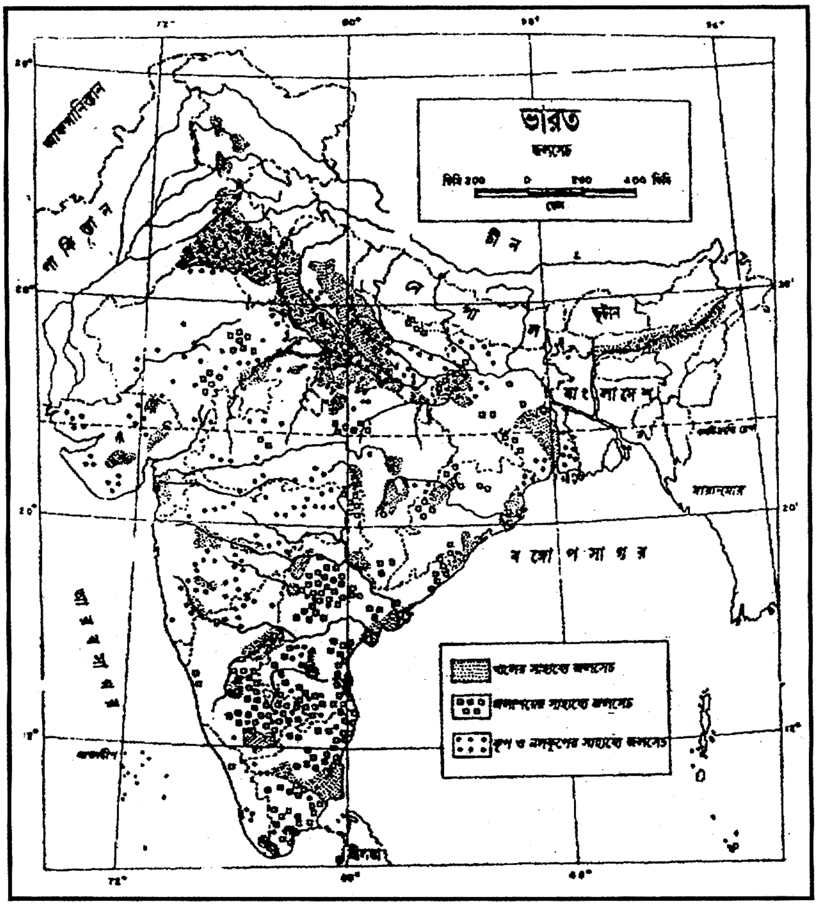

চিত্র 3.64 ঃ ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা

(ii) **পুকুর ও জলাশয়** (Pond & Lake) ঃ মোট সেচসেবিত জমির 8% জমিতে এই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলাধারে বর্ষাকালে জল সঞ্চয় করে প্রয়োজন মত এই জল সেচের কাজে ব্যবহার করার প্রথা ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে বৃহদাকার জলাধারের সৃষ্টি করেতাতে বর্ষাকালে জল সঞ্চয় করে রাখা হয়। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে এই প্রকারের জলসেচ ব্যবস্থা অধিক প্রচলিত। পুকুর থেকে সেচ ব্যবস্থা ভারতের সর্বত্রই কম বেশী পরিমানে দেওয়া হয়। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে মানুষের কাটা ছোট বড় পুকুর এবং কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট জলাশয় থেকে প্রধানত সেচ দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে অসংখ্য স্থানীয় বাঁধ এবং জলাশয় সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলের পুকুরগুলি প্রধানত মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা হয় বলে কেবলমাত্র খরার সময় এগুলি থেকে সেচ দেওয়া হয়। কৃত্রিম জলাশয়গুলি খরার সময় জল থাকে না। ভারতে যত জমিতে জলসেচ দেওয়া হয় তার মধ্যে প্রায় শতকরা 17 ভাগ পুকুর ও জলাশয় থেকে এবং প্রায় শতকরা 10 ভাগ নদী থেকে পাম্প করে সেচ দেওয়া হয়।

(iii) **খাল (Canal) ঃ** মোট সেচসেবিত জমির 38% জমিতে এই পদ্ধতিতে জলসেচ করা হয়। নদী বা জলাধার থেকে খাল কেটে জলসেচের বন্দোবস্ত করার প্রথা ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। ভারতে প্রধানত নদনদী সমৃদ্ধ সমতলভূমিতে খালের সাহায্যে জলসেচ করা সহজসাধ্য বলে অধিকাংশ খাল উত্তর ভারতে অবস্থিত। দক্ষিণাত্যের নদীগুলির ব-দ্বীপ সমভূমিতে, উপকূলবর্তী সমভূমিতে ও নদীউপত্যকার সমভূমিতে স্থানে স্থানে খাল কেটে জলসেচ করার রীতি প্রচলিত আছে। খাল সাধারণত 2 প্রকার ঃ (1) নিত্যবহ ও (2) প্লাবন খাল। নিত্যবহ খালগুলিতে বঝরের সকল ঋতুতে জল থাকে। নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে জল উঁচুতে তুলে নদীর উভয় কূল থেকে খাল কাটা হয়। বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সব খালই নিত্যবহ খাল। প্লাবন খালে বছরের সব সময় জল থাকে না। কারণ, যে নদী থেকে খালে জল আসে, সেই নদীর জল গ্রীষ্মকালে নীচে নেমে যায় বা শুকিয়ে যায়। নদীতে বর্ষাকালে জল বৃদ্ধি পেলে বা প্লাবন হলে এই সকল খালে জল আসে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে এই জাতীয় খাল বিশেষ উপযোগী। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে তিন প্রকারের সেচ খাল ছিল-নিত্যবহ, প্লাবন ও স্টোরেজ, কিন্তু এখন বহুমুখী নদী প্রকল্পের অধীনে সম্মিলিতভাবে সেচ ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছে। এগুলি সাধারণতঃ নিম্নরূপ (1) নদীর উচ্চপ্রবাহে জলসঞ্চয়ের জন্য একাধিক বাঁধ থাকে। সেগুলি থেকে পাম্পের সাহায্যে সেচ দেওয়া হয়। (2) নদীর নিম্নপ্রবাহ অংশে বা ব-দ্বীপ শীর্ষে এক সেচ বাঁধ বা (Barrage) দেওয়া হয়। এটি কেবলমাত্র জল সঞ্চয় করে এবং নদীর জলকে প্রধান এবং নিত্যবহ সেচখালগুলির মধ্যে প্রবাহিত করতে সাহায্য করে। (3) অনেক সময় একই বাঁধ ব্যারেজেরও কাজ করে, যথা—নাঙ্গাল, হিরাকুঁদ প্রভৃতি।

ভারতে কয়েকশত সেচপ্রকল্প রয়েছে, সেগুলি প্রধানত খারিফ ঋতুতেই মাঠে ফসল ফলায়, কিন্তু শতদ্রু নদী হিমালয়ের তুষার ক্ষেত্র থেকে নির্গত হওয়ায় পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের নাঙ্গাল ও শিরহিন্দ সেচখালগুলি শুষ্ক ঋতুতে কৃষিক্ষেত্রে জমিতে সেচের জল যোগায়।

ভারতের প্রধান প্রধান সেচখালসমূহ (Main canals of India) ঃ খালের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা নদী উপত্যকা, ব-দ্বীপ এবং উপকূলের সমভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। কারণ উর্বর, নরম, পলিমাটিতে খাল খনন করা সহজ এবং জমির ঢাল কম থাকায় সকল স্থানে সমানভাবে জল বন্টন করাও সহজ হয়। এই কারণেই সিন্ধু গঙ্গা সমভূমিতে এবং দাক্ষিণাত্যের সকল বড় বড় নদীর নিম্নপ্রবাহ অঞ্চলে খালের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা রয়েছে। পুরানো ও নতুন খাল মিলে ভারতে অনেকগুলো সেচখাল আছে। প্রধান খালগুলি হল—

চিত্র 3.65 ঃ পাঞ্জাব খালসমূহ

(1) **নাঙ্গাল ও শিরহিন্দ খাল (পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থানে) ঃ** এটি ভারতের বৃহত্তম খাল ব্যবস্থা। শিরহিন্দ খাল রূপারের নিকটবর্তী স্থানে শতদ্রু নদী থেকে খনন করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য 6,115 কি.মি। নাঙ্গাল বাঁধ ও রূপার সেচ বাঁধ থেকে খাল 2টি আরম্ভ হয়েছে। এই খালগুলি বস্তুত উত্তর ভারতে ধানের এবং গমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সবুজ বিপ্লব সম্ভবপর করেছে। শিরহিন্দ খালগুলির সেচদান ক্ষমতা প্রায় 7 লক্ষ হেক্টর।

(2) **গঙ্গা ও যমুনা খালগুলি (হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশ)** ঃ দুটি নদী থেকেই উচ্চ ও নিম্ন অববাহিকায় খাল ব্যবস্থা আছে। পশ্চিম যমুনা খাল দিল্লীর নিকট যমুনা নদী থেকে খনন করা হয়েছে, এর দৈর্ঘ্য 3,060 কি.মি.। পূর্ব যমুনা খাল ফৈজাবাদের নিকট যমুনা নদী থেকে কাটা হয়েছে। সাহারানপুর, মজঃফরপুর, ও মীরাট জেলায় এই খালের সাহায্যে জমিতে সেচকার্য চলে।

উত্তরপ্রদেশের উচ্চ গঙ্গা খালটি হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা নদী থেকে খনন করা হয়েছে নিম্নগঙ্গা খালটি বুলন্দশর জেলার নারোরা নিকট গঙ্গা থেকে খনন করা হয়েছে। এই কালগুলি হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কৃষির বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গম, ইক্ষু, ও ধানের চাষ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

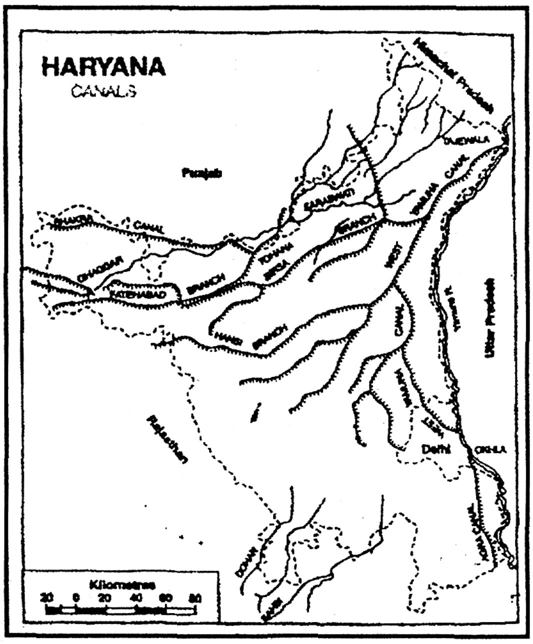

চিত্র 3.66 ঃ হরিয়ানার খালসমূহ

(3) **সারদা-রামগঙ্গা-গণ্ডক ও কোশি খালগুলি (উত্তরপ্রদেশ ও উত্তর বিহার)** ঃ গঙ্গার অনেকগুলি হিমালয়জাত উপনদী থেকে উত্তর প্রদেশের উত্তর ও পূর্ব ভাগে এবং বিহারে সমভূমিতে ব্যাপক অঞ্চলে জলসেচ দেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশের সারদা খাল, রামগঙ্গা কোশী নদী থেকে কাটা রামগঙ্গা খাল, বিহারের কোশী নদী থেকে কাটা কোশী খাল, গণ্ডক নদী থেকে কাটা গণ্ডক খাল— এগুলির সাহায্যে প্রায় সমগ্র মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমিই খালের জল পায়।

(4) **দামোদর-ময়ূরাক্ষী-কংসাবতী খাল** ঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রয় সমগ্র বর্ধমান বিভাগ জুড়ে এই খালগুলি একত্রে মোট 7 লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ যোগায়।

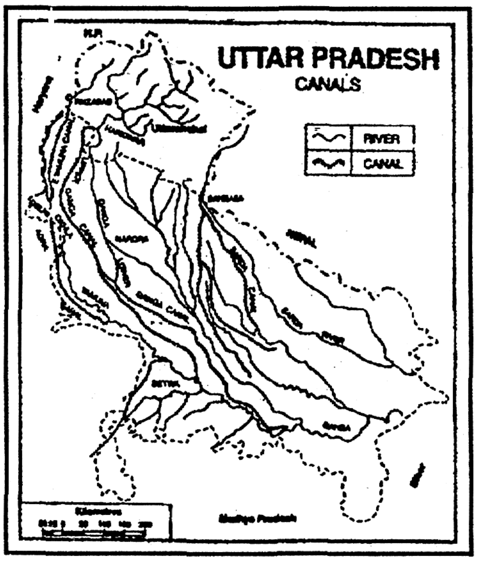

চিত্র 3.67 ঃ উত্তরপ্রদেশের খালসমূহ

(5) **দক্ষিণ ভারতের ব-দ্বীপ খালগুলি** ঃ দাক্ষিণাত্যের উল্লেখযোগ্য খালগুলি হল— গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ খাল, পেরিয়ার নদী থেকে কাটা পেরিয়ার খাল, পেনার-তুঙ্গভদ্রা নদীর সংযোগকারী কুর্ণুল-কুডাপ্পা খাল, কৃষ্ণা নদীর বাকিংহাম খাল ইত্যাদি। কাবেরী নদীর ওপর মেতুরে বাঁধ নির্মাণ করে কাবেরী ব-দ্বীপ খালটি কাটা হয়েছে। এই বাঁধের দৈর্ঘ্য 1,616 মিটার ও উচ্চতা 64 মিটার। কৃষ্ণার নাগার্জুন সাগর বাঁধ ভারতের মধ্যে বিশালতায় সবচেয়ে বড় বাঁধ।

(6) **তাপ্তী বা তাপী নদীর খাল** ঃ গুজরাটের সুউচ্চ উকাই বাঁধে জল সঞ্চয় করে তা কারকাপার ব্যারাজ দ্বার উর্বর তাপ্তী নদী উপত্যকায় খাল দ্বারা জল সরবরাহ করে।

(7) **রাজস্থান খাল**— বিপাশানদীর জল শতদ্রু নদী মারফত রাজস্থান খালে সরবরাহ করা হয় এবং গঙ্গানগর থেকে জয়সলমীরের মরুপ্রান্ত পর্যন্ত ওই বাঁধানো খাল মারফৎ সেচের জল ব্যাপক অঞ্চলে দেওয়া হয়।

এগুলি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চম্বল, তুঙ্গভদ্রা, ভীমা, মাহী প্রভৃতি আরো বহু সংখ্যক নদী থেকে খাল কেটে জলসেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজস্থানে নদী বাঁধ দিয়ে খালের সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। বিভিন্ন পরিকল্পনায় গৃহীত **প্রধান প্রধান সেচ প্রকল্পগুলির** নাম হল—

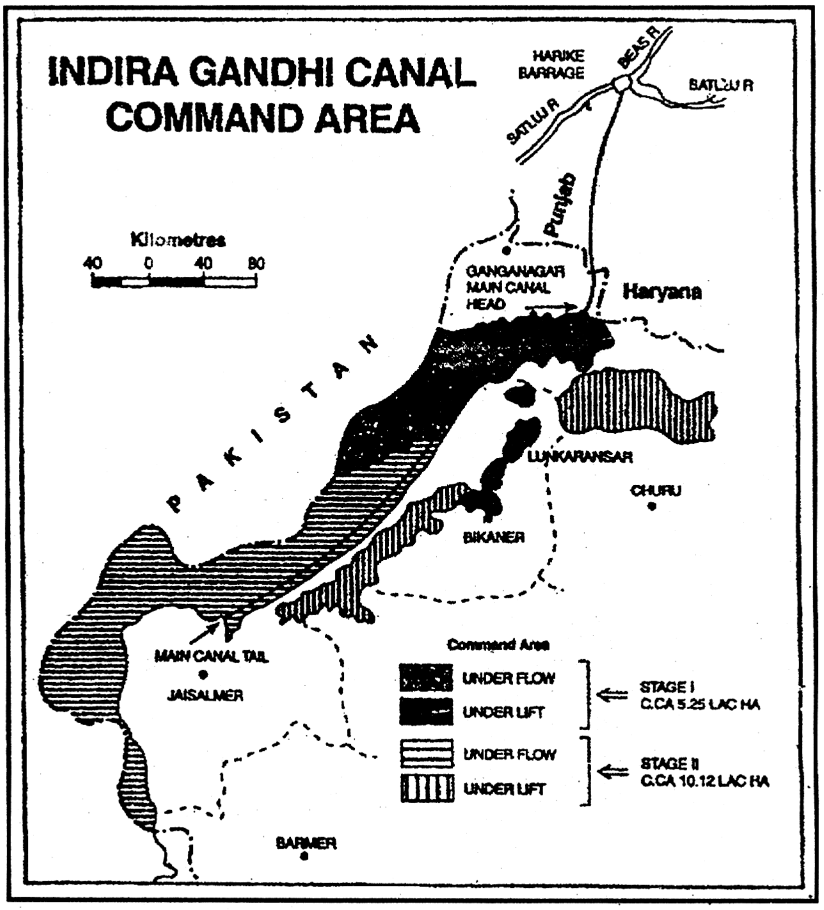

চিত্র 3.68 ঃ রাজস্থান খাল

(1) বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের দামোদর পরিকল্পনা।

(2) হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য শতদ্রু নদীর ওপর ভাকরা-নাঙ্গল বাঁধ ও গোবিন্দ সাগর জলাধার ও বিপাশা প্রকল্প।

(3) ওড়িশার মহানদী প্রকল্প ও হীরাকুঁদ বাঁধ।

(4) অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা নদীর বাঁধ ও নাগার্জুন সাগর জলাধার।

(5) তামিলনাড়ুর কোন্ডো নদীপ্রকল্প।

(6) কর্ণাটকের তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প।

(7) মহারাষ্ট্রের কয়না নদী প্রকল্প ও গিরনা নদী প্রকল্প।

(8) মধ্যপ্রদেশের চম্বল নদীর বাঁধ ও গান্ধীসাগর জলাধার।

(9) রাজস্থানের চম্বল নদীর 2টি বাঁধ ও রানাপ্রতাপসাগর ও জওহর সাগর জলাধার, রাজস্থান খাল প্রকল্প।

(10) গুজরাটের তাপ্তী নদীর ওপর কাকরাপাড় বাঁধ ও মাহীপ্রকল্প

(11) উত্তর প্রদেশের রামগঙ্গা প্রকল্প

(12) বিহারের গণ্ডক ও কুশী নদী প্রকল্প

(13) পশ্চিমবঙ্গের ময়ুরাক্ষী ও কংসাবতী প্রকল্প ইত্যাদি।

খালের সুবিধা ও অসুবিধা ঃ

সুবিধা —

(a) উত্তর ভারতের নদনদী হিমালয়ের তুষারগলা জলে সৃষ্ট। ফলে তারা সারা বছরই পুষ্ট থাকে।

(b) ভারতের সমভূমি অঞ্চলের ঢাল কম হওয়ায় খাল খনন করা খুব সহজ ও কম ব্যয়সাধ্য।

(c) প্রয়োজনের সময় নিত্যবাহী খাল থেকে সেচের জল পাওয়া যায়। ফলে ফসলের উৎপাদন বাড়ে।

(d) নদীবাহিত খালে পলিও ও প্রবেশ করে। এই পলি কৃষিজমিতে জমে ও জমির উর্বরতা বাড়ায়।

(e) কিছু কিছু খাল বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অঙ্গ। তাই সস্তায় জলসেচ পাওয়া যায়।

(f) যদিও প্রারম্ভিক অবস্থায় খাল খনন করা ব্যয়সাধ্য, তবুও ভবিষ্যতে তা থেকে প্রচুর সুবিধা পাওয়া যায় বলে তা আর ব্যয়সাধ্য মনে হয় না।

অসুবিধা —

(a) খাল সংলগ্ন মাটি জল শোষণ করে। ফলে খালের আশেপাশে জল জমে।

(b) কৃষিক্ষেতে অতিরিক্ত জলসেচের ফলে উত্তরপ্রদেশ (পঃ) এবং পাঞ্জাবের এক বড় অংশ মাটি 'খার' মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে।

(c) খালের কাছাকাছি জলজায়গা মশার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়। ফলে ব্যাপক ম্যালেরিয়া ছড়ায়।

(d) বর্ষাকালে অনেক খাল স্ফীত হয়ে আশেপাশের এলাকায় বন্যা ঘটায়।

(e) খালের সাহায্যে জলসেচ সমতল এলাকার পক্ষে উপযুক্ত।

3.2.5 শ্রম শিল্প (Major Industries)

❑ **ভূমিকা**

প্রকৃতি থেকে যখন প্রত্যক্ষভাবে কৃষিজ, খনিজ ও বনজ সম্পদ সংগৃহিত হয় তখন তাকে বলে প্রাথমিক উৎপাদন। কোনো প্রাথমিক উৎপাদনকে যন্ত্রের সাহায্যে রূপান্তরিত করে আরও বেশী কার্যকর ও মূল্যবান বস্তুতে পরিণত করা যায়। কোনো কোনো প্রাকৃতিক পদার্থ সংগ্রহ করে রূপান্তরিত না করে ব্যবহারের উপযোগী করা যায় না আবার রূপান্তরের ফলে তা থেকে বহুবিধ উপযোগিতাও পাওয়া যায়। এ কারনেই তুলা থেকে বস্ত্র তৈরী, আখ থেকে চিনি, কাষ্টমণ্ড থেকে কাগজ এবং খনিজ তেল থেকে পেট্রো-রসায়ন জাত পদার্থ পাওয়া যায়। প্রাথমিক উৎপন্ন পদার্থকে রূপান্তরিত করে আরও অধিক কার্যকর ও মূল্যবান বস্তু তৈরী করা যায়। অন্য কথায় বলা যায় শ্রমশিল্প হোলো প্রাকৃতিক পদার্থকে বা বিভিন্ন সম্পদকে সংগ্রহ করা, একত্রিত করা ও উপযোগী পদার্থে পরিণত করা।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেকা যায় যে মানব সভ্যতা বিকাশের সময় থেকে এখানে শিল্পের সূচনা। ভারতের ঢাকাই মস্‌লিন, বালুচরি শাড়ি, মুর্শিদাবাদের রেশমবস্ত্র, ভারতীয় শিল্পে ঐতিহ্যের সাক্ষ্য। এছাড়া কুতুবমিনারের কাছে লৌহস্তম্ভটি প্রমান করে প্রাচীনকালেও ভারতে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের দর ছিল। কিন্তু কয়লা ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিস্কারের ফলে ও ইংরাজ শাসনকালে এই সব শিল্পের ঐতিহ্য নষ্ট হয়। এই সময়েই হয় শিল্প বিপ্লবের সূচনা যা ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে শিল্প বিকাশের চরম শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়। ইংরেজরা ভারতে শিল্প বিকাশের চেষ্টা করলেও তা সর্বমুখী ছিল না। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ এদেশীয় কাঁচামাল নিজ দেশে নিয়ে যাওয়া ও অপরিকল্পিত ভাবে ও সীমিতভাবে কিছু শিল্প গড়ে তোলা।

ভারতে আধুনিক বৃহৎ শিল্পের সূচনা হয় 1830 সালে। এই সময়ে ভারতে স্থাপিত হয় কার্পাসবয়ন শিল্প, পাটশিল্প। প্রথম বিশ্বযুধের সময়ে ভারতে অন্যান্য যে শিল্পগুলি স্থাপিত হয় তা হচ্ছে পশম বস্ত্র বয়ন, কাগজ। প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয় বন্দর শহর যেমন মুম্বাই, কোলকাতা, ও চেন্নাই এ। এই অবস্থান প্রধানতঃ বৃটিশদের আমদানি-রপ্তানিকে গুরুত্ব দেওয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রধানতঃ কানপুরে শিল্প স্থাপিত হয় যেখানে প্রধানতঃ সামরিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হয়। প্রথম বিশ্বযুধের সময়ে যে শিল্পগুলির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হোলো লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট, শর্করা, কাগজ ও অন্যান্য ধাতব শিল্প। 1938–39 সালে ভারতীয় কার্পাস বয়ন শিল্পের বোম্বাই অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দিকে বিকেন্দ্রীভবন ঘটে। মাত্র 17.5 শতাংশ শিল্প বোম্বাই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকে ও এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে ও বিশ্বের বাজারে তা চতুর্থ স্থানের অধিকারী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুধের সময় ভারতীয় শিল্পের নানা সমস্যা দেখা দেয় কারণ ভারত যুধে জড়িয়ে পড়ে। তবে যুধের প্রভাব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি এবং ভারত শিল্পে আবার উন্নতি করতে শুরু করে কিন্তু যুধ পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন যথেষ্ট হারে কমে যায়। এর মূল কারণ দেশে চাহিদা কমে যাওয়া, শ্রমিক অসন্তোষ, যন্ত্রপাতির সমস্যা, ও পরিবহনের সমস্যা। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নতুন করে শিল্পের ক্ষেত্রে সমস্যা শুরু হয়। পাকিস্তানের অধিকারে প্রায় 40% কার্পাস ও 81% পাট শিল্প চলে যায়। তাছাড়া ভারতের ঐ শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারও নষ্ট হয় ও ভারত দক্ষ শ্রমিকের সমস্যাতেও ভুগতে থাকে কারণ বহু দক্ষ শ্রমিক পাকিস্তানে অভিবাসিত হয়। তবে ভারতবর্ষ এই সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে ওঠে 1948-যে যখন শুল্কের বোঝা কমানো, সরকারী সাহায্য ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং বলা যায় 1948-য়ের শিল্পনীতিই ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের বিরাট পদক্ষেপ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1951–56) ছিল কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলে ভোগ্য ও পন্য শিল্পের উন্নতি

ঘটে কিন্তু ভারী শিল্পের ততটা উন্নতি এই সময়ে হয়নি। এই পরিকল্পনা কালে মূলত সার (সিন্ধ্রি), রেলইঞ্জিন (চিত্তরঞ্জন), রেলের কামরা (পেরাম্বুর), পেনিসিলিন (প্রিম্প্রি, পুণে), ঘড়ি ও যন্ত্রপাতি (বাঙ্গালোর), খবর ছাপবার কাগজ (নেপানগর), টেলিফোন তার (রূপনারায়নপুর), কীটনাশক ঔষধ (দিল্লী) ইত্যাদি স্থাপিত হওয়ায় ভারতে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন ঘটে। এই সময়ে কয়লা, খনিজ তেল, লৌহ ইস্পাত, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। শিল্পোন্নয়নের সুচকও যথেষ্ট বৃধ্বি পায়। এই পরিকল্পনাকালে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ ছিল 94 কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী (1956–61) পরিকল্পনার সময়কালে শিল্পের উন্নতির গতি বৃধ্বি পায় ও শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রৌরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে 70 লক্ষ মেঃ টন ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি নতুন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা সকারী মালিকানায় স্থাপিত হয়। বেসরকারী পরিচালনাধীন জামসেদপুর ও বার্নপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানার উৎপাদনও প্রায় দ্বিগুন বৃধ্বি করা হয়। সিমেন্ট ও কাগজ প্রস্তুত যন্ত্র স্থাপন ও ভূপালে ভারী ইলেকট্রনিক্স ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রাঁচিতে ভারী শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেসিনটুল নির্মাণ কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয় এই পরিকল্পনার সময়কালেই। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন কষ্টিক সোডা, রাসায়নিক সার, সোডা অ্যাশ, সালফিউরিক অ্যাসিড, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট, তাছাড়া পেনিসিলিন, বিস্ফোরক পদার্থ, পলিথিন, রং ইত্যাদির উৎপাদন শুরু হয়। নাঙ্গাল ও রৌরকেল্লাতে দুটি নতুন সার কারখানা স্থাপিত হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1961–66) প্রধানত লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক পদার্থ, শক্তি উৎপাদন ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের প্রসারের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোটামুটি চার বছর শিল্প ব্যবস্থায় উন্নতি হলেও পরবর্তী সময়ে তাতে কিছুটা ভাঁটা পড়ে ও নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়, কারণ পাক ভারত যুধ্ব, 65 খ্রিস্টাব্দের খরা, কাঁচামালের অভাব, ঋণ বন্ধ হওয়া। এই পরিকল্পনার সময়কালে ইস্পাত ও সার উৎপাদন কম হলেও বস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতি, অ্যালুমিনিয়াম, মোটরগাড়ি, মেসিনটুল, চিনি, পাট শিল্প, শক্তি চালিত পাম্প, ডিজেল ইঞ্জিন, খনিজ তেলের উপজাত দ্রব্যের উৎপাদন নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে নতুন নতুন শিল্পের আবির্ভাব ভবিষ্যত শিল্প কাঠামো সুদৃঢ় করেছিল।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য "শিল্পোন্নতি স্থায়ী করা"। "প্রয়োজনভিত্তিক" শিল্প ব্যবস্থা গ্রহন করা হলেও শিল্পের প্রসার কিন্তু আশানুরূপ হয়নি। কিছু কিছু শিল্প যেমন তৈল শোধনাগারজাত দ্রব্য, ইলেকট্রনিক, ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জম ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা গেলেও লৌহ ও ইস্পাত, সার, কয়লা, অধাতব খনিজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি অর্থাৎ উৎপাদন আশানুরূপ নয়। মনে করা হয় কাঁচামালের অভাব, সাংগঠনিক ত্রুটি, ও বিদ্যুৎ সংকট এর জন্য দায়ী।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মূল গুরুত্ব দেওয়া হয় শিল্প উন্নতির ক্ষেত্রে। এ কারণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যেমন (ক) লৌহ ইস্পাত, সার, কয়লা, খনিজ তেল, সংকর ধাতু, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির আরও উন্নতি করা। (খ) সাধারণ লোক ব্যবহার করে এমন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো (ঘ) শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানি বাড়াবার চেষ্টা করা (ঙ) যেসমস্ত অঞ্চল শিল্পে অনুন্নত সেখানে শিল্প সম্প্রসারণের চেষ্টা করা। এই সময়ে বার্ষিক গড় উন্নয়ন 8.21 শতাংশ। বেসরকারী ক্ষেত্রকে এই পরিকল্পনাকালে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সালেম, বিজয়নগর ও বিশাখাপত্তনম এর কারখানাগুলির উৎপাদন বাড়াবার লক্ষ্য স্থির হয়। SAIL প্রতিষ্ঠা এই সময়েই হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া সেই পরিকল্পনার সার্থ রূপায়ন ও উন্নতির দিকে যেগুলি তিন দশক

আগে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে গৃহিত হয়েছিল। 1950–80 এই সময়কালকে শিল্পায়নের প্রথম ধাপ হিসেবে গন্য করা হয় আর দ্বিতীয় ধাপের শুরু ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে। সুতরাং এই সময় থেকে সরকারী, সমবায় ও বেসরকারী শিল্পোদ্যোগকেও উৎসাহ প্রদান করা হয়। শিল্পহীন জেলা সমূহে শিল্পস্থাপন ও বিভিন্ন শিল্প কারখানাগুলির অধিক উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনাখাতে মোট ব্যয় হয় 15,220 কোটি টাকা। তবুও শিল্পোয়নের বার্ষিক হার ছিল শতকরা 5.5 ভাগ। এই পরিকল্পনাকালে কোনো কোনো শিল্পের উৎপাদন কমে গেলেও (যেমন ইস্পাত, সিমেন্ট, বস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, রেলওয়াগন তৈরী) কিছু কিছু শিল্প যেমন যাত্রীবাহী গাড়ী, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, মেসিনটুল এদের উৎপাদন বাড়ে।

সপ্তম পরিকল্পনায় (1985–1990) শিল্পোয়নের বার্ষিক হার 8.7 লক্ষ্য মাত্রার প্রায় কাছাকাছি অর্থাৎ 8.5 শতাংশে পৌঁছায়। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল কারিগরি উন্নতি, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, সর্বসাধারনের ব্যবহার্য্য দ্রব্যের গুনমান বজায় রাখা ও সরবরাহ ও মূল্য নিশ্চিত করা, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, স্বয়ম্ভরতা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। এই সময়ে শিল্পক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় ছিল 19,708 কোটি টাকা।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1992–97) কাল ছিল সংস্কারের যুগ। ফলে শিল্পের বিকাশ ছিল কম, এমনকি শিল্পে বন্ধ দশা এসেছিল। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2002-07) এখনও চলছে। এই পরিকল্পনায় শিল্পের বিকাশ দশ শতাংশ ধরা হয়েছে।

শিল্পস্থাপনে প্রভাববিস্তারকারী কারণসমূহ ঃ কৃষি ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি হলেও শিল্প কিন্তু এদেশে অনাদৃত ছিল না। শিল্প প্রধানতঃ এদেশে কুটীর শিল্পের আকারেই উন্নতি করেছিল। যন্ত্রশিল্প প্রাচীনকালে খুব বেশী বিকাশ লাভ করেনি।

বিভিন্ন শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে নানা কারণ যুক্ত থাকলেও যে কারণগুলিকে মুখ্য গুরুত্ব দেওয়া হয় সেগুলি হলো কাঁচামালের প্রাপ্তি, শক্তি সরবরাহ, জল, শ্রমিক, বাজার, চাহিদা ও পরিবহন ব্যবস্থা। এই ভৌগোলিক কারণগুলির গুরুত্ব শিল্প স্থাপনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানে ঐতিহাসিক, মানবিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক প্রকৃতি কিন্তু তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। সুতরাং শিল্প স্থাপনের কারণগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে।

(ক) ভৌগোলিক কারণ

(খ) অ-ভৌগোলিক কারণ / অর্থনৈতিক কারণ।

❑ ভৌগোলিক কারণ

নিম্নলিখিত ভৌগোলিক কারণগুলি ভারতে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যেমন—

1. **কাঁচামাল ঃ** কাঁচামালের প্রাপ্তি, যোগান, পরিবহন খরচ ও কাঁচামালের প্রকৃতি শ্রমশিল্পের অবস্থানকে প্রভাবিত করে। কাঁচামালের প্রকৃতি, কাঁচামালের মূল্য, পচনশীলতা, বিকল্প কাঁচামালের ব্যবহার, কাঁচামালের পরিমান ইত্যাদির উপরও শিল্পের অবস্থান নির্ভর করে। যে সমস্ত কাঁচামাল হীনভার প্রকৃতির যেমন চিনি শিল্পের কাঁচামাল ইক্ষু, তা কাঁচামাল এর উৎসের কাছাকাছি গড়ে ওঠে। উত্তর প্রদেশে চিনি শিল্পের অবস্থান তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কারণ হীনতার অবিশুদ্ধ কাঁচামালের ক্ষেত্রে উৎস এর কাছাকাছি শিল্প গড়ে উঠলে তার পরিবহন ব্যয় অল্প হয়। আর উৎপাদন ব্যয়ও নিয়ন্ত্রনের মধ্যেই থাকে।

পচনশীল কাঁচামাল এর ক্ষেত্রে শিল্পের অবস্থান কাঁচামাল-প্রাপ্তি কেন্দ্রীক হয়। যেমন দোহশিল্প। আবার ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প কাঁচামাল প্রাপ্ত কেন্দ্রেই গড়ে ওঠে। পশ্চিম বাংলার মালদায় এ কারণেই ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প দ্রুত (যেমন—জ্যাম, জেলি, আচার, সস, আমসত্ত্ব, স্কোয়াশ।) গড়ে উঠছে।

আবার যে সমস্ত কাঁচামালের দাম বেশী অর্থাৎ দামী কাঁচামাল নির্ভর শিল্প বাজার বা কাঁচামালের উৎসের

কাছেও গড়ে উঠতে পারে। ভারতের পশম বয়ন শিল্পের অবস্থান এ কারনেই প্রধানতঃ উত্তর ভারতে।

বিকল্প কাঁচামাল প্রাপ্তি শিল্প অবস্থান এর উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বর্তমানে লৌহ আকরিকের বিকল্প স্ক্র্যাপ। সুতরাং লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার সময় লৌহ আকরিক, স্ক্র্যাপ কোনটি ব্যবহার করলে শিল্প গড়ে ওঠা লাভজনক হবে তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

বিভিন্ন শিল্পে একাধিক কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে তুলতে আকরিক লোহা, কোক কয়লা, চুনাপাথর, জল, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি কাঁচামালের পরিমান ও খরচ বিবেচনা করে, যেটির মূল্য সবচেয়ে বেশি, তার প্রাপ্তি অঞ্চলে শিল্প গড়ে তোলা লাভজনক হয়।

2. **শক্তি সম্পদ ঃ** শিল্প গড়ে তুলবার অপরিহার্য উপাদান শক্তি। শক্তির উৎস কয়লা, খনিজ তেল, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি। তবে কয়লাকেই শক্তির প্রধান উৎস ধরা হয়। ভারতের বোকারে, দুর্গাপুর, ভিলাই স্থানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থানের প্রধান কারণ শক্তি সম্পদ কয়লার নৈকট্য।

তবে বর্তমানে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও জলবিদ্যুৎ প্রভৃতিও শিল্পের অবস্থানকে প্রভাবিত করে থাকে। কার্পাস বয়ন শিল্পে বেশি পরিমান বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় বলে, এবত বিদ্যুৎ তারের মাধ্যমে সহজেই পরিবহন করা যায় বলে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলেই এই শিল্প গড়ে উঠেছে। কোরবার ও রেনুকুটের অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন, ক্ষেরির তামা গলানোর কারখানা, নাঙ্গালের সার তৈরীর কারখানা সহজ শক্তি-সরবরাহের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

3. **জলবায়ু ঃ** প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিল্পের অবস্থানের উপর জলবায়ু প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উষ্ম ও আর্দ্র জলবায়ুতে শ্রমিকের কর্মশক্তি কমে যায় ও সেখানে বিশেষ শিল্প গড়ে ওঠে না। কিন্তু নাতিশীতোষ্ম অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর ও সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে শ্রমিকের কর্মশক্তি বাড়ে। এ কারনেই দেখাযায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তথা ভারতেও বেশির ভাগ শিল্প মৃদুভাবাপন্ন জলবায়ুতে গড়ে উঠেছে। আবার জলবায়ু তারতম্যেও বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন ভারতের বেশিরভাগ কার্পাস বয়ন শিল্প পশ্চিমাঞ্চলে আর্দ্র জলবায়ুতে গড়ে উঠেছে আবার পশম বয়ন শিল্প ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অর্থাৎ উত্তরের পাতিত অঞ্চলেই প্রসার লাভ করেছে।

4. **জলসম্পদ ঃ** শিল্প গড়ে তুলতে জল অপরিহার্য। একারণে বহু শিল্প নদী, খাল, হ্রদের ধারে গড়ে ওঠে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বয়ন শিল্প ও রাসায়নিক শিল্পকে সচল রাখতে প্রচুর জলের প্রয়োজন। যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে 30,000 লিঃ জল দরকার প্রতি টন উৎপাদনে আবার 1 M.W. তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে 36,400 লিঃ জলের প্রায়োজন হয়।

চুল্লী ঠাণ্ডা করা, জ্বালানী কয়লা, কাঁচামাল প্রভৃতি প্রসেসিং করতে যেমন জলের প্রয়োজন সাথে সাথে শিল্প শ্রমিকদের পানীয় জল সরবরাহের জন্যও জলের প্রয়োজন। এ কারণে দেখা যায় ভারতের বেশির ভাগ বৃহদায়তন শিল্পগুলি নদীর ধারে গড়ে উঠেছে।

5. **শিল্প শ্রমিক ঃ** কারও পক্ষেই এই সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিল্প গঠনে শ্রমিক অপরিহার্য। শ্রমিকের যোগান এর গুরুত্ব দুইদিকে বিচার্য।

i. শিল্পে অধিক সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন।

ii. আবার দক্ষ ও কারীগরি জ্ঞান সম্পন্ন শ্রমিকের দরকার।

Estall এবং Bucchanan 1961 সালে দেখিয়েছেন যে শ্রমিকের জন্য ব্যয় কিভাবে বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। বয়ন শিল্পে এই ব্যয় 62 শতাংশ আবার রাসায়নিক শিল্পে 29 শতাংশ।

আমাদের দেশে শিল্পে আধুনিকীকরণ হলেও এখনও প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষতঃ কৃষি ভিত্তিক শিল্প গুলিতে এখনও প্রচুর পরিমান শ্রমিকের প্রয়োজন রয়েছে।

6. **Site বা স্থান ঃ** শিল্প গড়ে ওঠার জন্য Site বা জমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তু বা জমিটি এমন হওয়া উচিত যাতে তা সমতল ও সমস্ত রকম পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাছাড়া বড় কারখানা গড়ে তুলতে বেশি ভূমির প্রয়োজন হয়। তবে বর্তমানে গ্রামীন ক্ষেত্রে শিল্প গড়ে তোলা হচ্ছে বেশি পরিমান জমি একসাথে পাওয়ার সুবিধার্থে।

❑ অর্থনৈতিক (Non-Geographical) কারণ

বর্তমানে উন্নত কারীগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সহায়তায় বিকল্প কাঁচামালও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পরিবহন ব্যবস্থার উনতির ফলে শ্রমিকের গম্যতা (Mobility) ও বাড়ায় ও বিদ্যুৎ বহুদূর পরিবহনের সুবিধার্থে এখন ভৌগোলিক কারণগুলির গুরুত্ব শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অনেকটা কমেছে। অ-ভৌগোলিক কারণগুলির গুরুত্ব শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অনেকটা কমেছে। অ-ভোগোলিক বা (Non-Geographical) কারণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হোল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ। বর্তমানে শিল্প স্থাপনে এই বিষয়গুলির গুরুত্ব অত্যাধিক। নিচে বিভিন্ন অ-ভৌগোলিক কারণগুলি আলোচনা করা হোল—

1. **মূলধন ঃ** বর্তমান শিল্প মূলধন নিবিড় শিল্প। ধনবান লোকেদের বেশির ভাগই শহর অঞ্চলের বাসিন্দা। দিল্লী, বোম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা ইত্যাদি শহরে বহু ধনবান ব্যক্তিদের বসবাস হওয়ায় শিল্পের প্রতি বিনিয়োগও বেশী। তাছাড়া মূলধন সৃষ্টির পরিবেশ থাকাও জরুরী।

2. **সরকারী নীতি ঃ** সরকারী কার্যক্রম বা নীতি যেমন ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ অঞ্চলে শিল্প গড়ে তোলা হবে, শিল্পের একদেশীভবন না ঘটিয়ে তার বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শিল্প স্থাপনে যেন বৈষম্য না থাকে তা দেকা উচিত। তাছাড়া জল ও বায়ু দূষণ রোধ করার জন্য একটি অঞ্চলে শিল্পের একদেশতা না ঘটানো শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে ভারতে একটি অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোলার প্রবনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে জল ও বায়ু দূযণ-এর পরিমাণও বেড়েছে। পঃ বাংলার হলদিয়া এর জ্বলন্ত উদাহরণ। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভার সরকারের শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই লক্ষ্যনীয়। দক্ষিণভারতে দেখা যায় পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য গ্রামীন ক্ষেত্রেও নতুন নতুন শিল্পক্ষেত্র গড়ে তোলার উপর সরকারী তরফে জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সরকারী নীতিতে বলা হয়েছে যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, এয়ারক্রাফ্ট, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিল্প ভারতের যে কোনো ক্ষেত্রে গড়ে তোলা যাবে। সুতরাং আমাদের চিরাচরিত ধারণা ভোগোলিক সুবিধাযুক্ত স্থানেই বিভিন্ন কারখানা গড়ে উঠবে, ভারত সরকারের নীতি তার বিরোধী। একারনে মথুরাতে তৈল শোধনাগার কিংবা কাপুরথালাতে কোচ তৈরীর কারখানা কিংবা জগদীশপুরে সার তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে।

3. **শিল্পের মন্থরতা বা ধীরগামিতা ঃ** শিল্প তার মূল বা প্রাচীন ক্ষেত্রেই গড়ে উঠবে, এই ধারনা এখন অনেকটাই ভ্রান্ত। একেই বলা হয় ধীরগামীতা। এই ধীরগামী কখনও শিল্পের ধীরগামীতা, কখনও বা ভৌগোলিক ধীরগামীতা, আলিগড়ের Lock বা তালা শিল্প তারই উদাহরণ।

4. **যোগ্য সংগঠন ঃ** বর্তমান শিল্প কারখানা সচ্ছলভাবে চালানোর জন্য যোগ্য ও উদ্যমী সংগঠন প্রয়োজন। অযোগ্য সংগঠন মূলধনের অপচয় ঘটায়, সাথে সাথে শিল্প কারখানা মূলধনের সমস্যায় ভুগতে থাকে ও ফলশ্রুতিতে অনেকক্ষেত্রে শিল্প কারখানা নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া অযোগ্য সংগঠন কারখানার শ্রমিকদের ঠিক ভাব চালনা করতে না পারায় অনেক সময় শ্রমিক অসন্তোস ঘটে। এই রকম অবস্থা শিল্পের ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকর। তাছাড়া শ্রমিক ধর্মঘট ও লক আউট কারখানাকে বন্ধ হওয়ার পথে ঠেলে দেয়। সুতরাং বলা যায় শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যোগ্য সংগঠন ও যোগ্য পরিচালনা অপরিহার্য।

5. **ব্যাঙ্কিংয়ের সুবিধা ঃ** একটি শিল্প কারখানা গড়ে উঠলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়। সে কারণে যে অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা উন্নত সেখানেই শিল্প কারখানা গড়ে ওঠা সম্ভব।

6. **বীমা ঃ** শিল্প কারখানায় যন্ত্রপাতি এমনকি মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা সবসময়েই থাকে। সুতরাং বীমার সুবিধাযুক্ত অঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠা জরুরী।

7. **পরিবহন ঃ** জল অথবা স্থল পরিবহন শিল্পস্থাপনে অপরিহার্য্য কারণ পরিবহন ব্যবস্থাই কাঁচামাল একত্রিত করা ও শিল্পজাত দ্রব্য বাজার জাত করার প্রধান হাতিয়ার। ভারতের রেলপথের বিকাশ বন্দর শহরগুলিকে পশ্চাৎভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এ কারণেই কোলকাতা, বোম্বাই ও চেন্নাই বন্দরের আশেপাশে বহু শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়েছে। অল্প-দূরত্বে অল্প পরিমান মাল পরিবহন করে শিল্পক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সড়ক পরিবহন (যেমন লরি, টেম্পো, ট্রলিভ্যান, রিক্সা) অনেক কম খরচ সাপেক্ষ। ভারতে উত্তর প্রদেশে চিনি বা শর্করা শিল্পে এই ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা প্রচলিত। আবার ভারী পন্যদ্রব্য বা কাঁচামাল পরিবহনের জন্য রেল পরিবহন বা জলপথ পরিবহন যথেষ্ট সস্তা। অল্প দূরত্বের জন্য রেল পরিবহনের খরচ বেশি পড়ে যায়। সুতরাং শিল্প এমন ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয় যেখানে সস্তা পরিবহনের সুযোগ তথা সমস্ত রকম পরিবহনের সুযোগ বেশি।

9. **বাজার ঃ** যতক্ষন পর্যন্ত না শিল্পজাত দ্রব্য বাজারজাত করা যায়, ততক্ষন শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের কোনো মূল্যই থাকে না। সেকারণেই বাজারের নিকটবর্তিতা শিল্পস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে বাজারের নিকটবর্তিতা ও নিকটবর্তী লোকজনের ক্রয় ক্ষমতা শিল্প স্থাপনকে প্রভাবিত করে। বোম্বাই, দিল্লী, কোলকাতা শহরের আশেপাশে একারণেই বহু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। বাজারের নিকটবর্তী স্থানে শিল্প গড়ে উঠলে, পরিবহন খরচ কম হয়, সাথে সাথে শিল্পজাত দ্রব্যের দামও কম হয়। পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজারের কাছে শিল্প গড়ে ওঠা একান্ত জরুরী। তাছাড়া যে সমস্ত শিল্পের কাঁচামাল অবিশুদ্ধ, সে জাতীয় শিল্পগুলি বাজারের কাছে গড়ে উঠলে অনেক বেশি লাভ জনক হয়। আবার ফ্যাশন নির্ভর শিল্প বাজারের কাছাকাছি গড়ে ওঠে।

শিল্পের শ্রেণিবিভাগ ঃ শিল্পকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নীচের সারণিতে তা দেখানো হোল—

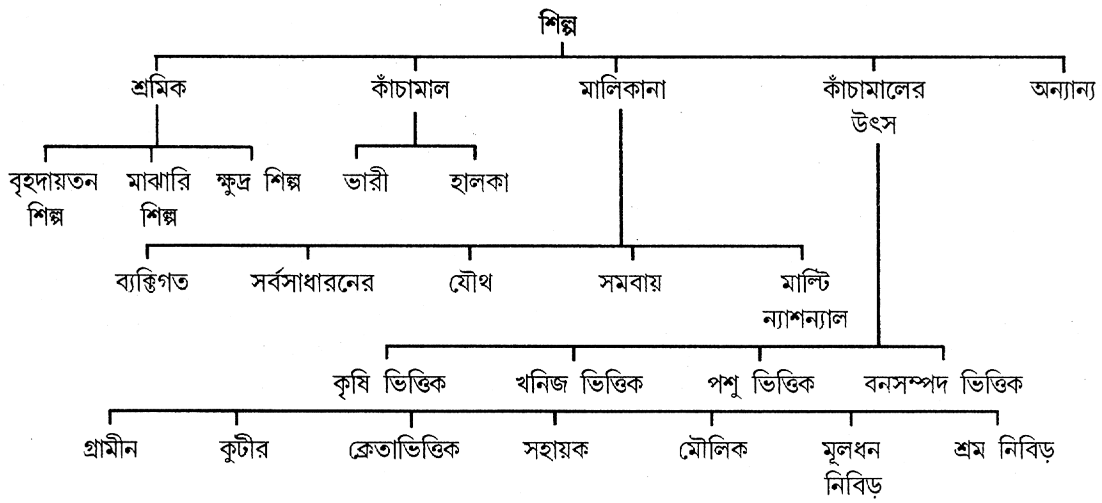

❑ পাট শিল্প ❑

ভারতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বয়ন শিল্প পাট। এই শিল্প বাংলার কুটীর শিল্প হিসেবে গড়ে উঠলেও, বৃহদাকার শিল্প হিসাবে এর বিকাশ ঘটে 1855 সালে কোলকাতার কাছে রিষড়াতে এবং 1859 সালে এটি শক্তিচালিত কারখানা হয় এবং ক্রমশঃ তার উন্নতি ঘটতে থাকে। এই শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিযোগ্য ফলে এর দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। 1884 সালে পাটকলের সংখ্যা ছিল 24। কিন্তু 1918 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 76-য়ে ও 1947 এর সংখ্যা হয় 112। কিন্তু 1947 সালের দেশভাগ এই শিল্পকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, কারণ 81 শতাংশ উৎপাদন বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) চলে যায়। কাঁচা পাটের অভাবে অনেক পাটকল রুগ্ন হয়ে পরে ও অনেকগুলি বন্ধ হয়ে যায়। তবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকা, পঃ বাংলার তরাই অঞ্চল ও পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে পাটচাষ করায় ও উৎপাদন বাড়ায় এই সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়।

ভারতে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে খুবই বৈচিত্র্য রয়েছে। 1950–51 সালে ভারতে এর উৎপাদন ছিল 837 হাজার টন কিন্তু 1990–91 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 1430 হাজার টনে। সুতরাং দেখা যায় প্রায় 40 বছরে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে 70.85 শতাংশ। কিন্তু 1991–92 সালে তা কমে হয় 1378 হাজার টন ও 1992–93 সালে হয় 1310 হাজার টন। তবে 1993–94 সালে তা বেড়ে 1451 হাজার টন হলেও পরবর্তী সময়ে আবার কমতে থাকে।

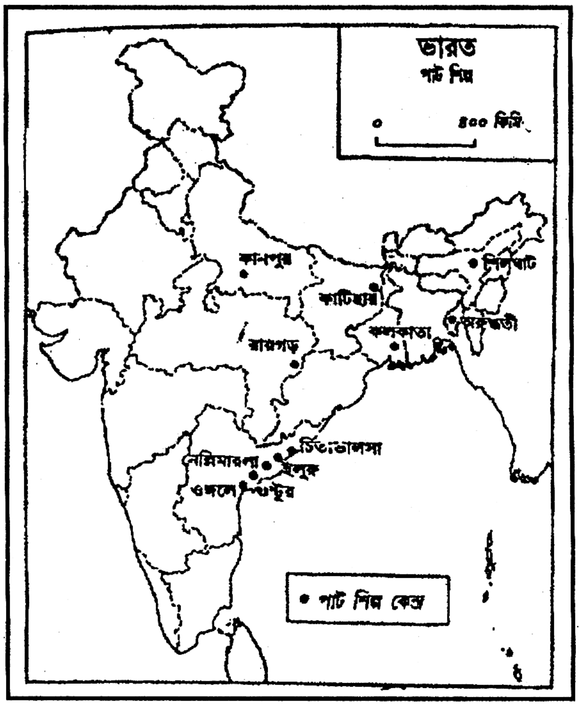

চিত্র 3.69 ঃ ভারতের পাটশিল্পকেন্দ্র

পাটশিল্পের অবস্থান ঃ পশ্চিম বাংলায় সবচেয়ে বেশী পাটশিল্প কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই রাজ্যে 56টি পাটকল ও 41.261 বয়ন কল (Looms) কেন্দ্রীভূত হয়েছে যা দেশের মোট সংখ্যার 76 ও 80 শতাংশ। ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের 84 শতাংশ পঃবাংলায় উৎপাদিত হয়। পঃবাংলার বেশিরভাগ পাটকল কলকাতা থেকে 64 কি.মি. দূরে হুগলী নদীর দুই তীরে গড়ে উঠেছে। হুগলী নদীর দুই তীরে 3 কি.মি. চওড়া ও 700 কি.মি. লম্বা অঞ্চলে পাটকলগুলি অবস্থিত। কলকাতা ছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পাটকল কেন্দ্রগুলি হোল বালি, রিষড়া, শ্রীরামপুর, বজ বজ, শ্যামনগর, সালকিয়া, বাঁশবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া, টিটাগড়, আগরপাড়া, বিড়লাপুর ইত্যাদি।

হুগলী নদীর দুই তীরে পাটকল কেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠার কারণ নিম্নরূপ—

(i) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দেশের শতকরা 90 ভাগ পাট উৎপন্ন হয়, যা এই শিল্পের কাঁচামাল।

(ii) রানীগঞ্জের কয়লাখনি মাত্র 192 কি.মি. দূরে অবস্থিত।

(iii) জলপথে সস্তায় যাতায়াতের সুবিধা, তাছাড়া এই শিল্পাঞ্চল সড়কপথ ও রেলপথ দ্বারা যুক্ত।

(iv) পাট ছাড়ানো, ধোয়া, পরিস্কার করা ও রঙ করার প্রয়োজনীয় জলাভূমি এই অঞ্চলে রয়েছে।

(v) এখানে রয়েছে পাট বয়নোপযোগী উষ্ম ও আর্দ্র জলবায়ু।

(vi) কলকাতা বন্দরের নৈকট্যের ফলে যন্ত্রপাতি আমদানি ও পাঠজাতদ্রব্য রপ্তানি সুবিধাজনক।

(vii) পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে প্রচুর শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা। তাছাড়া উত্তরপ্রদেশ থেকেও কিছু শ্রমিক এখানে কাজ করতে আসে।

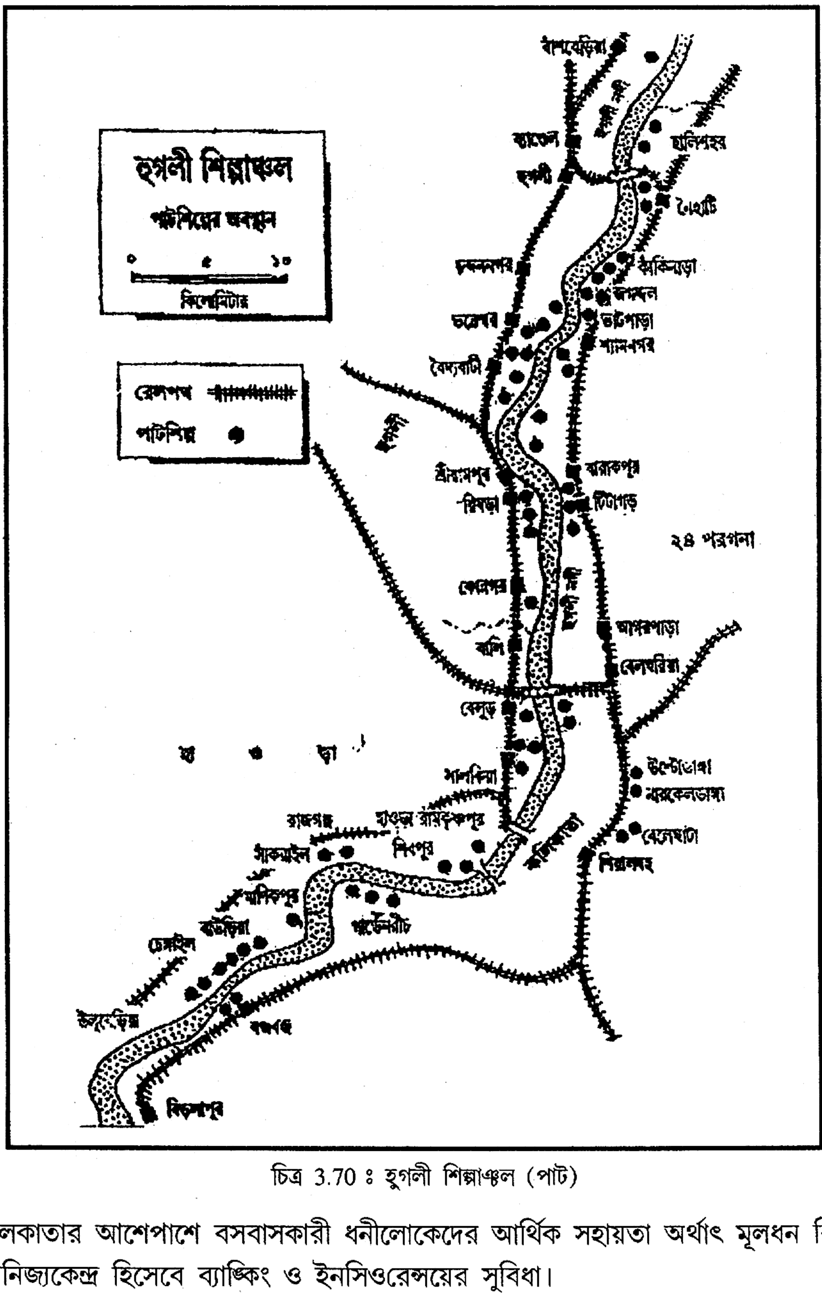

চিত্র 3.70 ঃ হুগলী শিল্পাঞ্চল (পাট)

(viii) কলকাতার আশেপাশে বসবাসকারী ধনীলোকেদের আর্থিক সহায়তা অর্থাৎ মূলধন বিনিয়োগ।

(ix) বানিজ্যকেন্দ্র হিসেবে ব্যাঙ্কিং ও ইনসিওরেন্সয়ের সুবিধা।

(x) বিগত শতাব্দীতে বৃটিশ উদ্যোগে প্রধানতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্যোগে এই অঞ্চলে পাটকল গড়ে ওঠে। সুতরাং এই অঞ্চলই প্রথম পাটকল স্থাপনের গৌরবের অধিকারী।

(xi) পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও **অন্ধ্রপ্রদেশের** গুন্টুর, বিশাখাপত্তনম, নেলিমোরলা, চেল্লিভেল্‌সা, এবুরু ও অঙ্গালো, **উত্তর প্রদেশের** কানপুর, গোরক্ষপুর ও সাহাজাওয়ান, বিহারের পূর্ণিয়া, কাটিহার, সমস্তিপুর, ও গয়া, **মধ্যপ্রদেশের** রায়গড় ও ওড়িষ্যার কটকে এবং আসাম ও ত্রিপুরাতে এই শিল্প গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় পাটশিল্পের সমস্যা ঃ স্বাধীনতার পূর্বোত্তর সময়ে ভারতীয় পাটশিল্পের বিশেষ কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে ভারতীয় পাটকলগুলি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেই সমস্যাগুলি সংক্ষিপ্তভাবে নিচে আলোচনা করা হলো।

1. ভারত বিভক্ত হওয়ার পলে প্রায় 80 শতাংশ পাট উৎপাদন অঞ্চল বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) চলে যাওয়ায় এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট পাটের অভাব হয়ে পড়ে। আর ভারতীয় পাটকলগুলি পূর্ব পাকিস্তাদের পাটকলগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর যদিও পাট উৎপাদন বৃধ্বির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এখনও কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে।

2. পাটের পরিবর্ত সামগ্রী যেমন পলিথিন ব্যাগ আবিস্কৃত হওয়ায় পাটজাত দ্রব্যের বাজার ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পাটজাত দ্রব্য আমদানিকারক দেশ প্রধানতঃ ইউরোপ ও মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রই প্রধানতঃ এই পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

3. তাছাড়া বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে চীন, রাশিয়া ও থাইল্যাণ্ডও পাট চাষ শুরু করেছে ও চীনে পাটশিল্পেরও উন্নতি হয়েছে। কেবল পাটকল স্থাপন করা পর্যন্তই নয়, পাটের পরিবর্ত সামগ্রীরূপে বহু দেশে বিভিন্ন তন্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।

4. বাংলাদেশে স্থাপিত নতুন নতুন পাটকল ও আধুনিক যন্ত্রপাতি উন্নত ধরনের দ্রব্য তৈরী করায় তাদের দ্রব্যের চাহিদা সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে গেছে ও ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে।

5. আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা দিন দিন কমছে।

6. ভারতে পাটশিল্পের যন্ত্রপাতি প্রাচীন, তাছাড়া শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট ইত্যাদি কারনে উৎপাদন খরচ বেশি, ফলে পাটজাত দ্রব্যের দামও বেড়ে যায়।

7. পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি শুল্ক বেশি বলেও পাটজাত দ্রব্যের দাম বেশি। এ কারনে বিদেশে ভারতের পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে যাচ্ছে।

উপরি উল্লিখিত এই সমস্ত সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য প্রথমতঃ কাঁচা পাটের উৎপাদন বাড়ানো দরকার। তাছাড়া উৎকৃষ্ট পাটের উৎপাদন বাড়ানোর সাথে সাথে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃধ্বিরও চেষ্টা চলছে।

উৎকৃষ্টমানের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন এর জন্য পুরোনো অচল যন্ত্রপাতির পরিবর্তন দরকার। এই চেষ্টা পাটকলগুলিতে চলছে। এছাড়া জাতয় পাট উৎপাদন সংস্থার উপর পাটকলগুলি আধুনিকীকরনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাট এর আন্তর্জাতিক বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য উন্নত মানের বস্তু, দাম কমানো ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলি করা দরকার।

ভারতবর্ষে 1975 সাল থেকে পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক কমানো হয়েছে। আশা করা যায় এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে কিছুটা স্থিতিশীলতা আসবে। ভারসাম্য রক্ষা কারী এই দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজার আরও বিস্তৃত হবে। ভারতীয় পাটের প্রধান ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, অস্ট্রেলিয়া, যুক্ত রাজ্য, চেক রিপাবলিক, ইত্যাদি।

❑ পশম বয়ন শিল্প ❑

বিকাশ ঃ পশম ভারতের প্রাচীন শিল্প। সিন্ধু উপত্যাকায় বসবাসকারী আর্যরা সম্ভবতঃ 5000 খৃঃ পূর্বে পশম বয়ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছিল, এই যুক্তির পেছনে অনেক প্রমানও পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে পশম বয়ন শিল্প কুটীর শিল্প হিসাবেই পরিচিত ছিল। তবে আধুনিক পশম বয়ন শিল্প 1876 সালে কানপুরে "Lal imli" প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শুরু হয় এর পরবর্তীকালে 1881 সালে পাঞ্জাবের ধারিওয়া ও 1882 সালে মুম্বাই ও 1886 সালে ব্যাঙ্গালোরে পশম বয়ন কল গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত এই শিল্পের খুব বেশি উন্নতি হয়নি। কিন্তু এই শিল্পের প্রকৃত উন্নতি হয় বিভিন্ন পরিকল্পনার সময়কালে। বর্তমানে ভারতে 621টি বড় ও মাঝারি শিল্প রয়েছে।

বন্টন ঃ ভারতের পশম বয়ন শিল্প প্রধানতঃ পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। ভারতের দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন এই রাজ্যগুলির অধিকারে। এছাড়া গুজরাট, কর্নাটক, পশ্চিম বাংলা ও জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যগুলি উৎপাদনের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের পশম বয়ন শিল্প কাঁচামালকে কেন্দ্র করে অথবা বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিতে ভারতে পশম বয়ন শিল্প বিকাশ লাভ করেছে—

পাঞ্জাব ঃ পশমজাত দ্রব্য উৎপাদনে পাঞ্জাব ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই রাজ্যে 250 টির বেশি ছোটো-বড় মিল রয়েছে। ধারিওয়াল প্রধান উৎপাদক অঞ্চল। অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলগুলি হোলো অমৃতসর, লুধিয়ানা, খারার। এই অঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠার অনুকূল কারণগুলি ভাক্রা নাঙ্গল পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎ ও কাশ্মীর ও কুমায়ুন হিমালয়ের আমদানিকৃত পশম।

মহারাষ্ট্র ঃ পশম বস্ত্র উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী মহারাষ্ট্র। এখানে 30 টির বেশি বয়ন কেন্দ্র আছে এবং তার বেশির ভাগ মুম্বাইতে অবস্থিত। উৎকৃষ্ট শ্রেণির পশমজাত দ্রব্য প্রধানতঃ আমদানিকৃত পশমের সাহায্যে তৈরী করা হয়। মুম্বাই সমুদ্রোপকুলে অবস্থিত একটি বন্দর হওয়ায় অস্ট্রেলিয়া, ইতালী, ও গ্রেট বৃটেন থেকে উৎকৃষ্ট পশম এখানে সহজেই আমদানি করা হয়। তবে কিছু নিম্নমানের পশমজাত দ্রব্য নিম্নমানের পশম থেকে এখানে তৈরী হয়।

উত্তর প্রদেশ ঃ উত্তর প্রদেশের কানপুর পশম শিল্পের উৎপত্তিস্থল এবং সম্ভবত এটি সর্ববৃহৎ পশম বয়ন কেন্দ্র। অন্যান্য কেন্দ্রগুলি হোলো সাহাজানপুর, মির্জাপুর, বারনসী, আগ্রা এবং টনকপুর। স্থানীয় পশম ও অন্যান্য রাজ্য থেকে পশম আমদানি করে এখানে মোটামুটি 35 টিরও বেশি পশম বয়ন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

গুজরাট ঃ গুজরাটে মোটামুটি 10টি কারখানা আছে। যেগুলি প্রধানতঃ জামনগর, আমেদাবাদ, ভাদোদরাতে অবস্থিত। জামনগরে প্রধানতঃ পশমী সুতো কম্বল ও নিকৃষ্ট ধরনের পশম দ্রব্য তৈরী হয়। নিম্নমানের পশম রাজস্থান থেকে ও উৎকৃষ্ট পশম বিদেশ থেকে এখানে আমদানি করা হয়।

অন্যান্য ঃ হরিয়ানাতে 160 টি ছোটো বয়নকেন্দ্র আছে সেগুলি প্রধানতঃ পানিপথ, ফরিদাবাদ, গুরগাঁও এবং বাহাদুরগড়ে অবস্থিত। রাজস্থানের 72-টি কল ছড়িয়ে রয়েছে বিকানীর, আলওয়ার, ভিলওয়ারা, শিকার, জয়পুর এবং পাগাউরে। পুস্কর ও আজমীর-য়ে হস্তচালিত তাঁত রয়েছে যেখানে প্রধানতঃ স্থূল, অমসৃন কম্বল তৈরী হয়।

কর্নাটকের প্রধান পশম বয়ন কেন্দ্র ব্যাঙ্গালোর ও বেলারী। এই রাজ্যের উত্তরপূর্বাংশে যে কর্কশ পশম উৎপাদন হয় তার সাহায্যেই হস্তচালিত কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উৎকৃষ্ট শ্রেণির পশম এখানে আমদানি করা হয়।

পশ্চিম বাংলার বেশিরভাগ পশম বয়নকেন্দ্র হুগলী নদীর তীরে কোলকাতা ও হাওড়ায় স্থাপিত হয়েছে। এই রাজ্যে 6টি পশম বয়ন কেন্দ্র আছে। এখানে সস্তা ও বিশ্রী পশম জাত দ্রব্য, তাছাড়া কম্বল ও ফ্লানেল কাপড় তৈরী হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর হস্তচালিত তাঁত ও শক্তি চালিত তাঁত দুয়েতেই পশম জাত দ্রব্য উৎপাদন করে। এখানকার স্থানীয় উৎকৃষ্ট পশম থেকে কাশ্মীরী পশমজাত দ্রব্য তৈরী হয়। এবং সারা দেশজুড়ে এখানকার উৎকৃষ্ট পশমজাত দ্রব্যের বাজার রয়েছে। এই অঞ্চলের পুরুষ/স্ত্রী নির্বিশেষে সবাই পশম বস্ত্র বয়নে খুব দক্ষ। শ্রীনগরে দুটি বড় মিল আছে। হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যকা শাল তৈরীতে বিখ্যাত।

তামিলনাড়ুর চেন্নাই ও সালেম উল্লেখযোগ্য পশমজাত দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্র।

বাণিজ্য ঃ ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমান উৎকৃষ্ট শ্রেণির পাট উৎপাদন করে না ফলে তাকে উৎকৃষ্ট পশম প্রধানতঃ অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ পশমজাত দ্রব্য রপ্তানিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

❑ কার্পাস বয়ন শিল্প (Cotton Textile Industry) ❑

সমস্যাদি (Problems) ঃ ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে কার্পাস শিল্পের বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে। ঢাকার মসলিনের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। যদিও বর্তমানে যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধাচরনের ফলে তৎকালীন তাঁতশিল্পের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে তথাপি 1854 সালে মুম্বাইতে সার্থকভাবে প্রথম আধুনিক কার্পাস শিল্প গড়ে ওঠে এবং তারপর থেকেই কার্পাসবয়ন ভারতের শ্রেষ্ঠশিল্প ও কার্পাস বস্ত্রোপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থানাধিকার করেছে।

কার্পাস শিল্পে বহুল উনতি সত্ত্বেও বর্তমানে তা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সরকারী ক্ষেত্রে বস্ত্রবয়ন উদ্যোগ ও যন্ত্রচালিত তাঁতক্ষেত্রের বৃদ্ধি— ভারতের তাঁত শিল্পকে পঙ্গু করার পেছনে দুই মুখ্য হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করছে। ফলস্বরূপ দেশের এক তৃতীয়াংশ বস্ত্র উৎপাদক কারখানা বন্ধ হয়ে পড়েছে। নিম্নোক্ত শিরোনামের মাধ্যমে ভারতের তাঁতশিল্পের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরা হল ঃ

(i) **কাঁচামালের অপ্রাচুর্যতা ঃ** মোট উৎপাদন ব্যয়ের 35% নির্ধারিত হয় কাঁচামালের ভিত্তিতে। ভারতবর্ষে বৃহৎ আঁশযুক্ত তুলার অপ্রতুলতা লক্ষনীয়। আমেরিকা এবং পেরু থেকে আমদানি করা হয় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার অপ্রতুলতা লক্ষনীয়। আমেরিকা এবং পেরু থেকে আমদানি করা হয় লম্বা আঁশযুক্ত তুলা। মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি এবং কাঁচামাল প্রাপ্তির অনিশ্চয়তার জন্য বস্ত্রবয়ন কলগুলো নানা সমস্যায় ভুগছে।

(ii) **পুরাতন যন্ত্রপাতি ঃ** ভারতবর্ষে অধিকাংশ বস্ত্রবয়ন কারখানা পুরাতন যন্ত্রপাতি নির্ভর, 60% এর বেশি যন্ত্র পুরনো। সারা পৃথিবীতে যেখানে 100% এবং আমেরিকায় 62% যন্ত্র আধুনিক পদ্ধতিতে চলে, ভারতে সেই হার মাত্র 18% । পুরাতন যন্ত্র ব্যবহারে ফলে বস্ত্রের মান যেমন নিম্নতম হয় তেমনি বস্ত্রোৎপাদন হ্রাস পায়। ফলস্বরূপ ভারতীয় বস্ত্র বিশ্বের প্রতিযোগিতার দরবারে মুখ থুবড়ে পড়ছে।

(iii) **শক্তির ঘাটতি ঃ** বস্ত্রবয়ন কলগুলো শক্তির ঘাটতিজনিত সমস্যায় ভুগছে। বর্তমানে কয়লার চালানে ঘাটতি এবং বিদ্যুতের ঘাটতি এই সকল কারখানাগুলোর পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

(iv) **বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা ঃ** ভারতীয় বস্ত্রশিল্প জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া তাইওয়ান ইত্যাদি দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় অক্ষম। কারণ এ সকল দেশেণ বস্ত্র তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং গুণগত মান উন্নত। ফলে বিদেশের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা নগন্য। এরফলে ভারতীয় বস্ত্র অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক উভয় দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

(v) **বিকেন্দ্রীভূত ক্ষেত্রগুলোর প্রতিযোগিতা ঃ** ভারতীয় বস্ত্রবয়ন কারখানাগুলোর বিলুপ্তির পেছনে অপর একটি কারণ হল বিকেন্দ্রীভূত ক্ষেত্রগুলোর তীব্র প্রতিযোগিতা। ক্ষুদ্র ক্ষেত্র হওয়ায় সরকার এই ক্ষেত্রগুলোকে

অধিক সুবিধা ও ছাড় প্রদান করে। ফলস্বরূপ বস্ত্রবয়ন কলগুলোর লগ্নী হ্রাস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে বিকেন্দ্রীভূত ক্ষেত্রগুলোর লগ্নী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

(6) **দূর্বল বস্ত্রবয়ন কারখানা ঃ** ভারতে প্রায় 130-টি বস্ত্র বয়ন কারখানার অবস্থাসঙ্গীন। ভারত সরকার NTC (National Textil Corporation) গঠন করেছে এই কারখানাগুলোকে পুনরায় সচলতা প্রদানের জন্য। যদিও ভারতসরকার এই কলগুলোকে পুনরায় সচল করার জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে এবং এই কলগুলোর আধুনিকী করনের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তথাপি এই কলগুলো এখনও ততটা লাভজনক ফলপ্রদানে সক্ষম হয়নি। বর্তমানে NTC দুপ্রকার সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। প্রথমতঃ পুরাতন যন্ত্রপাতি এবং দ্বিতীয়তঃ অতিরিক্ত শ্রমিক যাদের মজুরি বাবদ ব্যয়ভার বহনে NTC অক্ষম।

(7) **শ্রমিকদের অদক্ষতা ঃ** শ্রমিকদের অদক্ষতা অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা গড়ে। একজন ভারতীয় বস্ত্রবয়ন কর্মী 2টি যন্ত্রচালিত তাঁতে কাজ করে। পক্ষান্তরে, জাপানে একজন শ্রমিক 30-টি এবং যুক্তরাষ্ট্রে 60-টি তাঁতে কাজ করে। ইদানীং শ্রমিক ধর্মঘট, আন্দোলন ইত্যাদি ভারতীয় বস্ত্রবয়ন কারখানাগুলোর চিরাচরিত সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে।

(8) **সরকারী তত্ত্বাবধান ঃ** ভারতীয় বস্ত্রবয়ন শিল্পের সমস্যার অপর একটি কারণ হল সরকারের অতিরিক্ত তত্ত্বাবধান এবও ভুয়ো পরিকল্পনা যা বাস্তবায়িত করা সহজসাধ্য নয়। সরকার নিজের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা উৎপাদিত পণ্যের ওপর কম মূল্যে ধার্য করে যা বস্ত্রবয়ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে 1972 সালে কাপানো সুতো বিতরনের যে প্রক্রিয়া গৃহীত হয়েছিল তাতে সরকার প্রতিটি কারখানাকে বাধ্যতামূলক ভাবে পাকানো সুতো বিকেন্দ্রীভূত সংস্থাগুলোকে বিতরনের নির্দেশ দেয় ভীষন কম মূল্যে।

কার্পাস বয়ন শিল্পে অগ্রগতির কারন ঃ ভোগোলিক অবস্থান অনুসারে ভারতের কার্পাস শিল্পের সমাবেশকে 5-টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা— (i) পশ্চিমাঞ্চল (ii) দক্ষিণাঞ্চল (iii) উত্তরাঞ্চল (iv) মধ্যাঞ্চল এবং (v) পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন অঞ্চলে কার্পাস বয়নশিল্প উন্নতির কারণসমূহ নীচে আলোচিত হল ঃ

1. **পশ্চিমাঞ্চলের কার্পাস শিল্প ঃ** গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এখানে প্রায় 283 টি কাপড়ের কল আছে।

গুজরাট কার্পাস শিল্পে খুব উন্নত। প্রায় 175 টি কাপড়ের কলের মধ্যে আমেদাবাদে 85-টি কাপড়ের কল আছে। কার্পাস শিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতির জন্য আমেদাবাদকে বলে **'ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার'**। ভবনগর, আমেদাবাদ ভাদোদরা, সুরাট ইত্যাদি বস্ত্রশিল্পের প্রসিন্ধ কেন্দ্র।

মহারাষ্ট্রে 121-টি কল আছে। মুম্বাইয়ের আছে প্রায় 50-টি কল। পুনে, শোলাপুর, নাগপুর ইত্যাদি প্রসিন্ধ বস্ত্রশিল্পকেন্দ্র।

পশ্চিমাঞ্চলে কার্পাস বয়ন শিল্প উন্নতির কারণগুলি হল ঃ

(i) **স্থানীয় তুলা ঃ** গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের কৃষ্মমৃত্তিকা অঞ্চল প্রচুর তুলা উৎপন্ন হওয়ায় শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সহজেই পাওয়া যায়।

(ii) **সমুদ্রোপকূলবর্তী আর্দ্র জলবায়ু ঃ** আর্দ্র জলবায়ুতে সূতো সহজেই পাক খায় এবং ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকায় এই জলবায়ু সুতো কাটার উপযোগী।

(iii) **শক্তি সরবরাহের সুবিধা ঃ** পশ্চিমঘাট পাহাড়ের খরস্রোতা নদী থেকে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ এই শিল্পে সস্তায় সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে তাপবিদ্যুৎ পারমানবিক বিদ্যুৎ এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

(iv) **বন্দরের সুবিধা ঃ** মুম্বাই ও অন্যান্য বন্দরের সুবিধাযুক্ত এই স্থানে লম্বা আঁশের তুলা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, বিদেশ থেকে আমদানি করা ও শিল্পজাত কার্পাসদ্রব্য বিদেশে রপ্তানির সুবিধা আছে।

(v) **সুলভ শ্রমিক ঃ** সুলভ শ্রমিক প্রাপ্তির সুবিধা আছে।

(vi) **বিপুল চাহিদা ও বাজার ঃ** ভারতের মত জনবহুল দেশে কার্পাস বস্ত্রের বিপুল চাহিদা থাকায় শিল্পের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে।

(vii) **স্থানীয় ধনী সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ঃ** গুজরাটী ও পার্শী ধনী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অঞ্চল কার্পাস শিল্পে মূলধনের প্রাচুর্যতার জন্য প্রচুর উন্নতি লাভ করেছে।

চিত্র 3.71 ঃ ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্র

(2) **দক্ষিণাঞ্চলে কার্পাসশিল্প ঃ** দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, গোয়া ইত্যাদি রাজ্য কার্পাস শিল্পে উন্নত।

তামিলনাড়ু ঃ তামিলনাড়ুতে প্রায় 220-টি কাপড়ের কল ও সুতো কাটার কল আছে। এরাজ্যের কোয়েম্বাটোর দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। এছাড়া মাদুরাই, চেন্নাই, তিরুচিরাপল্লী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কার্পাস শিল্পকেন্দ্র।

অন্যান্য কার্পাসশিল্পের কেন্দ্র ঃ কর্ণাটকের বাঙ্গালোর, মহীশূর কেরালার তিরুবনন্তপুরম, অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ, গুন্টুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বস্ত্রশিল্পকেন্দ্র, গোয়া ও পন্ডিচেরীতে কাপড়ের কল আছে।

উন্নতির কারণ ঃ (i) তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হওয়ায় শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সহজেই পাওয়া যায়। (ii) আর্দ্র জলবায়ু সুতো পাকানোর পক্ষে উপযোগী, (iii) চেন্নাই, কোচিন, তুতিকোরিন প্রভৃতি বন্দরের মাধ্যমে শিল্পের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির সুবিধা আছে, (iv) গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে মানুষের কার্পাস যন্ত্রের বিপুল চাহিদা বস্ত্র উৎপাদনে অন্যতম সহায়ক। (v) স্থানীয় জলবিদ্যুৎ প্রাপ্তির সুবিধা, (vi) সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য, (vii) উদ্বৃত্ত শিল্পজাতদ্রব্য রপ্তানীর সুবিধে এই শিল্পে উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক।

(3) **উত্তরাঞ্চলের কার্পাস শিল্প ঃ** উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ইত্যাদি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তরপ্রদেশের কানপুর, মোরাদাবাদ, আগ্রা, পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, অমৃতসর, হরিয়ানার হিসার, রাজস্থানের জয়পুর, বিকানীর এবং দিল্লী এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কার্পাস শিল্পকেন্দ্র। উত্তরপ্রদেশে 33-টি, পাঞ্জাবে 8-টি, রাজস্থানে 18-টি ও দিল্লীতে 4-টি কার্পাস বয়ন শিল্পের কারখানা আছে।

উন্নতির কারণ ঃ (i) উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব, হরিয়ানার সেচযুক্ত জমিতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা জন্মায়, (2) স্থানীয় বাজারে কার্পাসবস্ত্রের বিপুল চাহিদা, (3) উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, (4) প্রয়োজনীয় জলবিদ্যুৎ-এর সুবিধা, (5) সুলভ শ্রমিক প্রাপ্তির সুবিধা—এই অঞ্চলের কার্পাস শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করেছে।

(4) **মধ্যাঞ্চলের কার্পাসশিল্প ঃ** মধ্যপ্রদেশ এই অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত। এ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রগুলো হল— (i) গোয়ালিয়র, (ii) ভোপাল ও (iii) ইন্দোর।

উন্নতির কারণ ঃ (i) অদূরবর্তী অঞ্চল থেকে তুলো আমদানী করার সুবিধা, (2) স্থানীয় চাহিদা, (3) সুলভ শ্রমিক প্রাপ্তির সুবিধা, (4) স্থানীয় ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতা এই অঞ্চলের কার্পাসশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করেছে।

(5) **পূর্বাঞ্চলের কার্পাসশিল্প ঃ** পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি পূর্ব ভারতের অঞ্চলসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 40-টি, বিহারে 5-টি, ওড়িশায় 6-টি, আসামে 6-টি কাপড়ের কল আছে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে কার্পাসশিল্প সুসজ্জিতভাবে গড়ে উঠেছে। কলকাতার চারদিকে গার্ডেনরীচ, বেলঘরিয়া, পানিহাটি, উলুবেড়িয়া, ফুলেশ্বর ইত্যাদি স্থানে কাপড়ের কল অবস্থিত।

উন্নতির কারণ ঃ (i) অত্যধিক ঘনবসতির জন্য বস্ত্রের চাহিদা, (2) আদ্র জলবায়ুর উপস্থিতিতে সুতো পাকানো এবং কাটা অত্যন্ত সুবিধাজনক, (3) রানীগঞ্জের কয়লা থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে তাপবিদ্যুৎ, (4) সড়কপথ ও রেলপথ যোগাযোগের ব্যবস্থা, (5) কলকাতা বন্দরের সুবিধা থাকায় যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি আমদানী এবং উৎপাদিত কার্পাসের দ্রব্য রপ্তানীর সুবিধা, (6) সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য ইত্যাদি কারণে এখানে কার্পাস শিল্প গড়ে উঠেছে।

উপরিউক্ত কারণসমূহ ভারতে 5টি অঞ্চলে বস্ত্রশিল্পের উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও বর্তমানে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জন্য এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে প্রতিযোগিতার ফলে এবং পুরনো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে ভারতের কার্পাসশিল্পের অগ্রগতি বেশ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। বেসরকারী মহলের অনুদান এই শিল্পে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

❑ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry) ❑

লৌহ-ইস্পাত শিল্প সকল শিল্পের মূল। কৃষি, শিল্প, পরিষেবা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজকর্মের যেকোন ধারায় উন্নতির জন্য লৌহ-ইস্পাত শিল্পে অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আলোচ্য শিল্প পৃথিবীর ভারী শিল্পগুলোর

অন্যতম। ইস্পাত উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান একাদশ। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই আলোচ্য শিল্প গড়ে উঠেছে। যদিও পূর্বভারতে এই শিল্পের একদেশীকরণ লক্ষ্যণীয়। নিম্নে ইস্পাতকেন্দ্রগুলোর বিবরণ দেওয়া হল ঃ

চিত্র 3.72 ঃ ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ

(1) জামসেদপুর কেন্দ্র ঃ টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী (TISCO) ঃ

এই কোম্পানীটি ভারতের সবচেয়ে বড় এবং পুরাতন কোম্পানী। এই স্টীল কোম্পানীটি বিহারের সিংভূম জেলার সাকচীতে (বর্তমান জাবসেদপুর) স্যার জামসেদজী টাটার উদ্যোগে 1907 সালে নির্মান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাই এই অঞ্চলের নাম জাবসেদপুর রাখা হয়। 1911 সালে এখানে লৌহপিণ্ড এবং 1912 সালে ইস্পাত উৎপন্ন হয়। যে সকল কারণের জন্য এখানে অর্থাৎ এই অঞ্চলে বড় কোম্পানী গড়ে উঠেছে, সেগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(a) ঝাড়খণ্ডের সিংভূমের নোয়ামুণ্ডি খনি থেকে সহজেই লোহার কাঁচামাল হিসাবে ভালো মানের হেমাটাইট পাওয়া যায়। এছাড়া ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের গুরুমহিষানী খনি থেকেও হেমাটাইট পাওয়ার সুবিধা আছে। জাবসেদপুর থেকে এই সকল খনিগুলি 75–100 km দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত।

(b) ঝরিয়া এবং রানীগঞ্জের কয়লা পাওয়ার অর্থাৎ যোগানের সুবিধা রয়েছে। এই দুটি খনি জামসেদপুর থেকে 160–200 km. দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত।

(c) ওড়িশার কেদুঝড় জেলার জোড়া খনি থেকে ম্যাঙ্গানীজ লাভের সুবিধা রয়েছে।

(d) ওড়িশার সুন্দরগড় জেলা থেকে ডলোমাইট, চুনাপাথর পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

(e) প্রায় 250 km দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কলকাতা বন্দরের সুবিধা যেমন আছে ঠিক তেমনি বাজার এবং সুলভ দক্ষ শ্রমিকের যোগানের সুবিধাও রয়েছে।

(f) সুবর্ণরেখা নদী থেকে যেমন প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ বন্দোবস্ত রয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই খরকাই নদী থেকেও জলের যোগান পাওয়া যায়।

(g) জামসেদপুরের সাথে কলকাতা, মুম্বাই চেন্নাই-এর সড়কপথ ও রেলপথ পরিবহনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

(h) বিহারে এবং ওড়িশার জনসংখ্যা ঘনত্ব বেশি হওয়ার জন্য সুলভে দক্ষ শ্রমিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া ছোটনাগপুর মালভূমি (ঝাড়খণ্ড) অঞ্চলে কাজের সুবিধার জন্য শ্রমিকের অভাব হয় না।

(2) **ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী (IISCO) ঃ**

পশ্চিমবঙ্গের কুলটী 1864 সালে, হীরাপুর 1908 সালে এবং বার্নপুর 1937 সালে পৃথক পৃথকরুভাবে কোম্পানী গড়ে তোলে। পরে এগুলি একত্রিত হলে IISCO নামে পরিচিতি লাভ করে। এটিকে 1972 সালে সরকারের নিয়ন্ত্রনে আনা হয়। এই তিনটি কোম্পানী কলকাতা আসানসোল রেলপরিবহনের সাথে যুক্ত। হীরাপুর কোম্পানী লৌহপিণ্ড উৎপন্ন করে এবং কুলটিতে ইস্পাত তৈরির জন্য পাঠানো হয়। ঢালাই কারখানা বানপুরে লক্ষ্য করা যায়। IISCO-তে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলি হল ঃ

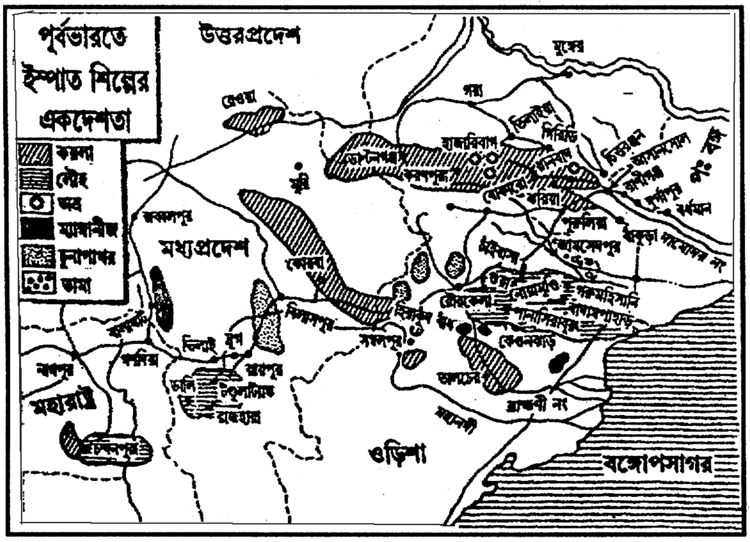

চিত্র 3.73 ঃ পূর্বভারতে ইস্পাত শিল্পের একদেশতা

(a) বিহারের সিংভূম জেলা গুণা খনি থেকে লোহার কাঁচামাল এই IISCO কোম্পানী থেকে 285 km দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত। এছাড়া ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ থেকে লৌহ কাঁচামাল পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

(b) ঝরিয়া এই স্টীল কোম্পানী থেকে 137 km দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত এবং এখান থেকে প্রথমে কয়লা পাওয়ার সুবিধা ছিল। বর্তমানে দামোদর উপত্যকা থেকে শক্তি পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

(c) ওড়িশার সুন্দরগড় জেলা থেকে ডলোমাইট এবং চুনাপাথর সুলভে পাওয়া যায়। এটি 327 km দূরত্বে অবস্থিত। চুনাপাথর ওড়িশার গাংপুর এবং পারাঘাট থেকে সুলভে পাওয়া যায়।

(d) 200 km দূরত্বের কলকাতার সঙ্গে রেলপথ এবং সড়কপথের মাধ্যমে যুক্ত এই অঞ্চলটি।

(e) প্রতিবেশি এলাকা থেকে সুলভে শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

(3) ভিলাই-কেন্দ্র ঃ ভিলাই ইস্পাত কারখানা (HSL) ঃ

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কলকাতা মুম্বাই লাইন এবং জাতীয় সড়কের ওপর সরকারী উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশের ভিলাইতে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগীতায় একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলা হয়। ভিলাইতে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলি হল ঃ

(a) ভিলাই থেকে 88 কিমি দূরে দাল্লি রাজহারা অঞ্চল থেকে আকরিক লোহার যোগান।

(b) কারগলি কয়লা ধৌতাগার থেকে মোট প্রয়োজনীয় কয়লার 60% এবং রানীগঞ্জ, ঝরিয়া অঞ্চল থেকে বাকী 80% অধৌত কয়লার সরবরাহ। বর্তমানে স্থানীয় কোবরা খনির কয়লা ব্যবহার করা হলেও এই কয়লা রাণীগঞ্জ, ঝরিয়ার মত উচ্চমানের নয়।

(c) মাত্র 26 কি.মি. দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত নন্দিনী খনি থেকে চুনাপাথর, বড়াসেওনি, ভাণ্ডারা ও বালামা থেকে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়ার সুবিধা।

(d) মহানদী ও তার উপনদীগুলি থেকে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত। এছাড়া তেন্ডুলা খাল খনন করা হয়েছে।

(e) মুম্বাই, কলকাতা ও বিশাখাপত্তনম বন্দর-এর সাহায্যে মালপত্র আদানপ্রদানের সুবিধা। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব রেল মারফৎ ভিলাই কারখানায় কাঁচামালের যোগান।

(f) সুলভে শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা এবং জাতয় সড়কপথে পণ্য পরিবহনের সুযোগ রয়েছে।

(4) বোকারো কেন্দ্র ঃ বোকারো ইস্পাত কারখানা (বোকারো স্টীল লিমিটেড BSL) ঃ

দামোদর ও বোকারো নদীর মিলনস্থালের কাছে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে তৎকালীন সোভিয়েত সহযোগীতায় একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠে। এই কারখানা গড়ে তোলার কারণগুলি হল ঃ

(a) ওড়িশার সুন্দরগড় অঞ্চলের কিরিবুরু ও খনি থেকে আকরিক লোহার যোগান পাওয়া যায়। বোকারো থেকে 32 km. দূরে এই কিবিবুরুর খনিটি অবস্থিত।

(b) ঝরিয়া এবং বোকারোর কয়লাখনি থেকে কয়লা পাওয়ার সুবিধা।

(c) ঝাড়খণ্ডের পালামৌ থেকে চুনাপাথর; ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানীজ পাওয়ার সুবিধা।

(d) দামোদরের জলবিদ্যুৎ এবং স্থানীয় তাপবিদ্যুতের সরবরাহ।

(e) পূর্ব রেলপথের মাধ্যমে পরিবহন বন্দোবস্ত এবং কলকাতা বন্দরের সাহায্যে মালপত্র আদান প্রদান এবং সুলভ শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

(5) রাউরকেল্লা কেন্দ্র ঃ রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানা (হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড HSL) ঃ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে উড়িষ্যার রাউরকেল্লায় জার্মানীর ক্রুপস্ ও ডেমাগ কোম্পানীর কারিগরী সহযোগিতা নিয়ে একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলা হয়। এই লৌহ-ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার

কারণগুলি হল ঃ

(a) ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার বোনাই পাহাড় এবং নিকটবর্তী কেঁদুঝাড় ও ময়ূরভঞ্জ অঞ্চল থেকে আকরিক লোহার যোগান। রাউরকেল্লা থেকে 80 km. দূরে বোনাই পাহাড়ে লোহার খনিটি অবস্থিত।

(b) ঝরিয়া এবং গিরিডি অঞ্চলের কয়লা দুগদা এবং কারগলি ধৌতাগারে পরিশোধনের বন্দোবস্ত।

(c) তাপবিদ্যুৎ ছাড়াও হিরাকুঁদ প্রকল্প থেকে জলবিদ্যুতের যোগান। ব্রাহ্মনী কোয়েল এবং শঙ্খ নদী ও শেষোক্ত নদীর ওপর গড়ে তোলা জলাধার থেকে জলসরবরাহের বন্দোবস্ত।

(d) রাউরকেল্লা থেকে 32 km. উত্তরে হাসাবাড়ি থেকে চুনাপাথর আহরণের সুবিধা।

(e) দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব-রেলপথে পরিবহনের সুবিধা। কলকাতা, বিশাখাপত্তনম বন্দর-এর সাহায্যে মালপত্র আদান-প্রদানের সুবিধা, আঞ্চলিক বাজার ও দক্ষ সুলভ শ্রমিকের সুবিধাও রয়েছে।

(6) দুর্গাপুর কেন্দ্র ঃ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড HSL) ঃ

কলকাতার 192 কি.মি. উত্তর পশ্চিমে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ব্রিটিশ কারিগরী সহযোগীতায় একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলা হয়। এই শিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলি হল ঃ

(a) উড়িষ্যার গুয়া অঞ্চল থেকে আকরিক লোহার যোগান।

(b) ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া এবং বরাকর অঞ্চলের কয়লা কারগলি, দুগদা প্রভৃতি ধৌতাগারে শোধিত হওয়ার সুযোগ।

(c) বীরমিত্রপুর জামাবাড়ি অঞ্চলের চুনাপাথরের যোগান।

(d) দামোদর নদ ও দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত। দুর্গাপুরে অবস্থিত দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুতের যোগান।

(e) পূর্ব রেলপথ ও দামোদর খাল বরাবর পরিবহনের সুযোগ। কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক মালপত্র আদান-প্রদান ব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে।

(7) ভদ্রাবতী কেন্দ্র ঃ বিশ্বেশরায়া আয়রন অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড (VISL) ঃ

ভদ্রা নদীর তীরে কর্নাটকের ভদ্রাবতীতে অবস্থিত এই ইস্পাত কারখানাটির পূর্ব নাম মহীশূর আয়রন অ্যান্ড স্টীল লিমিটেড। এই শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার কারণগুলি হল ঃ

(a) চিকমালাগু জেলার বাবাবুদান পাহাড়ের কেমন গুড়ি অঞ্চল থেকে আকরিক লোহার যোগান।

(b) কয়লা ছাড়াও এখানে কাঠকয়লা ব্যবহার করা ঃ

(c) ভদ্রাবতী থেকে 22 km. দূরত্বের মধ্যে ভাণ্ডিগুড্ডা ও শিমোগার শঙ্করগুড্ডা খনি থেকে চুনাপাথর আহরণের সুবিধা।

(d) শিবসমুদ্রম, জগ এবং সিমলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে সুলভ বিদ্যুতের যোগান। এছাড়া শিমোগা অঞ্চল থেকে ম্যাঙ্গানীজের সরবরাহ।

(e) দক্ষিণ রেলপথের মাধ্যমে পরিবহনের বন্দোবস্ত।

(f) আঞ্চলিক বাজার ও দক্ষ শ্রমিকের যোগান।

(8) সালেম কেন্দ্র ঃ (সালেম ইস্পাত কারখানা SSP) ঃ

তামিলনাড়ুর সালেমে অবস্থিত এই ইস্পাত কারখানাটি লৌহ-ইস্পাত শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুযায়ী দেশের ইস্পাত বলয়ের বাইরে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে শিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলি ঃ

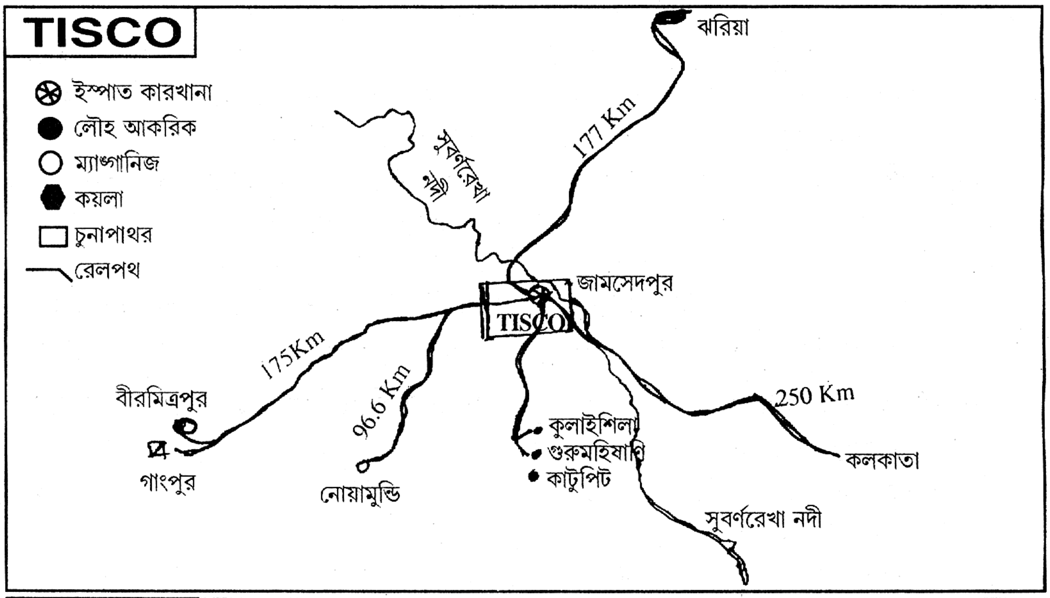

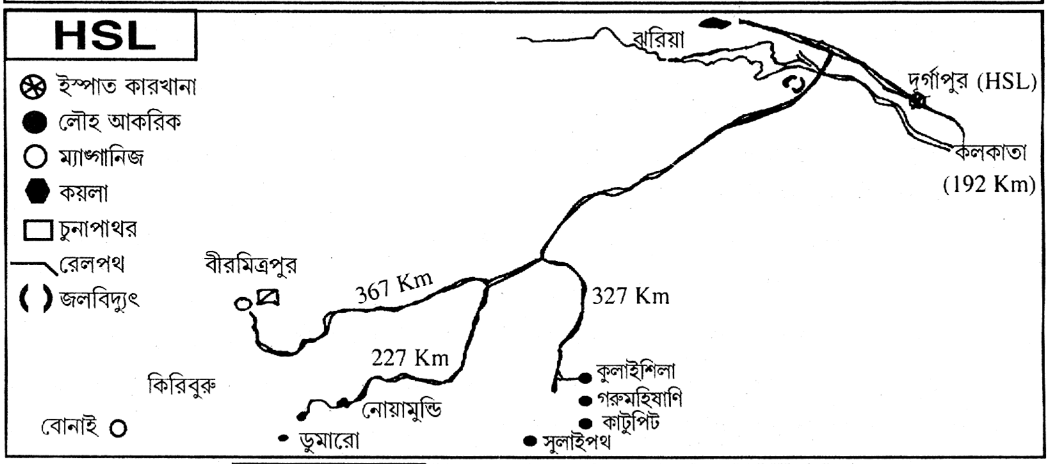

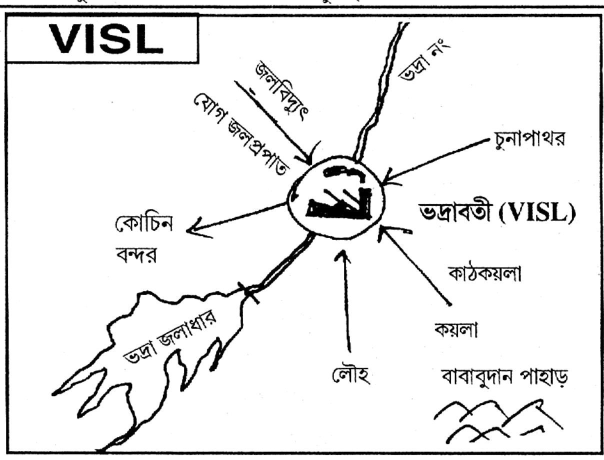

চিত্র 3.74 ঃ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র

(a) স্থানীয় আকরিক লোহার যোগান,

(b) নেভেলি লিগনাইট খনি থেকে প্রচুর কয়লা পাওয়ার সুবিধা।

(c) সালেম, তিরুচিরাপল্লী অঞ্চলের চুনাপাথর ডলোমাইট এর যোগান।

(d) মেত্তুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে সুলভ বিদ্যুৎ সরবরাহ।

(e) দক্ষিণ রেলপথ ও সড়কপথে মাল পরিবহনের সুযোগ।

(f) স্থানীয় বজার, দক্ষ সুলভ শ্রমিকের সুবিধা রয়েছে।

(9) **বিশাখাপত্তনম কেন্দ্র ঃ (বালচেরুভু ইস্পাত কারখানা VSP) ঃ**

বিশাখাপত্তনমের কাছে বালাচেরুভু ইস্পাত কারখানায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কারিগরী সাহায্যে সপ্তম পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন শুরু হয়। এই অঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলি হল ঃ

(a) মধ্যপ্রদেশের বায়লাডিলা অঞ্চল থেকে আকরিক লোহার যোগান।

(b) উড়িষ্যার তালচের এবং দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের রাজরাপ্পা, ভালঘোরা ও জিডিখনি থেকে কয়লা সরবরাহ।

(c) উড়িষ্যার বীরমিত্রপুর ও অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মাম ও জোগাপেটা অঞ্চলের চুনাপাথরের যোগান।

(d) তুঙ্গভদ্রা নদী ও জলাধার থেকে জলসরবরাহের বন্দোবস্ত।

(e) দক্ষিণ পূর্ব রেলপথে পরিবহনের ব্যবস্থা। এছাড়া বিশাখাপত্তম বন্দরের মাধ্যমে মালপত্র আদান প্রদানের সুবিধা।

(f) আঞ্চলিক বাজার ও দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহে উপরিউক্ত লৌহ-ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছে।

লৌহ-ইস্পাত শিল্পের সমস্যা ঃ

ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্পের যে সমস্ত সমস্যাগুলি দেখা যায় সেগুলি হল নিম্নলিখিত ঃ

(1) **মূলধনের সমস্যা ঃ** লৌহ-ইস্পাত শিল্পে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। ভারতীয়দের কাছে এই পরিমাণ মূলধন থাকে না। তাই অনেক সময় বিদেশী সহযোগিতায় ইস্পাত কারখানাগুলিকে গড়ে তোলা হয়। সাম্প্রতিককালে দেশে ইস্পাতের চাহিদা যোগানের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে ইস্পাতের অনটনের জনয মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা যায়।

(2) **প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব ঃ** 1960 সাল থেকে 1970 সালের মাঝামাঝি তেলের অনটনের সময় পর্যন্ত ভারতের ইস্পাত কারখানা প্রযুক্তিবিদ্যার কার্যকারিতা অর্থাৎ যোগ্যতার দ্বারাই চিহ্নিত করা হত। এটি ছিল মূলতঃ বৈদেশিক প্রযুক্তিবিদ্যা। কিন্তু দুই শতাব্দী ধরে তেলের অভাবের পর থেকে শক্তির উৎসের চড়া দামের জন্য এবং অন্যান্য শক্তি যোগানের তীব্রতা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ইস্পাতের লাভ করার মাত্রা কমতে থাকে। এই ফলাফল মূলতঃ প্রযুক্তি বিদ্যার কিনারা হারিয়ে ফেলেছে বেং এখন উন্নত দেশের পেছনে এটিই বিবেচ্য বিষয়ের পথ হয়ে দাঁড়াবে। ভাবতে বস্তুগত মূল্য তাই এখনও নিম্নগামী। জাপান এবং কোরিয়াতে এক টন বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত প্রস্তুত করতে 1.1 টন কাঁচা ইস্পাতের প্রয়োজন হয়। ভারতে এখনও গড়ে 1.2 টনের উর্ধ্বগতিতে বসে আছে। উৎপন্ন বস্তুর উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে বিশেষ করে আগামী বছরগুলিতে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য যোগ করা বিশেষ প্রয়োজন।

(3) **নিম্নমানের উৎপাদন ক্ষমতা ঃ** ভারতে মাথাপিছু 90–100 টনের মত উৎপাদনক্ষমতা রয়েছে যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের। প্রতি বছরে জাপান, কোরিয়া এবং অন্যান্য শক্তিশালী ইস্পাত কোম্পানীগুলির 600–700 টনের মত উৎপাদন করার ক্ষমতা রয়েছে। অপরদিকে আমেরিকার একটি ছোট কারখানা গ্যালাটিন ইস্পাত কোম্পানীতে 300 জনের কম শ্রমিক গরম কুণ্ডলীতে 1.2 মিলিয়ন টন উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে। যেখানে

ভারতে 5000 শ্রমিক কাজ করার সুযোগ পায়। সেইজন্য বর্তমানে শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতা খুব দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজন শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের উন্নতিসাধন করা।

(4) **নিম্নমানের সম্ভাব্য উপযোগীতা ঃ** লোহা এবং ইস্পাতের সম্ভাব্য উপযোগিতা খুবই কম। কোন কোন সময় 80%-এর বেশি সম্ভাব্যভাবে ব্যবহার করা হয়। এর বহু কারণ রয়েছে যথা বন্ধ, লকআউট, কাঁচামালের অভাব, শক্তির অভাব, প্রশাসনিক অক্ষমতা ইত্যাদি।

(5) **প্রচুর চাহিদা ঃ** বর্তমানে মাথাপিছু কম ভোগ করার ক্ষমতা, প্রতিদিন লোহা এবং ইস্পাতের জন্য চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি এবং প্রচুর পরিমানে লোহা ও ইস্পাত চাহিদাপূরণের জন্য আমদানী করা হয়। বৈদেশিক দামী পণ্য বিনিময় রক্ষা করতে হলে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

1992 সালে ইস্পাতের দাম ও বণ্টনের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ফলে এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন বাধা নিষেধ না থাকায় আশা করা যায় যে আগামী দিনগুলিতে আমদানি শুল্ক হ্রাস, নিয়ন্ত্রণ ও লৌহসেস রদ ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় লৌহ-ইস্পাত শিল্পের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

❑ রাসায়নিক এবং তৎসংযুক্ত বিষয়ক শিল্প ❑
(Chemical and allied industries)

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে রাসায়নিক এবং তৎসংযুক্ত বিষয়ক শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই শিল্প অত্যন্ত দেরীতে শুরু হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত এটি সদ্যোজাত পর্যায়ে রয়েছে বললে ভুল হবে না। গত দুই দশকে এই শিল্পের যথেষ্ট রূপান্তরীকরন হয়েছে। 1991 সালে শিল্পের কর্ম প্রনালীর (Industrial policy) স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শিল্পের উন্নতি ঘটেছে। টেক্সটাইল, আইরন বা লৌহ, স্টীল উৎপাদন শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্পের পর এটিই চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শিল্প। অন্যান্য ভারীশিল্পের থেকে এই শিল্পের উন্নতির হার বেশি। বিগত দশ বছর থেকে প্রতি বছর এই শিল্পে 10% উন্নতি ঘটেছে, বর্তমানের রাসায়নিক শিল্প কারখানা ও উঠতি শিল্প কারখানাগুলির উন্নতি লক্ষ্য করে বলা যায় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারত রাসায়নিক শিল্পোৎপাদন দেশগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে। বর্তমানে এই শিল্পে বার্ষিক কেনা বেচার পরিমান (annual turnover) 35000 কোটি টাকা থেকে 40000 কোটি টাকা অবধি পৌঁছেছে।

❍ ভারী অজৈব রাসায়নিক উৎপাদন শিল্প ❍

● **সালফিউরিক অ্যাসিড**

সার, কৃত্রিম তন্তু, প্লাস্টিক, রঙ এবং রঙের উপাদান তৈরীর ক্ষেত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি ধাতুবিদ্যা, চামড়া, ট্যানিং, এবং তেল বিশুদ্ধিকরনেও ব্যবহৃত হয়। এটি সালফার থেকে প্রস্তুত হয়। সালফার ভারতে সুলভ নয়। প্রায় 90% সালফার বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। 1951 সালে মাত্র এক লক্ষ টন সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদিত হয়েছিল, 1980–81 সালে এর পরিমান বেড়ে হয় 23 লক্ষ টন এবং 1990–91 সালে 39 লক্ষ টন। দেশে প্রায় 90-টি ইউনিট সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন করে থাকে। 80% উৎপাদনই হয়ে থাকে যথাক্রমে কেরালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে।

● **নাইট্রিক অ্যাসিড**

প্রধানতঃ সার তৈরীতে এবং বিস্ফোরক পদার্থ তৈরীতে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়। মূলত ট্রম্বে ইউনিট অফ ফার্টিলাইজার করপোরেশন থেকেই এই অ্যাসিড নির্মিত হয়।

● **ক্ষার (alkali)**

ক্ষার হল অজৈব রাসায়নিক শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিভিন্ন শিল্পে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ায় বর্তমানে এর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষার প্রস্তুতির জন্য চুনাপাথর, সাধারন লবন (common salt) এবং কোল এর প্রয়োজন। কাঁচামালের তুলনায় উৎপাদিত বস্তুটি হালকা হয়। এই শিল্পে যথেষ্ট পরিমানে সস্তায় বিদ্যুতের প্রয়োজন। সেইজন্য কাঁচামালের প্রাপ্তিস্থান, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বাজার এর কাছাকাছি এই শিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়।

● **সোডা ভষ্ম**

সোডা ভষ্ম মূলতঃ গ্লাস, কাগজ, সাবান এবং ডিটারজেন্ট তৈরীতে লাগে। গুজরাট, ওখা, মিঠাপুর এবং ধ্রানগাধরাতে (Dharangadhra) সোডা ভষ্ম তৈরীর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। কারণ, এইসব স্থানে সোডা ভষ্ম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যথা সোডিয়াম ক্লোরাইড, চুনাপাথর প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। অন্যান্য কেন্দ্রগুলি হল সূত্রপদ, বারানসী, নাঙ্গাল এবং তুতিকোরিন। সোডা ভষ্ম উৎপাদন 1950–51 সালের পরবর্তী সময় থেকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950–51 সালে যেখানে 46 হাজার টন সোডা ভষ্ম উৎপাদিত হয়েছিল, 1991–92 সালে তা 1,409 হাজার টন ও 1993–94 সালে তা বেড়ে 1,544 হাজার টন এ পৌঁছায়। অবশ্য 1995–96 সালে এর পরিমান কমে 1,464 হাজার টন হয়েছে।

● **কষ্টিক সোডা**

1936 সালে মেত্তুরে (mettur) প্রথম কষ্টিক সোডা উৎপাদনকারী কারখানা তৈরী হয়। টেক্সটাইল, সাবান, ডিটারজেন্ট এবং অ্যালুমিনা শিল্পে এটি ব্যবহৃত হয়। এটির সহ উৎপাদক (by product) ক্লোরিন হল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ যা বিভিন্ন শিল্প যেমন, জল বিশুদ্ধিকরন শিল্প, কাগজ শিল্প, সাবান ও ডিটারজেন্ট শিল্পে ব্যবহার করা হয়। এই শিল্প বার্ষিক প্রায় 6% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং 1950–51 সালে কষ্টিক সোডা উৎপাদনের (12 হাজার টন) প্রায় হাজারগুন (1,353 হাজার টন) বৃদ্ধি পেয়েছে 1995–96 সালে। কষ্টিক সোডা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সাধারন লবণ ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমান পাওয়া যায়। কষ্টিক সোডা উৎপাদনের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি মূলতঃ পোরবন্দর, থাণে, কল্যান, মিঠাপুর ও টিটাগড়ে অবস্থিত।

❍ ভারী জৈব রাসায়নিক পদার্থ ❍

● **পেট্রোকেমিক্যালস বা পেট্রোরাসায়নিক**

পেট্রোলিয়াম থেকে উদ্ভূত রাসায়নিক পদার্থ ও যৌগকে বলা হয় পেট্রোরাসায়নিক। এই পদার্থগুলি থেকে কৃত্রিম তন্তু, কৃত্রিম রাবার, প্লাস্টিক, রঙ-সামগ্রী, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ভারতে এই শিল্পের বয়স মাত্র 40 বছর। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাই একে **'উদীয়মান শিল্প' বা 'Sunrise Industry'** বলা হয়।

এটি একটি দ্রুত বর্ধিত শিল্প এবং এর বার্ষিক বৃদ্ধির হার 12–15%। প্রথম পেট্রোলিয়াম কেন্দ্র স্থাপিত হয় ট্রম্বেতে, 1966 সালে। সেই কেন্দ্রের নাম ছিল ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড। 1969 সালে দ্য ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যাল করপোরেশন লিমিটেড (IPCL) প্রস্তুত করা হয়। এই সংস্থাটির 3টি শাখা রয়েছে। পেট্রোফিলস কোঅপারেটিভ লিমিটেড (PCL) হল ভারত সরকার এবং ওয়েভারস্ কোঅপারেটিভ সোসাইটির মিলিত একটি সংস্থা। এটি পলিস্টার ফিলামেন্ট ইয়ারন এবং নাইলন ফিলামেন্ট ইয়ারন প্রস্তুত করে।

পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে উন্নতির হার দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1979–80 সালে যেখানে 29.73 লাখ টন পেট্রোকেমিক্যাল প্রস্তুত হত, 1995–96 সালে তার পরিমান বেড়ে হয় 35 লক্ষ টন এবং 2005 সালে এর পরিমান হতে পারে 80 লক্ষ টন। ক্রমবর্ধমান পেট্রোকেমিক্যাল এর চাহিদার কথা মাথায় রেখে ভারত সরকার অনেকগুলি বৃহৎ পেট্রোকেমিক্যাল কেন্দ্র গঠনের পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছে।

কিছু কিছু নতুন পেট্রোকেমিক্যাল কেন্দ্রকে কোয়ালির তেল শোধনাগার এর নিকটে স্থাপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বারাউনি, হলদিয়া, চেন্নাই এর তৈল শোধনাগার এর কাছে নতুন পেট্রোকেমিক্যাল কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এইসব পদক্ষেপ ভারতকে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে স্বনির্ভর করে তুলেছে, এমনকি ভারতকে পেট্রোকেমিক্যাল

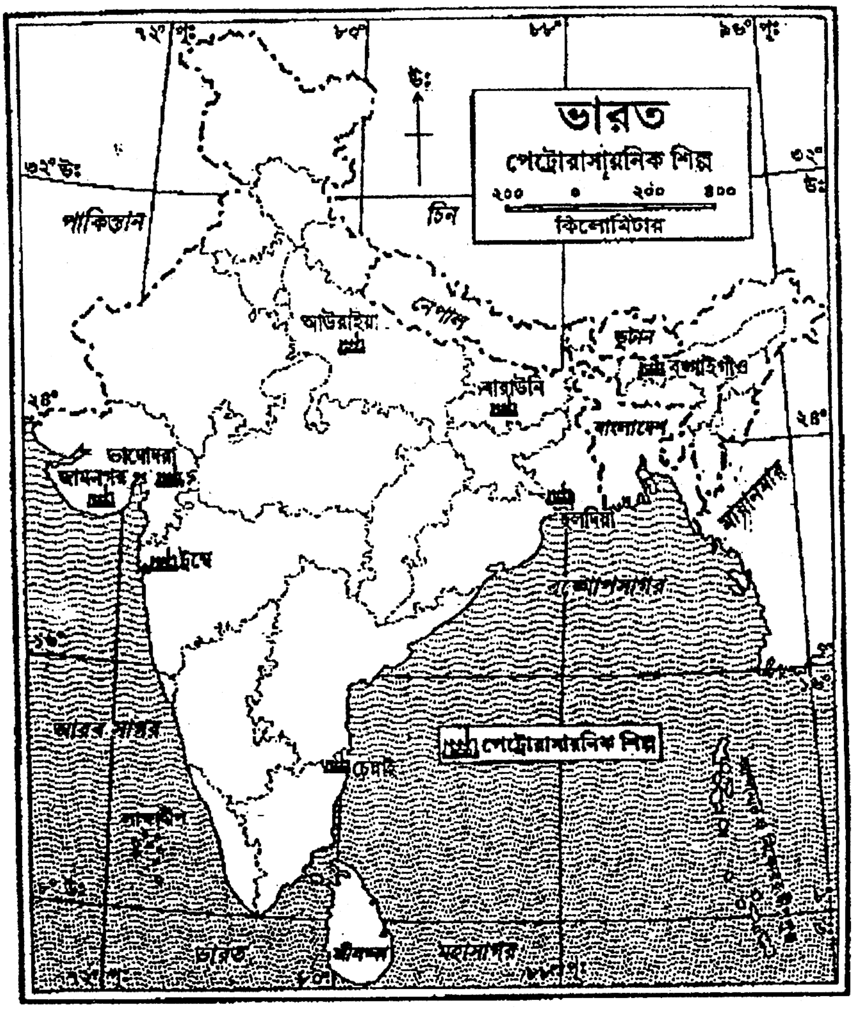

চিত্র 3.73 ঃ ভারতের পেট্রোরাসায়নিক শিল্পকেন্দ্র

শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানিতেও সক্ষম করে তুলেছে। 1993-94 সালে প্লাস্টিক থেকে নির্মিত দ্রব্য এবং কৃত্রিম তন্তুর রপ্তানির মূল্যমান ছিল যথাক্রমে 815 কোটি টাকা এবং 514 কোটি টাকা।

● **সার ঃ**

ভারতীয় মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস, এবং পটাশিয়াম প্রভৃতি উর্বরতা বৃধ্বিকারী উপাদানের অভাব থাকায় এই মৃত্তিকা উচ্চ ফলনশীল নয়। উৎপাদন ক্ষমতার বৃধ্বির জন্য তাই এই মৃত্তিকায় বিভিন্ন রাসায়নিক সার দেওয়া প্রয়োজন। রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব হয়েছে বলা যায়। 1950–51 সালে যেখানে 50.8 মিলিয়ন টন খাদ্য দানা উৎপন্ন হয়েছিল সেখানে এর পরিমান 1994–95 সালে হয় 191 মিলিয়ন টন। এক বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানো এবং উদ্বৃত্ত খাদ্য বিদেশে রপ্তানি ঘটানোর জন্য কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজন এবং এর জন্য প্রয়োজন সার উৎপাদনের পরিমান বাড়ানো। শুধুমাত্র দেশের চাহিদা মেটানোর জন্যই সার উৎপাদন প্রয়োজন নয়। দেশের খাদ্য শস্যের (food grains) পরিমান বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন এদেশে সারের উৎপাদন বৃধ্বি পাওয়া। 1951–52 সালে যেখানে প্রতি হেক্টরে 0.55 কিলোগ্রাম সার ব্যবহৃত হত সেখানে 1980–81 সালে প্রতি হেক্টরে 32 কিলোগ্রাম সার, এবং বর্তমানে প্রতি হেক্টরে 70 কেজি সার ব্যবহৃত হচ্ছে। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য হল পাঁচ বছরে নূন্যতম 30% উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যশষ্য উৎপাদন পাঁচ বছরে 250 মিলিয়ন টন করা। তুলা উৎপাদন 5 বছরে 190 লক্ষ বেল এবং 5 বছর তৈলবীজ 26 মিলিয়ন টন করা, এবং চিনির উৎপাদন 5 বছর পর 320 মিলিয়ন টন করা। সেইজন্য সারের উৎপাদন বাড়ানো জরুরী। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশন জানিয়েছে এই পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ 2002–2003 এ উৎপাদন বেড়ে হবে 13.9 থেকে 14.2 মিলিয়ন টন।

স্থানীয়করন ঃ বেশির ভাগ সার উৎপাদন কেন্দ্রগুলি তৈল পরিশোধন কেন্দ্রের নিকটে অবস্থিত হয়। কারণ নাইট্রোজেন সার উৎপাদনকারী প্রায় 70 সংস্থা কাঁচামাল হিসেবে ন্যাপথা ব্যবহার করে, যা তৈল পরিশোধন কেন্দের অবশেষ পদার্থ রূপে পাওয়া যায়। কিছু সারের উৎপাদনে স্টীল গ্লাস, কোক অথবা লিগনাইটেরও প্রয়োজন রয়েছে। ফসফেটিক সার উৎপাদনে মূলতঃ খনিজ ফসফেট এর প্রয়োজন যা ভারতের উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে পাওয়া যায়। কিছু উৎপাদন কেন্দ্র আবার আমদানীকৃত ফসফেটের ওপর নির্ভরশীল। সার উৎপাদনের জন্য সালফার হল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান, যা সার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এটি তামিলনাড়ুতে পাওয়া যায়। রেল এবং পাইপ লাইনের সাহায্যে ন্যাপথা ও গ্যাস সরবরাহ বর্তমানে সামুদ্রিক এলাকায় সার উৎপাদন করতে সাহায্য করেছে।

বৃধ্বি ও বিতরন ঃ 1906 সালে তামিলনাড়ুর রানিপেট এ প্রথম সুপার ফসফেট ফ্যাক্টরি প্রস্তুত হয়। যদিও এই শিল্পে প্রকৃত উন্নতি ঘটে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। ফার্টিলাইজার করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া (FCI) 1951 সালে স্থাপিত হবার পর থেকে সার উৎপাদন শিল্পকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

এই শিল্পটি বর্তমানে অতি দ্রুতগতিতে প্রসারতা লাভ করেছে। বিভিন্ন ধরনের মাটির উপযোগী সার এরা বানিয়ে থাকে। নাইট্রোজেনাস বা নাইট্রোজেন উদ্ভুত সার তৈরীতে ভারত বর্তমানে বিশ্বে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। বর্তমানে প্রায় 68টি সার তৈরীর কারখানা রয়েছে, যারা নাইট্রোজেন উদ্ভুত সার তৈরী করে। এদের মধেয অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরী করার জন্য 9টি সার তৈরীর কারখানাও রয়েছে। এছাড়া 80টি ইউনিট সুপার ফসফেট তৈরী করে থাকে। যদিও নাইট্রোজেন উদ্ভূত সার এবং সুপার ফসফেট উভয় প্রকৃতির সারের উৎপাদনই বছরের পর বছর বৃধ্বি পেয়েছে কিন্তু নাইট্রোজেন উদ্ভূত সারের উৎপাদনই বেশি। 1950–51 সালে সুপার ফসফেট সার এবং নাইট্রোজেন উদ্ভূত সার উভয়েরই উৎপাদন ছিল 9 হাজার টন। 1995–96 সালে ফসফেট সারের পরিমান কমে দাঁড়ায় 2,552 হাজার টন যেখানে ঐ একই সময়ে 8,762 হাজার টন। নাইট্রোজেন উদ্ভূত সারের উৎপাদন ছিল।

প্রধান প্রধান সার উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হল গুজরাট, তামিলনাড়ু উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং কেরালা। অনেকগুলি ব্যক্তিগত, বেসরকারী সংস্থাও সার তৈরীতে নিযুক্ত।

(Public sector undertakings) ঃ রাসায়নিক সার তৈরীতে জনগন অধিকৃত সংস্থা (Public Sector undertakings) গুলিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে এইরূপ ন'টি সংস্থা রয়েছে।

(1) **দ্য ফার্টিলাইজার করপোরেশন অব ইন্ডিয়া (FCI) ঃ** এই সংস্থাটি 1961 সালে নিগমবন্ধ (incorporate) হয় এবং এর চারটি ইউনিট যথা সিন্ধ্রি (বিহার), তেলচের (উড়িষ্যা), গোরক্ষপুর (উত্তরপ্রদেশ), রামাগুন্ডাম (অন্ধ্রপ্রদেশ)। এই সংস্থা মোট 8.06 লক্ষ টন নাইট্রোজেন উৎপাদনে সক্ষম।

(2) **দ্য ন্যাশনাল ফার্টিলাইজারস লিমিটেড (NFL) ঃ** এই সংস্থাটি 1974 সালের 23শে আগষ্ট স্থাপিত হয় এবং এর মোট পাঁচটি ইউনিট রয়েছে যথা নাঙ্গাল (নাইট্রেট প্ল্যান্ট), নাঙ্গাল (ইউরিয়া প্ল্যান্ট), ভাতিণ্ডা, পানিপথ এবং বিজয়পুর। এর 10.36 লক্ষ টন নাইট্রোজেন উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। এটিই ভারতের সর্ববৃহৎ নাইট্রোজেন উদ্ভূত সার উৎপাদনকারী সংস্থা।

(3) **দ্য ফার্টিলাইজারস অ্যাণ্ড কেমিক্যালস ট্রাভানকোর লিমিটেড (FACT) ঃ** এই সংস্থাটির তিনটি নিয়ন্ত্রনাধীন সংস্থা (unit) রয়েছে। একটি আছে উদ্যোগামান্ডালে এর আর দুটি রয়েছে কোচিতে।

(4) **দ্য রাষ্ট্রীয় কেমিক্যালস এ্যাণ্ড ফার্টিলাইজারস লিমিটেড (RCF) ঃ** এটি মূলতঃ ট্রম্বে প্ল্যান্টের দায়িত্বে রয়েছে।

(5) **দ্য হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার করপোরেশন লিমিটেড (HFCL) ঃ** এই সংস্থাটির মোট 6.54 লক্ষ টন নাইট্রোজেন উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। এর নিয়ন্ত্রনাধীন 5টি ইউনিট রয়েছে। তিনটি রয়েছে আসামের নামরূপে, এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর এবং বিহারের বারাউনি তে একটি করে ইউনিট রয়েছে।

(6) **দ্য মাদ্রাস ফার্টিলাইজারস লিমিটেড (MFL) ঃ** এটি ভারতীয় সরকার এবং ভারতীয় তেল কোম্পানির একটি যৌথ সংস্থা। মানালীতে এর প্ল্যান্টে বার্ষিক 1.76 লক্ষ টন নাইট্রোজেন এবং 1.2 লক্ষ টন ফসফেট উৎপন্ন হয়।

(7) **পাইরাইটস, ফসফেট অ্যাণ্ড কেমিক্যালস লিমিটেড (PPCL) ঃ** এই সংস্থাটি 1960 সালের মার্চ মাসে স্থাপিত হয়। এটি মূলতঃ বিহারের আমজোর এ গচ্ছিত পাইরাইট পরীক্ষা এবং শুধ-সুপার ফসফেট (Single super) উৎপাদন করে থাকে।

(8) **প্রোজেক্ট এবং ডেভেলপমেন ইণ্ডিয়া লিমিটেড (PDIL) ঃ** এই সংস্থাটি বিভিন্ন সার উৎপাদক এবং তৎসম্বন্ধীয় রাসায়নিক প্ল্যান্ট তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরীতে, গঠন সংক্রান্ত বিষয়েও তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত থাকে।

(9) **পারাদীপ ফসফেট লিমিটেড ঃ** 1981 সালের ডিসেম্বর মাসে একটি স্থাপিত হয়। এটি মূলতঃ উড়িষ্যার পারাদীপে ফসফেটিক সার নির্মান কেন্দ্র তৈরী করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সমবায় বা সহযোগী সংস্থা ঃ সমবায় বা সহযোগী সংস্থার (Sector) মধ্যে দুটি সংস্থা (organisation) অত্যন্ত সক্রিয়, যথা ইন্ডিয়ান ফার্মারস ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড (IFFCO) এবং কৃষকভারতীয় কোঅপারেটিভ লিমিটেড (KRIBHCO)। প্রথম সংস্থাটি 1975 সালে এবং দ্বিতীয় সংস্থাটি 1985 সালে স্থাপিত হয়। IFFCO এর 4টি সহযোগী ইউনিট আছে যথা, কালোল এবং কাণ্ডলা, এবং ইউ. পি. এর ফুলপুর এক আওনলা। KRIBHCO এর নিয়ন্ত্রনাধীন একটি গ্যাস নির্ভর ইউরিয়াম্যোনিয়া উৎপাদনকারী সংস্থা যা গুজরাটের হাজরিয়াতে অবস্থিত। IFFCO এবং KRIBHCO এর মোট উৎপাদন ক্ষমতা হল 13.31 লক্ষ টন নাইট্রোজেন এবং 3.09 লক্ষ টন ফসফেট।

ব্যক্তিগত সংস্থা ঃ সার উৎপাদনের জন্য বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত সংস্থাও রয়েছে যথাঃ কানপুর IEL, কোটার SKC, দিল্লীর DCM, ব্রোচের GNFC এবং বিশাখাপত্তনমের করমণ্ডল, গোয়ার ZACL ইন্দেরের EID Pary, ভাদোদরার GSFC ইত্যাদি।

আমদানি ঃ অনেকদিন থেকেই সারের উৎপাদন এবং সার খরচের পরিমানের মধ্যে বিশাল পার্থক্য ছিল এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থক্যের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও স্বদেশীয় সার উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সার উৎপাদন ও খরচের মধ্যে পার্থক্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। 1980–81 সালে এই পার্থক্য ছিল 2,75.1 হাজার টন, 1994–95 সালে এই পার্থক্য ছিল 3,131.0 হাজার টন, 1993–94 সালে এই পার্থক্য ছিল 3,173.0 হাজার টন। দেশের প্রয়োজনীয় সারের 1/4 অংশ চাহিদাই মেটে আমদানীকৃত সার থেকে। ভারত মূলতঃ ইউ. এস. এ, রাশিয়া, কানাডা, জাপান এবং কিছু ইউরোপীয় দেশ থেকে সার আমদানী করে।

❑ সিমেন্ট শিল্প ❑

সিমেন্ট গঠনমূলক কাজ এবং বাড়ি তৈরীর জন্য অপরিহার্য এবং এই শিল্পকে দেশের প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরীর প্রানকেন্দ্র বলে গণ্য করা হয়। এটি ভারতের একটি অগ্রগণ্য শিল্পস্বরূপ। ভারতের মোতো উন্নয়ণশীল দেশে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য সিমেন্ট শিল্প গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার কে থাকে। মাথাপিছু জনগনের সিমেন্টের খরচই দেশের জনগনের অর্থনৈতিক উন্নতির সূচক বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষের গড় মাথাপিছু সিমেণ্ট খরচ 1995 সালের হিসেব অনুসারে 71 কেজি, যেখানে সমগ্র পৃথিবীর মাথাপিছু সিমেণ্ট খরচ 240 কেজি। এটি উন্নত দেশগুলির তুলনায় যথেষ্টই কম এবং এক্ষেত্রে উন্নতির উপায়ও রয়েছে। বর্তমানে ভারত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম সারিতে, যদি এই ধারা বজায় থাকে তবে 2002 সালে মাথাপিছু সিমেণ্ট খরচ 85 কেজি হতে পারে এবং দেশের দ্রুত বর্ধনশীল জনতার কথা মাথায় রেখে বলা যায় 2010 সাল নাগাদ এর পরিমান দাঁড়াবে 130 কেজি।

অবস্থানজনিত কারন (Locational Factor) ঃ সিমেণ্ট উৎপাদনের জন্য কতগুলো ভারী এবং লঘুভার (Weight loosing) পদার্থ প্রয়োজন এবং এটি মূলতঃ কাঁচামাল নির্ভর শিল্প। মোট উৎপনেনের 60–65% এর জন্যই এই শিল্পের মূল কাঁচামাল চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। এক টন সিমেন্ট উৎপাদনের জনয 1.5 টন চুনাপাথর প্রয়োজন। সুতরাং, চুনাপাথরের উৎস স্থানের ওপরেই সিমেণ্ট উৎপাদন কেন্দ্র স্থান নির্ভর করে। অন্যান্য কাঁচামালগুলি প্রধানতঃ বিভিন্ন সামুদ্রিক ডিম, শম্বুক, কচ্ছপ, মাছের শক্তবহিরাবরণ (Sea shell), স্টীল প্ল্যান্ট থেকে প্রাপ্ত Slug (গাদ) বিভিন্ন সার উৎপাদন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত Slug এবং এই কাঁচামালগুলির প্রাপ্তির উপর এই সিমেণ্ট শিল্প কারখানা স্থাপন কেন্দ্র নির্ভর করে। সিলিকা (20–25%) এবং অ্যালুমিনা (5–12%) প্রভৃতিও সিমেণ্ট তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। সিমেণ্ট জমার সময় নির্ধারণ করতে জিপসাম এর ব্যবহার ও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন কাঁচামাল চূর্ণবিচূর্ণ করতে, চুনাপাথর ঝামা করতে (Clinkerisation) বিদ্যুৎ শক্তি (Power) ব্যবহৃত হয়। পুরোনো প্ল্যান্টগুলির সিমেণ্ট তৈরী করতে 120–130 ইউনিট প্রতি টনে উৎপাদন প্রয়োজন সেখানে নতুন সুদক্ষ শক্তির প্ল্যান্টগুলির 80–90 ইউনিট প্রতি টনে প্রয়োজন। ক্লিংকার বা ঝামা তৈরী করতে কোল (Coal) এর সঙ্গে চুনাপাথর মিশিয়ে পোড়াতে হয়। তাই বলা যায় কোল হল বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি সরবরাহক। কোল শুধু দাহ্য বস্তু হিসেবেই নয় বরং চুনাপাথর পোড়াতেও ব্যবহার করা হত। এছাড়া 1 টন সিমেণ্ট প্রস্তুত করতে 4 Kg জিপসাম, 0.4 Kg বক্সাইট, এবং 0.2 Kg কাদার প্রয়োজন।

সিমেণ্ট শিল্পের কাঁচামালগুলি রেল এবং সড়কের মধ্যে দিয়ে সরবরাহ করা হয়। তাই উৎপাদনকেন্দ্রগুলি যদি

বাজারের নিকটে হয় তাহলে সরবরাহ বাবদ খরচ কমে আসবে। প্রকৃতপক্ষে, যে কোন শিল্পের জন্য তৈরী বাজার (ready market) হল সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। তাই ভারতীয় সিমেন্ট শিল্পের উন্নতির অনুকূল ব্যবস্থাগুলি হল

(1) কাঁচামালের প্রাপ্তি (availability)

(2) উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা

(3) বাজারের চাহিদা

সিমেন্ট শিল্পের বিকাশ ঃ 1904 সালে চেন্নাই এ একটি সামুদ্রিক আগাছা পূর্ণ চুনাপাথরের উৎস আবিষ্কৃত হবার পর খারতে সর্বপ্রথম সিমেন্ট শিল্প স্থাপিত হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং 1912–13 সালে প্রকৃতই সফল একটি প্রচেষ্টা করা হয় যখন ভারতীয় সিমেন্ট কোং লিমিটেড পেরাবন্দরে একটি প্ল্যান্ট স্থাপন করে। প্রথম বিশ্বযুধ ভারতীয় সিমেন্ট শিল্পের অগ্রগতি ঘটায়। এর ফলস্বরূপ, কাটনি (Katni) সিমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোং লিমিটেড মধ্যপ্রদেশে 1915 সালে সিমেন্ট উৎপাদন শুরু করে। লাখারিতে 1916 সালে কিল্লিক নিক্সন'স বান্ডি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কোং স্থাপিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তী চাহিদা মেটাবার জন্য কয়েকটি কোম্পানি স্থাপিত হয়। গুজরাটের দ্বারকায়, বিহারের জাপলাতে, মধ্যপ্রদেশের বানমোর, মেহগাঁও, কাইমোর এবং কর্ণাটকের শাহবাদ এ 1922–23 সালে সিমেন্ট উৎপাদনকারী কোম্পানি স্থাপিত হয়। 1934 সালে থাকা মোট 11টি কোম্পানির মধ্যে 10টি কোম্পানি অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্নানি লিমিটেড (ACC) এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। 1937 সালে ডালমিয়া সিমেন্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে সিমেন্ট শিল্পের পরিমাণও বৃধি পায়। 1950–51 সালে যেখানে 21টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী সংস্থা ছিল, 1979–80 সালে 56টি সংস্থা গড়ে ওঠে এবং 1990–91 সালে এর সংখ্যা 92-তে পৌঁছায়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে 107-টি বড় প্ল্যান্ট গড়ে উঠেছে এবং এদের উৎপাদনের ক্ষমতা হল 79 মিলিয়ন টন। এছাড়াও 350 টি ছোট সিমেন্ট প্ল্যান্ট রয়েছে। এই সংস্থাগুলি দিনে 200–300 টন সিমেন্ট উৎপাদন করে থাকে। এই সব ছোটখাটো সংস্থাগুলি প্রধানতঃ গ্রামে এবং প্রত্যন্ত জায়গায় সহজেই সিমেন্ট সরবরাহ করে থাকে।

বর্তমানে সিমেন্ট উৎপাদন আশানুরূপ ভাবে বৃধি পেয়েছে। 1950–51 সালে যেখানে 27 লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদিত হত, 1960–61 সালে তার পরিমাণ বেড়ে হয় 80 লক্ষ টন, 1970–71 সালে তার পরিমান 143 লক্ষ টন 1980–81 সালে এর পরিমান হয় 187 লক্ষ টন, এবং 1994–95 সালে 624 লক্ষ টন সিমেন্ট এবং 1995–96 সালে 693 লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয়। এইভাবে উন্নতি হবার ফলে বর্তমানে সিমেন্ট উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। ভারতের আগে রয়েছে চীন, জাপান এবং আমেরিকা। মনে করা হচ্ছে 2010 সাল নাগাদ এক্ষেত্রে ভারত চীনের পরেই অবস্থান করবে।

শিল্পের বিতরণ/বিস্তার (distribution) ঃ সিমেন্ট শিল্পের বিস্তারের দিকে একবার লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই শিল্প মূলতঃ বিন্ধ্য শ্রেণীকে (Bhindhyan range) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পূর্ব রাজস্থান থেকে শুরু করে দক্ষিণ বিহার অবধি যেখানে চুনাপাথর প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়, সিমেন্ট শিল্পও সেখানেই গড়ে উঠেছে। উত্তরের অঞ্চলগুলিতে চুনাপাথরের পরিমান কম থাকায় সেখানে সিমেন্ট শিল্পের কারখানা বেশি নেই। সিমেন্ট শিল্পের কারখানার (Factory) জন্য প্রয়োজনীয় 86% কাঁচামাল এবং উৎপাদনের (Production) জন্য প্রয়োজনীয় 75% কাঁচামাল মূলতঃ মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, তামিলনাড়ু কর্ণাটক এবং বিহার থেকে পাওয়া যায়।

● **মধ্যপ্রদেশ ঃ** মধ্যপ্রদেশ বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ সিমেন্ট-উৎপাদনকারী রাজ্য। 1970 সালে যেখানে এই রাজ্য মোট সিমেন্ট উৎপাদনের 14.4% উৎপাদন করতো 1982 সালে তা বেড়ে হয় 21.7% এবং 1993–94 সালে এই রাজ্য সমগ্র দেশের সিমেন্ট উৎপাদনের 22.5% উৎপাদন করত। বর্তমানে রাজ্যের 14টি সিমেন্ট

উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। এই রাজ্যের মূল উৎপাদন কেন্দ্র হল সাটনা, কাইমুর, কাটনি, মাইহার, মুমন্ধার, গোপালনগর, দ্রুগ, অকালতারা, জামুল, বানমোর ও তিলডা। বিভিন্ন নতুন প্ল্যান্ট (উৎপাদন কেন্দ্র) প্রধানতঃ বর্তমানে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিমেন্ট উৎপাদনকারী রাজ্য। এই রাজ্যের শেয়ার 1970–71 সালের 10.5% থেকে বর্তমানে 1993–94 সালে 18.2% হয়েছে। মোট 18টি উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে বেশির ভাগই তেলেঙ্গানা বলয়ে অবস্থিত। প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি হল পেদ্দাপল্লি, কৃষ্ণা, করিমনগর, সিমেন্ট নগর, বিজয়াওয়াড়া, পানিয়ণ, মাচেরলা, মানচেরিয়াল, তন্দুর, বিশাখাপত্তনম, বিজিয়ানাগ্রাম, নাদিকুণ্ডী, ইরানগুন্টালা ইয়েরানগুন্টালা, আদিলাকান্দ ইত্যাদি।

● **রাজস্থান ঃ** রাজস্থান হল তৃতীয় বৃহত্তম সিমেন্ট উৎপাদনকারী রাজ্য। ভারতের মোট উৎপাদনের 11% এই রাজ্য উৎপাদন করে থাকে। প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি হল সাওয়াই, মাধোপুর, লাখেরি, চিত্তাযুরগড়, উদয়পুর, নিম্বাহেডা এবং সিরোহি।

● **গুজরাট ঃ** 1970 সালে যেখানে গুজরাট 12.8% সিমেন্ট উৎপাদন করতো, 1993–94 সালে তার পরিমান হয়েছে 4.7%। এর থেকে বোঝা যায় গুজরাটের সিমেন্ট শিল্পের অবনতি ঘটেছে। সমগ্র ভারতে মধ্যে সিমেন্ট উৎপাদনে এই রাজ্য চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। এই রাজ্যের প্রধান প্রধান সিমেন্ট উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হল—সিকা, সেভোলিয়া ওখা, পোরবন্দর, দ্বারকা, ভাদোদরা, রানাভব, বেরাভার এবং ভবনগর।

● **তামিলনাড়ু ঃ** সত্তরের দশকে তামিলনাড়ু 17.1% সিমেন্ট (সমগ্রদেশের উৎপাদনের সাপেক্ষে) উৎপাদন করলেও বর্তমান এই রাজ্যের সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমান হ্রাস পেয়েছে। 1993–94 সালে তামিলনাড়ু 8.5% সিমেন্ট উৎপাদন করেছে। বর্তমানে তামিলনাড়ুতে 8টি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। এগুলি হল তালাইয়ুথু, আলানগুলাম, তুলুকাপাট্টি, ডালমিয়াপুরম, পোলিয়ুর, সানকারিদার্গ এবং মাধুক্কারাই।

● **কর্ণাটক ঃ** কর্ণাটকে 8টি সিমেন্ট উৎপাদন কেন্দ্র বর্তমান। এগুলি হল বাগালকোট, ভদ্রাবতী, শাহবাদ, আম্বাসাওদ্রাম, ব্যাঙ্গালোর, এবং ক্রুকুন্টা।

রপ্তানি ঃ বর্তমানে ভারত একটি প্রধান সিমেন্ট রপ্তানীকারক দেশ। 1989 সালে ভারত 1.6 লক্ষ টন সিমেন্ট রপ্তানি করেছিল। এরপর থেকে ভারতের সিমেন্ট রপ্তানির পরিমান বাড়তে থাকে এবং 1994-95 সালে 33.8 লক্ষ টন সিমেন্ট ভারত রপ্তানী করে। ভারতের সিমেন্ট ক্রয়কারী দেশগুলি হল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান এবং পশ্চিম এশিয়র কিছু দেশ। এইসব দেশে চুনাপাথরের উৎস না থাকায় এবং সিমেন্ট শিল্প গড়ে না ওঠায় এই সব দেশের ভারতীয় সিমেন্টের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে।

❑ খাদ্য এবং তৎসম্বন্ধীয় শিল্প ❑
(Food and allied industries)

খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিল্প 'খাদ্য এবং তৎসম্বন্ধীয় শিল্প' এর মধ্যে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শিল্পের নাম করা যায়, যেমন চিনি, ভোজ্যতেল, বনস্পতি, ময়দা উৎপাদন, চাল উৎপাদন, অ্যালকোহল উৎপাদন ইত্যাদি শিল্প।

❍ চিনি শিল্প ❍

চিনি প্রধানতঃ আখ, এবং অন্যান্য শর্করা সমন্বিত শস্য থেকে উৎপাদন করা হয়। কার্পাস তন্তু শিল্পের পর

বর্তমানে এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প। ভারত বিশ্বে আখ উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। প্রথম স্থানে রয়েছে কিউবা। কিন্তু এর সঙ্গে যদি গুড় এবং খান্দসারিকে ধরা হয় তবে ভারতের স্থান সর্বপ্রথমে রয়েছে। এই শিল্পে মোট 1,250 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং এর ফলে 2.86 লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। 2.50 কোটি আখ চাষিও এই শিল্পের ফলে লাভবান হয়েছে।

● বৃদ্ধি এবং উন্নতি ঃ

ভারত একটি ঐতিহ্যশালী আখ উৎপাদনকারী দেশ। এমনকি অথর্ববেদেও ভারতের চিনি উৎপাদনের কথা পাওয়া যায়। ভারতকে সত্যিই "আখের বাসভূমি" বলা যায়। প্রাচীন কালে কেবলমাত্র গুড় এবং খান্দসারি তৈরী করা হত এবং 19 শতকের মাঝামাঝি ভারতে আধুনিক চিনি শিল্প শুরু হয় যখন একটি ডাচ সংস্থা 1840 সালে উত্তর বিহারে এই শিল্প প্রতিষ্ঠা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। প্রথম সফল উদ্যোগ এক্ষেত্রে ঘটে যখন কৃষিজ নীল উৎপাদকেরা, 1903 সালে পুরসা, প্রতাবপুর, বারাচাকিয়া এবং মারহাওড়া ও উত্তর পূর্ব উত্তর প্রদেশে ভ্যাকুয়াম প্যান মিল বা বায়ুনিরুদ্ধ প্যান মিল প্রতিষ্ঠা হবার জন্য, চিনি উৎপাদন শুরু করেন। বায়ুনিরুদ্ধ প্যান মিলের সাহায্যে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হবার ফলে এই সময় কৃষিজ নীলের চাহিদা কমতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে এই শিল্প অত্যন্ত মন্থর ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং 1920–21 সালে যেখানে 18টি মিল ছিল, 1930–31 সালে এর পরিমান বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র 29টিতে 1931 সালে রাজকোষ সংক্রান্ত সুরক্ষা (fiscal protection) এর জন্য এই শিল্পের প্রভূত প্রসার ঘটেছিল এবং 1936–37 সালে 137টি মিল গড়ে উঠেছিল। এই সময়ের মধ্যে উৎপাদন 1.58 লক্ষ টন থেকে 9.19 লক্ষ টনে বর্ধিত হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এবং এরপরে এই শিল্প অত্যন্ত মন্দা এবং অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলেছিল। 1950–51 সালের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়। 1950–51 সালে 139টি মিল 11.34 লক্ষ টন চিনি উৎপাদন করতো এবং এর পর পরিকল্পনা পর্ব (Plan Period) শুরু হওয়ায় এই শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং 1994–95 সালে মিলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 420 টিতে এবং উৎপাদনের পরিমান বেড়ে হয় 148 লক্ষ টন চিনি।

সারণি ঃ চিনির উৎপাদন (লক্ষ টনে)

বছর	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	2000–2001	2001–02	2002–03
উৎপাদন	1134	3029	374	5448	12047	192	185	189

উৎস ঃ (i) Economic Survey, 2004–05

(ii) Statistical Abstract India, 2003

সারণি থেকে দেখা যায় বছরের পর বছর চিনি উৎপাদনে ভারতের বৈচিত্র্য বেশি এবং দীর্ঘ সময়ের ভিত্তিতে এক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। 1991–92 সালে যেখানে 132.77 লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হয়ে ছিল 1992–93 সালে তার পরিমান হয় 105.62 লক্ষ টন, 1993–94 সালে তা কমে হয় 98 লক্ষ টন কিন্তু 1994–95 সালে এটি বেড়ে 148 লক্ষ টন হয় এবং 1995 সালে রেকর্ড পরিমাণ 165.05 লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হয়।

● চিনি শিল্পের স্থান ঃ

চিনি শিল্পের কাঁচামাল আখ যা ভারী, ওজনহ্রাসকারী এবং সহজে পচে যায়, আখ অনেক দিনের জন্য সংরক্ষন করা যায় না কারণ এর জন্য এর মধ্যে সুক্রোজ এর ঘাটতি ঘটতে পারে। যেহেতু পরিবহন খরচ বেশি তাই বেশি দূর পর্যন্ত একে পরিবহন করে নিয়ে গেলে চিনি উৎপাদনের খরচ বেড়ে যায় এবং এতে রসের পরিমান

কমতে থাকে। চিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের 50 শতাংশই আসে আখ থেকে। সাধারণতঃ 10 থেকে 12 টন চিনি উৎপাদনের জন্য 100 টন আখ প্রয়োজন। এমনকি বর্তমানে 20 থেকে 25 কি.মি. দূরত্ব পর্যন্ত উৎপাদিত আখ সমূহ বলদ গাড়ী করে নিয়ে যাওয় হয়। ট্র্যাকটর, ট্রাক, রেলওয়ে ওয়াগন ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে 70 থেকে 75 কি.মি. দূরত্ব পর্যন্ত আখ পরিবহন করা সম্ভবপর হয়েছে। এর বেশি পরিবহন হলে উৎপাদনে খরচ বৃদ্ধি পাবে। এইজন্য চিনি শিল্পগুলি আখ উৎপাদন ক্ষেত্রের কাছাকাছি গড়ে ওঠে।

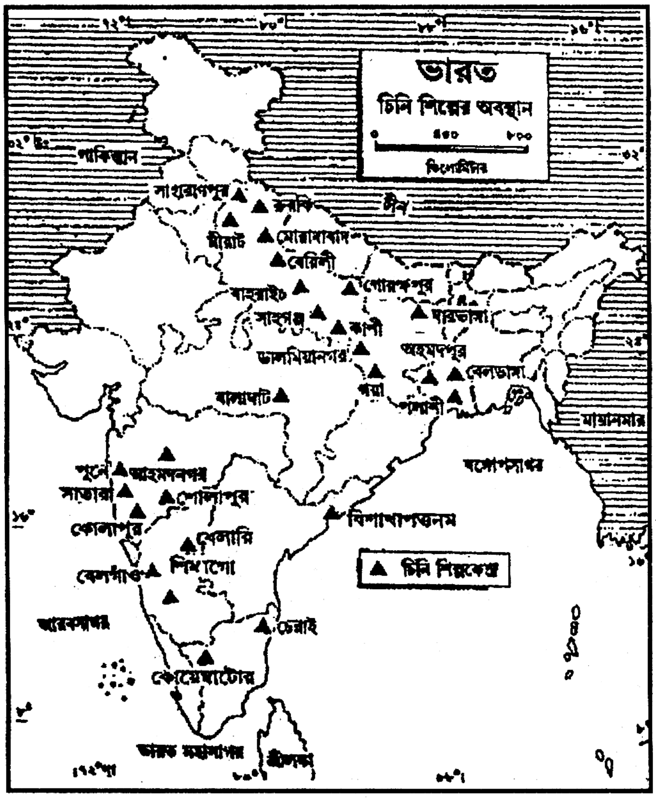

চিত্র 3.76 ঃ ভারতের চিনি শিল্পকেন্দ্র

● **বণ্টন ঃ**

চিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ভারতীয় চিনি উৎপাদন শিল্প মূলতঃ দুটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উত্তর ভাগে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, এবং পাঞ্জাব এবং দক্ষিণভাগে রয়েছে মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ।

মহারাষ্ট্র

মহারাষ্ট্র চিনি উৎপাদনে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। উত্তরপ্রদেশের চিনি উৎপাদনের প্রথম স্থান কেড়ে নিয়েছে এবং বর্তমানে মহারাষ্ট্র থেকে বেশি চিনি উৎপাদন হয়ে থাকে। আখের প্রচুর উৎপাদন, উচ্চফলন এবং দীর্ঘ পেষন বা শুষ্ককরন পর্বের (Long Crusphing) জন্য মহারাষ্ট্র ভারতে চিনি উৎপাদনে ঈর্ষনীয় স্থান অধিকার করেছে। মোট চিনি মিলের এক-চতুর্থাংশই এই রাজ্যে রয়েছে এবং সমগ্র ভারতের চিনি উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই

সারণি

1994–95 সালে চিনি শিল্পের বণ্টন

রাজ্য	লক্ষটনে উৎপাদন	ভারতজুড়ে শতকরা হার	ফ্যাক্টরির সংখ্যা	পেষনের সময় (দিনে)	চিনি নিষ্কাশন (শতকরা প্রতি আখে)	চিনি উৎপাদন প্রতি হেক্টরে
মহারাষ্ট্র	65.81	34.82	105	200	10.70	9.47
উত্তর প্রদেশ	45.69	24.17	110	176	9.05	5.25
তামিলনাড়ু	17.65	9.34	32	175	9.37	9.53
কর্ণাটক	11.51	6.09	30	134	10.38	7.15
অন্ধ্রপ্রদেশ	11.36	6.01	35	108	9.99	5.02
গুজরাট	10.51	5.56	16	166	10.95	8.88
হরিয়ানা	3.61	1.91	8	175	9.77	5.21
পাঞ্জাব	3.55	1.88	13	145	9.13	5.10
বিহার	3.28	1.74	28	99	8.99	4.76
অন্যান্য	16.03	8.48	43	—	—	—
ভারত	189.00	100	420	158	9.89	6.30

এই রাজ্যে হয়। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মহারাষ্ট্রের চিনি উৎপাদন কেন্দ্র অত্যন্ত বড়। মহারাষ্ট্রের মালভূমির পশ্চিমাংশে বিশাল পরিমানে চিনি মিল গড়ে উঠেছে। আহমেদ নগর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম কেন্দ্র এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি হল— কোলাপুর, সোলাপুর, সাতারা, পুনে এবং নাসিক।

উত্তরপ্রদেশ

উত্তরপ্রদেশ হল ঐতিহ্যশালী চিনি উৎপাদক রাজ্য। এবং দীর্ঘকাল ধরে এই রাজ্য আখ উৎপাদনে ভারতবর্ষে সেরা ছিল। যাই হোক, গত কয়েক বছরে এই রাজ্যের গুরুত্ব কমে এসেছে এবং এর ফলে বর্তমানে আখ উৎপাদনে মহারাষ্ট্রের স্থান প্রথম এবং উত্তরপ্রদেশের স্থান দ্বিতীয়। উত্তরপ্রদেশে মহারাষ্ট্র থেকে বেশি চিনি মিল থাকলেও সেগুলি তুলনামূলক ভাবে ছোট এবং কম পরিমানে উৎপাদনে সক্ষম। ভারতের মোট উৎপাদনের 28 শতাংশ চিনি উৎপাদনই এই রাজ্য থেকে হয়। এই রাজ্যে চিনি উৎপাদন দুটি অঞ্চলে হয়ে থাকে। পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে গোরক্ষপুর, দেওরিয়া, বাসতি, এবং গোন্ডা এবং মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চলে রয়েছে মিরাট, শাহারানপুর, মুজাফফর নগর, বিজনোর এবং মোরাদাবাদ।

তামিলনাড়ু

গত কয়েকবছরে তামিলনাড়ুতে চিনি উৎপাদনে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রচুর পরিমানে আখ উৎপাদন,

উচ্চ পরিমানে শর্করার প্রাপ্তি, উচ্চমানের ফলন এবং দীর্ঘ শুষ্কতার পর্ব বা শুষ্ককরন পর্বের জন্য তামিলনাড়ু বর্তমানে চিনি উৎপাদনে প্রভূত উন্নতি করেছে। তামিলনাড়ু ভারত বর্ষে প্রতি হেক্টরে 9.53 টন চিনি প্রস্তুত করে যা এদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই সব সুবিধার জন্য বর্তমানে এই রাজ্য চিনি উৎপাদনে সমগ্র দেশে তৃতীয় এবং ভারতবর্ষের মোট চিনি উৎপাদনের 7 শতাংশ এই রাজ্যে উৎপাদিত হয়। রাজ্যের 32টি চিনি মিলের বেশিরভাগই কোয়েম্বাটোর, উত্তর আরকোট আম্বেদকর, দক্ষিণ আরকোট, ভেলোর এবং তিরুচিরাপল্লীতে রয়েছে।

কর্নাটক

কর্নাটক অবস্থিত 30টি মিলের সাহায্যে 910 হাজার টন অর্থাৎ সমগ্র দেশের উৎপাদনের প্রায় 6 শতাংশ চিনি উৎপাদিত হয়। মূলতঃ বেলগায়াম এবং মাণ্ডায়া জেলাতে বেশিরভাগ মিলগুলি গড়ে উঠেছে। এছাড়া বিজাপুর, বেলারি, সিমোগা, এবং ছত্তিশগড়ে অন্যান্য চিনি মিলগুলি অবস্থিত।

অন্ধ্রপ্রদেশ

প্রতিবেশী কর্ণাটকের তুলনায় অন্ধ্রপ্রদেশে বেশি চিনি মিল থাকলেও এই রাজ্য থেকে ভারতবর্ষের মোট চিনি উৎপাদনের 4.6 শতাংশ মাত্র উৎপাদিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় মিলগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। বেশিরভাগ চিনি মিলগুলি কৃষ্ণা ও গোদাবরীর পূর্ব ও পশ্চিমে বিশাখাপত্তনম, নিজামাবাদ, মোদক এবং চিতোর জেলায় বর্তমান।

গুজরাট

গুজরাটের সুরাটে 16টি চিনি মিল রয়েছে। এই মিলগুলি মূলতঃ সুরাট, ভবনগর, আমরেলি, বনসকান্থা, জুনাগড়, রাজকোট এবং জামনগর জেলায় অবস্থিত এবং দেশের মোট উৎপাদিত চিনির 4.50 শতাংশ এই সব মিল থেকে প্রস্তুত হয়।

হরিয়ানা

হরিয়ানায় মাত্র 8 টি চিনি মিল থাকলেও এগুলি বেশ বড় আকারের এবং দেশের মোট চিনি উৎপাদনের 2.37 শতাংশ চিনি উৎপাদন করে। মূলতঃ রোহটাক, আম্বালা, পানিপথ, কারনাল, ফরিদাবাদ এবং হিসারে এই চিনি কলগুলি অবস্থিত।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবে 13টি চিনি মিল রয়েছে এবং সেগুলি অমৃতসর, জলন্ধর, গুরুদাসপুর, সাংগরপুর, পাতিয়ালা এবং রূপনগর জেলায় অবস্থিত।

বিহার

1960 সাল পর্যন্ত বিহার চিনি উৎপাদনে দ্বিতীয় বৃহত্তম ছিল এবং এর স্থান উত্তরপ্রদেশের পরেই। এরপর থেকে এই রাজ্যের চিনি উৎপাদনের হার মন্থর হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন উপদ্বীপীয় রাজ্য যেমন, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, এবং অন্ধ্রপ্রদেশে চিনি মিলগুলির তুলনায় বিহারে চিনি মিলগুলির চিনি উৎপাদনের পরিমান কমে যায়। বিহারের 28টি মিল তাৎপর্যহীন ভাবে চিনি উৎপাদন করে থাকে। মূলতঃ পূর্ব উত্তরপ্রদেশীয় বলয়ের বিস্তৃত অংশ হিসেবে দ্বারভাঙ্গা, সারন, চম্পারন, এবং মুজফফরপুরে চিনি উৎপাদন হয়ে থাকে।

অন্যান্য

অন্যান্য উৎপাদক রাজ্যগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশ (মোরিনা, গোয়ালিয়র এবং শিবপুরি জেলাতে আটটি

মিল), রাজস্থান (উদয়পুর, চিতোরগড়, গঙ্গানগর এবং বুন্ডি জেলা), কেরালা, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের নাম উল্লেখ যোগ্য।

○ উত্তরভারত এবং উপদ্বীপিয় ভারতের চিনি উৎপাদনের পার্থক্য ঃ

উত্তর ভারত এবং উপদ্বীপিয় ভারতে (Peninsular India) চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান। উপদ্বীপিয় ভারতে অপেক্ষাকৃত ভালো অর্থাৎ অনুকূল পরিবেশ থাকায় চিনি শিল্পগুলি উত্তর ভারত থেকে ক্রমশঃ দক্ষিণ ভারতে স্থান পরিবর্তন করেছে। এসব ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে আগে উত্তরভারতে দেশের 90 শতাংশ চিনি উৎপাদিত হত যা বর্তমানে 35–40 শতাংশ এ নেমে এসেছে। উত্তরভারতীয় এবং উপদ্বীপিয় ভারতের রাজ্যগুলির চিনি উৎপাদনে পার্থক্য সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল—

(1) উপদ্বীপিয় ভারতে ক্রান্তীয় জলবায়ু দেখা যায় যা প্রতি একর ক্ষেত্রফলে (area) উত্তর ভারতের তুলনায় বেশি চিনি উৎপাদনে সাহায্য করে।

(2) দক্ষিণভারতে আখের মধ্যে, ক্রান্তীয় জলবায়ুর জন্য, সুক্রোজের পরিমাণ বেশি থাকে।

(3) উত্তরভারতের তুলনায় দক্ষিণভারতে আখ শুষ্ককরন পর্ব (ঋতু) অত্যন্ত বেশি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উত্তর ভারতে আখ শুষ্ককরন পর্ব প্রায় চারমাস অর্থাৎ নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী, সেখানে দক্ষিণভারতে এর পরিমান প্রায় সাতমাস, অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে মে-জুন পর্যন্ত।

(4) সমবায় (Co-operative) চিনি মিল গুলি উত্তরভারতের তুলনায় দক্ষিণভারতে ভালো নিয়ন্ত্রিত (better managed)

(5) বেশিরভাগ দক্ষিণভারতীয় যন্ত্রপাতি সমূহ নতুন এবং আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে নির্মিত।

● চিনি শিল্পের সমস্যা ঃ

ভারতীয় চিনি শিল্পে অনেকগুলি জটিল সমস্যা রয়েছে যার প্রতি অবিলম্বে নজর দেওয়া উচিত এবং যুক্তি পূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করা প্রয়োজন। এরকমই কিছু জলন্ত সমস্যা নীচে ব্যাখ্যঅ করা হল।

(১) **আখের নিম্ন ফলন ঃ**

ভারতে বিশাল স্থান জুড়ে আখ উৎপাদিত হলেও বিশ্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আখ উৎপাদনকারী দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় ভারতবর্ষে হেক্টর প্রতি আখ উৎপাদন কম। উদাহরনস্বরূপ যেখানে জাভায় প্রতি হেক্টরে 90 টন আখ, হাওয়াই দ্বীপে হেক্টর প্রতি 121 টন আখ উৎপাদিত হয়, সেখানে ভারতে হেক্টর প্রতি 67 টন আখ উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ সার্বিকভাবে আখ উৎপাদন ভারতবর্ষে কম হয়। এই কারনে, এই সব সমস্যার সমাধানে উচ্চফলনশীল, দ্রুত চিনি উৎপাদনে সক্ষম, হিম বা ঠাণ্ডা মুক্ত (Most restraint) আখ চাষ করা হয় এবং আখ গাছকে রোগমুক্ত রাখার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয়।

(২) **স্বল্প শুষ্ককরণ পর্ব বা ঋতু (Season) ঃ**

চিনি উৎপাদন শুষ্ককরণ ঋতুর (Crushing season) উপর নির্ভরশীল, সাধারণতঃ মাত্র 4 থেকে 7 মাস পর্যন্ত এই পর্ব বা ঋতু বজায় থাকে। অন্য সময় মিলগুলি এবং এর কর্মীরা বেকার থাকেন। এই জন্য এই শিল্পে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সার্বিকভাবে সমস্যা দেখা যায়। একটি সম্ভাব্য সমাধান হল উপযুক্ত বিরতিতে বীজ বপন এবং ফসল অর্থাৎ আখ কাটা। এর ফলে চিনির মিলগুলিতে আরও বেশি দিন আখ সরবরাহ সম্ভবপর হবে।

(৩) **উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি (অস্থিতিশীলতা) ঃ**

আখকে অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং অর্থকারী বা নগদ শস্য (Cash Crop) যেমন তুলা, তৈলবীজ, চাল ইত্যাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। আখ চাষের জন্য বরাদ্দভূমি অন্যান্য শস্যের তুলনায় কম, এর ফলে আখের

উৎপাদন সার্বিকভাবে স্থিতিশীল নয়। এই কারনে মিলগুলিতে আখের সরবরাহ কমে যাওয়ায় প্রতি বছর চিনির উৎপাদনও একই থাকে না।

(৪) **উৎপাদনের উচ্চমূল্য ঃ**

আখের উচ্চমূল্য, অদক্ষ প্রযুক্তি, অমিত ব্যায়ী উৎপাদন এবং উচ্চশুল্কের (Heavy Excise) জন্য উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পায়। ভারতে চিনির উৎপাদন মূল্য গোটা পৃথিবীর উচ্চ উৎপাদন মূল্যের মধ্যে একটি। কৃষি ক্ষেত্রে আখের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এবং চিনি মিলে নতুন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য গভীর ভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন। এই শিল্পে উৎপাদিত অন্যান্য সামগ্রীর (by products) সঠিক ভাবে ব্যবহার এই শিল্পের উৎপাদন খরচ কমাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আখের ছোবড়া, কাগজের মণ্ড, প্লাস্টিক, কার্বন ইনসুলেটিং বোর্ড, কোলটেক্স ইত্যাদি তৈরী করাতে ব্যবহার করা যায়, ঝোলা গুড় উৎপাদন এই শিল্পের আরকটি সহ-উৎপাদিত দ্রব্য (by Product) যা D.D.T. প্রস্তুতে, পলিথিন, কৃত্রিম রবার, প্লাস্টিক, শৌচাগার সামগ্রী (toilet preparation) তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এটি থেকে পুনরায় ভোজ্য ঝোলা গুড় এবং গরুর খাদ্য পাওয়া যায়।

(৫) **পুরানো এবং অপ্রচলিত যন্ত্রপাতি ঃ**

ভারতের বেশির ভাগ চিনির মিলই ছোট আকারের এবং প্রতিদিন 1000 থেকে 1500 টন চিনি উৎপাদন করে। এর ফলে বেশিরভাগ উৎপাদনই বেহিসাবী (uneconomic) হয়। বেশিরভাগ মিলই অর্থনৈতিক ভাবে মজবুত নয় (not viable)।

(৬) **খান্দসারি এবং গুড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঃ**

চিনি উৎপাদন শিল্পের অনেক আগে থেকেই ভারতে গ্রামীন অঞ্চলে খান্দসারি এবং গুড় উৎপাদিত হত। যেহেতু খান্দসারি শিল্পে excise duty বাবদ ব্যয় করতে হয় না তাই এই শিল্প আখ চাষীদের বেশী দাম দিতে পারে। এছাড়া, আখ চাষীরা নিজেরাই গুড় তৈরী করে শ্রমমূল্য (labour cost) বাঁচায়। দেখা গেছে যে ভারতবর্ষে উৎপাদিত 60 শতাংশ আখ খান্দসারি এবং গুড় তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। ফলে চিনি শিল্প প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অর্থাৎ আখের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়।

(৭) **বন্টনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা ঃ**

ভারতের অর্ধেকের বেশি চিনি মিল উত্তরপ্রদেশে এবং মহারাষ্ট্র অবস্থিত এবং 60 শতাংশ চিনি উৎপাদন এই রাজ্য দুটি থেকেই হয়ে থাকে। অন্যদিকে উত্তর পূর্ব ভারতের অনেক রাজ্য, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উড়িষ্যাতে এই শিল্পের যথাযথ উন্নতি ঘটেনি এর ফলে শিল্পের বণ্টনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়।

(৮) **মাথা পিছু খরচের মান স্বল্প ঃ**

বার্ষিক মাথা পিছু চিনির খরচ ভারতে মাত্র 9.2 কেজি যেখানে জাপানে 15.5 কেজি, আমেরিকায় 48.8 কেজি, ইংল্যাণ্ডে 53.6 কেজি, অস্ট্রেলিয়াতে 57.1 কেজি, কিউবাতে 78.2 কেজি এবং পৃথিবীর গড় হল 21.1 কেজি। এর ফলে নিম্ন বাজারে (low market) চিনির বিক্রির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

❍ উদ্ভিজ তেল শিল্প ❍

ভারতে উদ্ভিজ তেল হল খাবার এর মধ্যে ফ্যাটের অন্যতম উৎস। ভারতের উদ্ভিজ তেল শিল্প কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(1) **ঘানি ঃ** গ্রামে তেল নিষ্কাশনে ঘানিই হল প্রধান প্রযুক্তি। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ ব্যবহার করা হয়। উদাহরনস্বরূপ গুজরাটে চীনেবাদাম (groundnut) কেরালাতে নারিকেল এবং উত্তর প্রদেশে সরিষা বীজ ব্যবহার করা হয়।

(2) আন্তঃ মধ্য স্তরের প্রযুক্তির ব্যবহার মূলতঃ শহরে করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বীজ ব্যবহৃত হয়।

(3) বড় বড় শহরে উন্নতমানের মিল রয়েছে এবং এগুলি মূলতঃ বড় বাজারের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন করে।

বনস্পতি একটি হাইড্রোজেনারেটেড তেল। প্রথম বনস্পতি তেল ফ্যাক্টরি 1930 সালে স্থাপিত হয় এবং 298 টন তেল এই ফ্যাক্টরি উৎপাদন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমদানির চাহিদা তৈরী হওয়ায় বনস্পতি শিল্পে প্রভূত উন্নতি হয়। 1951 সালে 48টি ফ্যাক্টরি ছিল যাদের ক্ষমতা ছিল 3.3 লক্ষ টন এবং মোট উৎপাদন ছিল 155 হাজার টন। এই উৎপাদনের ফলে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি দেখা যায় এবং 1998-99 সালে 1257,000 টন বনস্পতি উৎপাদন হয়।

সারণি

বনস্পতি উৎপাদন

বছর	1950–51	1960–61	1970–71	1980–81	1990–91	1991–92	1998–99
উৎপাদন	155	355	558	753	850	826	1257

উৎস ঃ 1996–97 Economic Survey

সারা ভারত জুড়েই উদ্ভিজ তেল প্রস্তুত হলেও মহারাষ্টর হল বৃহত্তম বনস্পতি উৎপাদনকারী ইউনিট। অন্যান্য প্রধান প্রধান বনস্পতি উৎপাদনকারী রাজ্য হল উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কর্নাটিক, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং মধ্যপ্রদেশ। প্রধান প্রধান উদ্ভিজ তেল উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হল- চেন্নাই, আকোলা, মোদিনগর, কানপুর, গাজিয়াবাদ, ইন্দোর এবং ভাদোদরা।

উদ্ভিজ তেল উৎপাদন দেশজ চাহিদার তুলনায় কম এবং দেশকে বিভিন্ন তৈল বীজ ছাড়াও উদ্ভিজ তেল অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। 1995–96 সালে ভারত 920 কোটি টাকার ভোজ্য তেল আমদানী করে।

■ **শিল্পাঞ্চল ঃ**

ভারতবর্ষে উদ্ভিজ তেল শিল্প অসমভাবে বণ্টিত হয়েছে কারণ শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ (Factor) সমূহ সব স্থানে সমান নয়। কিছু অনুকূল অবস্থার জন্য এই শিল্প নির্দিষ্ট কতগুলি স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বেশি শিল্প প্রবনতা যুক্ত অঞ্চল (Pocket) গুলিকে শিল্পাঞ্চল বলা হয়।

ভৌগোলিক এবং বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন বিষয় বিচার করে ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। প্রথম এই বিষয়ে আলোচনা করেন 1944 সালে ত্রিওয়ার্থা এবং বার্নেট। জেনকিনস গবেষনার ভিত্তিতে ভারতের শিল্পাঞ্চলকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সব ব্যাখ্যা এবং প্রচেষ্টা বর্তমানে অকেজো। কারন ভারতের শিল্পগত মানচিত্রে এক বিশাল পরিবর্তন এসেছে এবং এই পরিবর্তনের কারণ হল পরিকল্পনা পর্ব। 'Asia' বই-এ J.E. Spenser এবং W.L. Thomas এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। R.L. Singh গবেষণার ভিত্তিতে দশটি অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি— (i) হুগলী (ii) মুম্বাই (iii) আহমেদাবাদ (iv) উত্তর পূর্বের, প্রসারিত অঞ্চল গাজিয়াবাদ থেকে অমৃতসর (v) লখনৌ-কানপুর (vi) ব্যাঙ্গালোর-মাদ্রাজ (vii) কুইলন-কোয়েম্বাটোর (viii) মাদুরাই (ix) ডালমিয়াপুরম (x) ডিগবয়-ডিব্রুগড়।

শিল্পগত জীবিকা/চাকুরীর ভিত্তিতে দ্য সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (CMIE) ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করেছে। 1970 লালে শিল্পগত চাকরীর পরিমান 10,000 অতিক্রম করেছিল। Dr. B.N. Sinha, 1972 সালে শিল্পাঞ্চলগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ—

(১) **মুখ্য শিল্পাঞ্চল ঃ** কারখানার প্রাত্যহিক ন্যূনতম 1.5 লক্ষ কর্মচারীর ভিত্তিতে এই শিল্পাঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায়।

(২) **গৌন শিল্পাঞ্চল ঃ** ন্যুনতক পচিশ হাজার কর্মী অবশ্যই থাকলে সেই শিল্পাঞ্চলকে গৌন শিল্পাঞ্চল বলে।

(৩) **উৎপাদনকারী জেলা ঃ** এর কর্মী সংখ্যা 25,000 এর কম। এছাড়া উৎপাদনকারী ইউনিটের সাহায্যেও শিল্পাঞ্চল চিহ্নিত করা যায়। ভারতের মুখ্য শিল্পাঞ্চলগুলি কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই এর বন্দরগুলির নিকটে অবস্থিত। ইংরেজদের এই শিল্পাঞ্চলগুলি এভাবে স্থাপন করার অন্যতম কারণ হল এই সব বন্দরের মাধ্যমে কাঁচামাল পরিবহন, বাজারের উপস্থিতি এবং বিদ্যুৎ প্রাপ্যতা। পরিবহন ব্যবহার উন্নতির সাথে সাথে কিছু শক্তি উৎপাদক অঞ্চল থেকে সহজে আনা যায়।

নিম্নে ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

- **মুখ্য শিল্পাঞ্চল**

(a) হুগলী শিল্পাঞ্চল।

(b) মুম্বাই-পুনে শিল্পাঞ্চল।

(c) আমেদাবাদ-ভাদোদরা শিল্পাঞ্চল।

(d) মাদুরাই-কোয়েম্বাটোর-ব্যাঙ্গালোর শিল্পাঞ্চল।

(e) ছোটনাগপুর মালভূমির শিল্পাঞ্চল।

(f) দিল্লী এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল।

(a) **হুগলী শিল্পাঞ্চল ঃ** এটি ভারতের অন্যতম শিল্পাঞ্চল। হুগলী নদীর বাম তীরে নৈহাটি থেকে বজবজ এবং হুগলীর ডান তীরে ত্রিবেনী থেকে নালপুর-এ এই শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। এই শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার শিল্প দেখা যায়, যেমন-পাট, কার্পাস বয়ন, রেশম তন্তু, ইনজিনিয়ারিং, রাসায়নিক, ঔষধ, চামড়া, জুতো, কাগজ এবং দেশলাই ইত্যাদি। অন্তর্দেশীয় বন্দর (Inland Port) গড়ে তুলতে যেমন হুগলী নদীর ভূমিকা রয়েছে তেমনি হুগলী শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতেও এই নদী সাহায্য করেছে। বর্তমান কলকাতার প্রানকেন্দ্রে 17 শতাব্দীতে হুগলী শিল্পাঞ্চল প্রথম গড়ে ওঠে এবং তখন এই স্থান গঙ্গার সঙ্গে খুব সুন্দর ভাবে যুক্ত ছিল। নৌবহনক্ষম নদী, রাস্তা, রেলপথও এই কলকাতা বন্দরের উন্নতিতে সাহায্য করে ছিল।

3.2.6 ভারতের জনসংখ্যা ঃ গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

❑ ভূমিকা (Introduction)

পৃথিবীর 3 শতাংশের কম স্থান জুড়ে থাকা ভারতবর্ষে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার 16 শতাংশ লোক বাস করেন। বিশ্বে জনসংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় এই দেশ আগামী দিনে প্রথম স্থানাধিকারী হবে।

❑ ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি (Growth of India's Population)

বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে। চলতি শতাব্দীর ভারতের জনমিতি-ইতিহাসকে তিনটি সুনির্দিষ্ট সময়ে ভাগ করা যায়— (1) নিশ্চল (stagnant), (2) ধীর বৃদ্ধি ও (3) দ্রুত বৃদ্ধির যুগ। 1901 থেকে 1921 সাল পর্যন্ত সময়কে নিশ্চল যুগ বলা চলে। এই সময় জনসংখ্যা মাত্র 12 মিলিয়ন বেড়েছে (236 থেকে 248 মিলিয়ন)। এই সময় মৃত্যুহার জন্মহারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যসংকট বেশি মৃত্যুহারের জন্য দায়ী ছিল। এই সময় জন্ম ও মৃত্যু উভয় হারই ছিল প্রতি হাজারে 40-র বেশি। এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ ছিল কম।

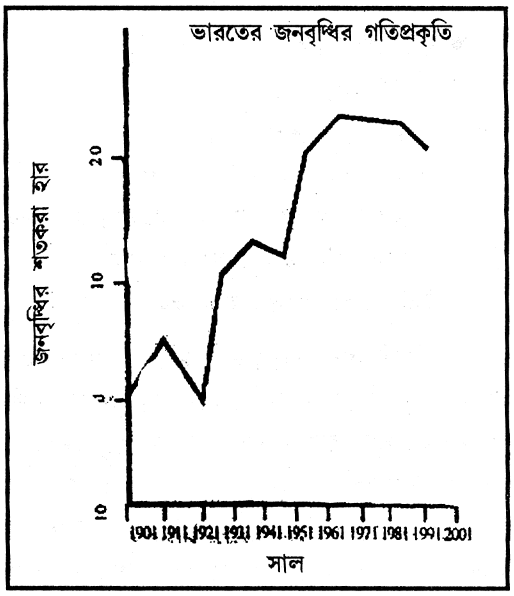

চিত্র 3.77 ঃ ভারতের জনবৃদ্ধি

1921-র জনগণনাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সূচনা বলা যেতে পারে। কারণ এর পর থেকে জনসংখ্যা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 1921 থেকে 1951 সালের মধ্যে জনসংখ্যা 112 মিলিয়ন বেড়েছিল (248 থেকে 360 মিলিয়ন, সারণি)। ভারতের জনমিতি চিত্রে এই সময় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল, কারণ এই সময় মহামারী, দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর ওপর সরকারের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা গিয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে বন্টন ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতিকে খাদ্য উৎপাদনের উন্নতির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুহার কমিয়ে আনার জন্য পয়ঃপ্রণালী ও চিকিৎসা পরিষেবার প্রচুর উনতি ঘটানো হয়েছিল। সারণি থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে 1921 সালে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ছিল 47 আর 1951 সালে তা কমে হল 271 দ্রুত মৃত্যুহার কমার দরুন 1921 থেকে 1951 সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার ধীর বৃদ্ধি ঘটেছিল, কিন্তু জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে (1951) 40 জন।

সারণি ঃ ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি (1901-2001)

বছর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	পূর্ববর্তী দশকে % বৃদ্ধি	বছর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	পূর্ববর্তী দশকে % বৃদ্ধি
1901	236	—	1951	360	+13.3
1911	249	+5.7	1961	439	+21.5
1921	248	–0.3	1971	548	+24.8
1931	276	+11.0	1981	685	+24.7
1941	315	+14.2	1991	844	+23.5
			2001	1,027	+21.3

সারণি ঃ ভারতের স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (1901-2001)

বছর	প্রতিহাজারে জন্মহার	প্রতিহাজারে মৃত্যুহার	স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার	বছর	প্রতিহাজারে জন্মহার	প্রতিহাজারে মৃত্যুহার	স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার
1911	49	43	6	1961	42	23	19
1921	48	47	1	1971	37	15	22
1931	46	36	10	1981	34	12	22
1941	45	31	14	1991	31	11	20

1951 সালকে ভারতের জনমিতি ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যেতে পারে। কারণ 1951-র পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা অভাবিত হারে বেড়েছে। 1951 থেকে 2001 সালের মধ্যে জনসংখ্যা তিন গুণের বেশি বেড়েছে (360 থেকে 1027 মিলিয়ন)। গড়ে প্রতি বছর বৃদ্ধির হার হল শতকরা দু'ভাগ। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু উন্নয়নমূলক কার্যসূচি, পর্যাপ্ত খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার দরুণ মৃত্যুহার কমে গিয়ে জনসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় মৃত্যুহার প্রতি হাজারে 27 থেকে কমে 11 হল। এই সময়কার জনমিতি ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হল জন্মহার ধীরে ধীরে কমে ছিল, কিন্তু মৃত্যুহার দ্রুততালে কমে গিয়েছিল, ফলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারও বেশি ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার কমে যাওয়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধির কিছু ফল লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার কমে যাওয়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধির কিছু ফল লক্ষ্য করা যায়। ভারতের জনসংখ্যায় তরুণ জনতার হার বাড়ছে। এ দেশের শতকরা 36.5 ভাগ জনসংখ্যার বয়স 15 বছরের কম। জন্মহার বেশি ও আয়ুষ্কাল বাড়ায় পুনরুৎপাদন বয়সপুঞ্জে জনসংখ্যার শতকরা হার বাড়ছে, যার পরোক্ষ ফল হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সর্বোপরি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

এ দেশের গ্রাম ও শহর এলাকায় জনবৃদ্ধি হারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যদিও সাধারণভাবে এ দেশে জনবৃদ্ধির হার বেশি, তবুও শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধির হার কম। 1971-81 র দশকে গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে 19 ও 46 শতাংশ। যেহেতু ভারতের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হলেন গ্রামবাসী, তাই জনসংখ্যার নিরিখে দেশের দুই-তৃতীয়াংশের বৃদ্ধি গ্রামাঞ্চলেই ঘটেছে। গ্রাম্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের ভূমি সম্পদের ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। গ্রামে বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। যদি গ্রামে শিল্পায়নের দ্বারা অর্থনীতির উন্নতি ঘটানো না যায়, তবে সেখানকার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

পক্ষান্তরে, শহর এলাকা, বিশেষ করে বড় শিল্পকেন্দ্র ও জেলা-সদর শহরে, বাইরে থেকে প্রচুর লোকজন এসে বসবাস করছেন। ফলে ঐ সব স্থানের জনবৃদ্ধি দ্রুততালে ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে দেশের উর্বর কৃষিজমির ওপর লাগাম-ছাড়া নগরায়ণ ঘটে চলেছে। শহরে বস্তির সৃষ্টি হচ্ছে, সামাজিক সুযোগ-সুবিধের ঘাটতি ঘটছে, দূষণের জন্য পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

সারণি

একনজরে ভারতের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

(India's Population, Health and Education at a glance)

2025 সালের সম্ভাব্য জনসংখ্যা	:	133.02 কোটি
জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার তারিখ	:	2031 সাল
জনসংখ্যা (2001)	:	102.70 কোটি
পুরুষ	:	53.13 কোটি
মহিলা	:	49.57 কোটি
এক দশকে বৃদ্ধি (91.01)	:	21.34%
মোট বৃদ্ধি (1991-01)	:	183 কোটি
শহুরে জনসংখ্যা (2001)	:	27.78%
গ্রামীণ জনসংখ্যা (..)	:	72.22%
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে)	:	324 জন
সাক্ষরতা (2001)	:	65.38%
পুরুষ	:	75.85%
মহিলা	:	54.16%
গড় আয়ু (1997)	:	62.6 বছর
হাজার পুরুষে মহিলার সংখ্যা (2001)	:	933 জন
প্রজনন হার (1997)	:	3.3%
জন্মহার (প্রতি হাজারে)	:	9.0(1998)
মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	:	70(1999)
শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে	:	70(1999)
পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	:	98(1999)
মাতৃত্বকালীন মৃত্যু (একলক্ষ শিশুপিছু)	:	410(1980-99)
চিকিৎসাগত কারণে ভ্রূণ হত্যা	:	6.14 লক্ষ (1999)
60 বছরের বেশি বয়সী (জনসংখ্যার অংশ)	:	6.1%
60 বছর বয়সের আগেই মৃত্যু (জনসংখ্যার অংশ)	:	30%
প্রতিবন্ধী (জনসংখ্যার অংশ)	:	0.2 (1995-96)
এইডস্ রোগী (2000)	:	37 লক্ষ
শ্রমিক বিভাগ		
কৃষি	:	64
শিল্প	:	16

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঃ প্রাথমিক স্কুল 46 :1
মধ্যস্তরের স্কুল 38:1। মাধ্যমিক স্কুল 32:1। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল 35:1।
কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় 21:1।
টেলিফোন—27 (প্রতি হাজারে), ফ্যাক্স—0.1 (প্রতি হাজারে)। রেডিও—80 (প্রতি হাজারে)।
প্রকাশিত বই—1 (প্রতি লক্ষে)।
ডাক্তারপিছু মানুষ— 2,437। নার্স পিছু মানুষ—3,333। গবেষক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ—0.3 (প্রতি হাজারে)

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তারতম্য রয়েছে। যদিও সাধারণভাবে ভারতবর্ষ জনমিতি পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে, তবুও দেশের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অংশ দ্বিতীয় পর্যায়ের একই ধাপে নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে কেরালার মৃত্যুহার হল প্রতি হাজারে 5.9 কিন্তু জন্মহার 19.8। এই রাজ্যটি জনমিতি পরিবৃত্তকালের তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে, কিন্তু বিহার, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশ (পূর্ব) দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথমদিকে রয়েছে।

সারণি আমরা গত দু'দশকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি চিত্র পাচ্ছি : (i) স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার (1981-91) জনবৃদ্ধির হার কম ঘটল। 1971-81-র দশকে দেশের জনবৃদ্ধি ছিল 24.66 শতাংশ, 1981-91 -র দশকে তা গিয়ে দাঁড়াল 23.5; (ii) দেশের বিভিন্ন অংশে জনবৃদ্ধির হার সমান নয়। নাগাল্যান্ডে গত দু'দশকে যেখানে জনবৃদ্ধি ঘটেছে +6.0 শতাংশ, সেখানে সিকিমে –22.3 শতাংশ, আর কেন্দ্রশাসিত চন্ডীগড়ে বৃদ্ধির হার হল –33.4 শতাংশ, (iii) ভারতবর্ষের 28-টি রাজ্যের মধ্যে 16-টি রাজ্যের বৃদ্ধির হার নেতিবাচক (negative)। অন্যান্য রাজ্যে বৃদ্ধির হার খুব একটা বেশি নয়। চারটি রাজ্যের (বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ) জনবৃদ্ধির হার সমান নয়। রাজস্থানের বৃদ্ধির হার (–4.9%) বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের চেয়ে কিছু কম, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বৃদ্ধির হার +1.5।

সাধারণ কেন্দ্রশাসিত এলাকাসমূহ হল শহরাঞ্চল। স্বভাবতই গ্রাম থেকে লোকজন এখানে এসে বসবাস করেন। ফলে এখানে জনবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু 1981-91-র দশকে সাতটির মধ্যে চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (শহর) মধ্যে চন্ডীগড় সব থেকে শিক্ষিত শহর। চন্ডীগড়ের জনসাধারণ ক্ষমতা তার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। এর পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে পাঁচকুলা ও মেহেলী নামে উপনগরী সৃষ্টি হয়েছে। এইসব কারণের জন্য চন্ডীগড়ের জনবৃদ্ধি কমেছে।

জেলাস্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেশের মোট জেলার 10 শতাংশের (45-টি জেলা) বৃদ্ধির হার (1981-91) 15 শতাংশের কম। এক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর 14-টি জেলা দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এগিয়ে আছে। এর পরের স্থান হল কেরালা (7), কর্ণাটক (6), মহারাষ্ট্র (4), গুজরাট (4), উত্তরপ্রদেশ (3), পাঞ্জাব (2), হিমাচলপ্রদেশ (2), বিহার, গোয়া ও পশ্চিমবঙ্গের (প্রতিটির 1-টি করে জেলা)।

1991-2001 সাল পর্যন্ত জনবৃদ্ধি (Growth of Population from 1991 to 2001)

এই দশকে জনবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। এই দশকে জনবৃদ্ধি ছিল 21.34 শতাংশ যা পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় 2.52 শতাংশ (23.86-21.34) কম। 1981-91 দশক থেকে যে জনবৃদ্ধি হার কমেছিল, তা বর্তমান দশকে আরও কমে গেল।

রাজ্যগুলোর মধ্যে পূর্বের ন্যায় এবারও কেরলে সবচেয়ে কম জনবৃদ্ধি ঘটেছে, মাত্র 9.42 শতাংশ, যা পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় 4.88 শতাংশ কম। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে এই দশকে 15 শতাংশের কম বৃদ্ধি ঘটেছে তারা হল তামিলনাড়ু (11.19%), অন্ধ্রপ্রদেশ (13.86%) ও গোয়া (14.89%)। গোটা দেশের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশই সবচেয়ে কম জনবৃদ্ধি ঘটেছে, তা হল পূর্ববর্তী দশকের (24.20%) তুলনায় 10.84 শতাংশ কম (বর্তমান দশকে 13.86 শতাংশ)।

জাতীয় গড়ের (21.34 শতাংশ) তুলনায় কম ও জনবৃদ্ধির রাজ্যগুলো হল ত্রিপুরা (15.74 শতাংশ), ওড়িশা (15.94), কর্ণাটক (17.25), হিমাচলপ্রদেশ (17.53), পশ্চিমবঙ্গ (17.84), ছত্তিশগড় (18.06), অসম (18.85), উত্তরাঞ্চল (19.2) এবং পাঞ্জাব (19.76)। এভাবে দেখতে গেলে দেখা যায় যে ভারতের 28-টি রাজ্যের মধ্যে 13-টির জনবৃদ্ধি হার 20 শতাংশের কম। এইসব রাজ্যগুলোর মধ্যে আছে সমস্ত দক্ষিণের রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরার মধ্যে পূর্বের রাজ্যগুলো, উত্তরাঞ্চল, নতুন সৃষ্ট উপজাতি রাজ্য ছত্তিশগড় এবং কৃষিসমৃদ্ধ পাঞ্জাব।

এর বিপরীতে রয়েছে নাগাল্যান্ড যেখানে জনবৃদ্ধির হার ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, 64.6 শতাংশ (1991-2001)। পূর্বের দশকের (56.08 শতাংশ) তুলনায় এই বৃদ্ধির হার 8.33 শতাংশের বেশি। এই ধরনের বৃদ্ধির পেছনে কারণ হল এখানে সবসময় দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে এবং দেশের বাইরে থেকে অভিবাসন (immigration) ঘটে চলেছে। অন্যান্য যে সব রাজ্যে যেখানে জনবৃদ্ধির হার বেশি, সেগুলো হল সিকিম (32.98 শতাংশ), মণিপুর (30.08), মেঘালয় (29.94), মিজোরাম (29.18), জম্মু ও কাশ্মীর (29.04), বিহার (28.43), রাজস্থান (28.33), হরিয়ানা (28.06), অরুণাচলপ্রদেশ (26.15), উত্তরপ্রদেশ (25.8), মধ্যপ্রদেশ (24.34), ঝাড়খণ্ড (23.18), মহারাষ্ট্র (22.57) ও গুজরাত (22.48)। উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকাংশ ছোট রাজ্যেই জনবৃদ্ধি বেশি। এ থেকে বোঝা যায় যে এই অঞ্চলে সীমান্তের ওপার থেকে ওই সব রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। এটি খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার এবং এটি শাসকদলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার।

কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র পন্ডিচেরী (20.56) ও লাক্ষাদ্বীপে (17.19) ঐ জাতীয় গড়ের (21.34) চেয়ে কম জনবৃদ্ধি ঘটেছে। দাদরা ও নগর হাভেলী-তে জনবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি ঘটেছে (59.2)। এর পরের স্থান হল (55.59), দিল্লী (46.31), চণ্ডীগড় (40.33), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (26.94)। যেহেতু অধিকাংশ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো হল শহরাঞ্চল, তাই সেখানে কাজের সন্ধানে গ্রামীণ জনতার অভিবাসন ঘটেছে।

সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাতটির মধ্যে পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জনবৃদ্ধির হার কমেছে। কেবলমাত্র দাদরা ও নগর হাভেলী এবং দমন ও দিউ-তে জনসংখ্যা বেড়েছে।

দেশের পক্ষে এটাই বড় সন্তোষের কথা যে 28-টির মধ্যে 21 টিতে জনবৃদ্ধির হার কমেছে (সারণি)। এ থেকে মনে হয় যে জনসংখ্যা হ্রাস একটি বড় অঞ্চল জুড়েই ঘটেছে। যে সমস্ত রাজ্যে খুব বেশি জনহ্রাস ঘটেছে, সেগুলো হল উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা (–18.56 শতাংশ), অরুণাচলপ্রদেশ (–10.68), মিজোরাম (–10.52) এবং দক্ষিণের অন্ধ্রপ্রদেশ। সে তুলনায় যেসব রাজ্যে বর্তমান দশকে জনবৃদ্ধি বেশি ঘটেছে সেগুলো হলো উত্তরপ্রদেশে (0.25 শতাংশ), হরিয়ানা (0.65), মেঘালয় (0.7), গুজরাত (1.29), সিকিম (4.5), বিহার (5.0) এবং নাগাল্যান্ড (8.3)। উপরের তথ্য থেকে বলা যায় যে, নাগাল্যান্ড ও বিহার ছাড়া প্রায় সর্বত্র-ই জনবৃদ্ধির হার খুব সামান্য এবং মনে হয় যে আগামী দিনেও ভারতে জনবৃদ্ধির হার কম ঘটবে। আরও বলা যেতে পারে ভারত জনমিতি বিবর্তনের এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক, এই দশকের (1991-2001) একটি দুশ্চিন্তার কারণ হল গর্ভপাত, বিশেষ করে অবাঞ্ছিত কন্যা-শিশু হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত সবার মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এতে করে হয়তো পরিবারের আয়তন সীমিত রাখা যাচ্ছে। কিন্তু 0-6 বয়ঃপুঞ্জের কন্যা-শিশুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে। কন্যা-ভ্রূণহত্যা আগামী দিনে আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ অনুপাতের ভারসাম্য নষ্ট করবে এবং সমাজে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার আইন করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় বন্ধ করে দিয়েছেন, তবুও এই ঘটনা আজও ঘটেই চলেছে।

■ ভারতের জনসংখ্যা বণ্টন ও জনঘনত্ব (Distribution and Density of Population in India)

স্বাধীনতার আগে ভারতের জনসংখ্যা নিয়ে খুব একটা গবেষণা হয়নি। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধে Ahmed (1941) ও Goddess (1942)-এর বিশ্লেষণ উল্লেখের দাবি রাখে। স্বাধীনতার পর 1951 সালের লোকগণনাকে ভিত্তি করে অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জী (1962), জাতীয় স্তরে ভারতের জনসংখ্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা

করেছিলেন। আঞ্চলিক স্তরে কুরিয়ান (1938), ভার্মা (1956), সিনহা (1958), চ্যাটার্জী (1961), কৃষাণ (1968), ঘোষ (1970), প্রকাশ (1970) ও মেহেতোর (1970) বিশ্লেষণ ছিল যথাক্রমে কেরালা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান ভিত্তিক। 1969 থেকে 1972 সাল পর্যন্ত গবেষণামূলক তথ্যাদির ভিত্তিতে দেশের জনসংখ্যা বণ্টন ও ঘনত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গোসাল ও চাঁদনা (Gosal & Chandna) জনগণনা প্রতিবেদনের (Census Report) ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

■ জনসংখ্যার বণ্টন (Distribution of Population)

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভারতের জনসংখ্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ঃ

1. বিপুল জনসংখ্যা (2001 সালে 1,033 মিলিয়ন),
2. বহুসংখ্যক প্রজাতি (Ethnic Multiplicity),
3. প্রধানত গ্রামীণ জনসংখ্যা ও তার অসম বণ্টন।

কিংসলে ডেভিস (Kingslay Davis, 1951) তাঁর এক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে দারিদ্র্য ও প্রজাতির বৈচিত্র্যের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র আয়তনের কথা বিবেচনা করলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এই দেশের উন্নতির সম্ভাবনা আছে। বহুবিধ জাতি এদেশের একটি সমস্যা। সাম্প্রতিক কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক সংকীর্ণতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তার ফলে দেশের ঐক্য যেমন একদিকে বিপন্ন হতে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুস্থিরতা নষ্ট হতে চলেছে। ভারতের তিন-চতুর্থাংশের বেশি লোকসংখ্যা (76.6 শতাংশ) গ্রামে বাস করেন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বহুসংখ্যক গ্রামে (5 লাখের বেশি) এই জনতার বসবাস। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এটি একটি বিরাট বাধা, কারণ প্রতিটি বসতিতে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক উন্নয়ন, সুষম বণ্টনব্যবস্থা, স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিকাঠামো তৈরি করতে প্রচুর ব্যয় হবে।

জনবণ্টনের অসমতা ভারতের জনসংখ্যার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে বলা হয়—"The Population map of India follows the rainfall map." দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামে বাস করেন, বাকি অর্ধেক সংঘবদ্ধ গ্রামে। বিক্ষিপ্ত জনবসতি দেশের মধ্যভাগ ও হিমালয় অঞ্চলে দেখা যায়, আর ঘন জনবসতি পলিময় সমভূমি অঞ্চলে। জনসংখ্যার এই অসম বণ্টন আবার ঘন জনবসতি ও বিরল জনবসতি অঞ্চলের মধ্যবর্তী সীমানায় আরও বেড়েছে।

■ জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population)

প্রতি বর্গকিমিতে 324 (জন) জনঘনত্ব (2001 জনগণনা) হিসেবে ভারত পৃথিবীর ঘনবসতিযুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ (প্রতি বর্গকিমিতে 904 জন) সবচেয়ে ঘনবসতিযুক্ত রাজ্য আর জাতীয় রাজধানী (National Capital) দিল্লী (9,294) সবচেয়ে ঘন বসতিযুক্ত অঞ্চল (Territory)। পশ্চিমবঙ্গের পরের স্থান হল বিহার (880), কেরালা (819), উত্তরপ্রদেশ (689), পাঞ্জাব (482), তামিলনাড়ু (478), হরিয়ানা (477), গোয়া (363), অসম (340), ও ঝাড়খণ্ড (338)-এর। গড় ঘনত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতকে তিনভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র 3.79)।

A. বেশি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল : 350 জনের বেশি লোক।

B. মাঝারি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল : 150-350 জন লোক।

C. কম ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল : 150-এর কম লোক।

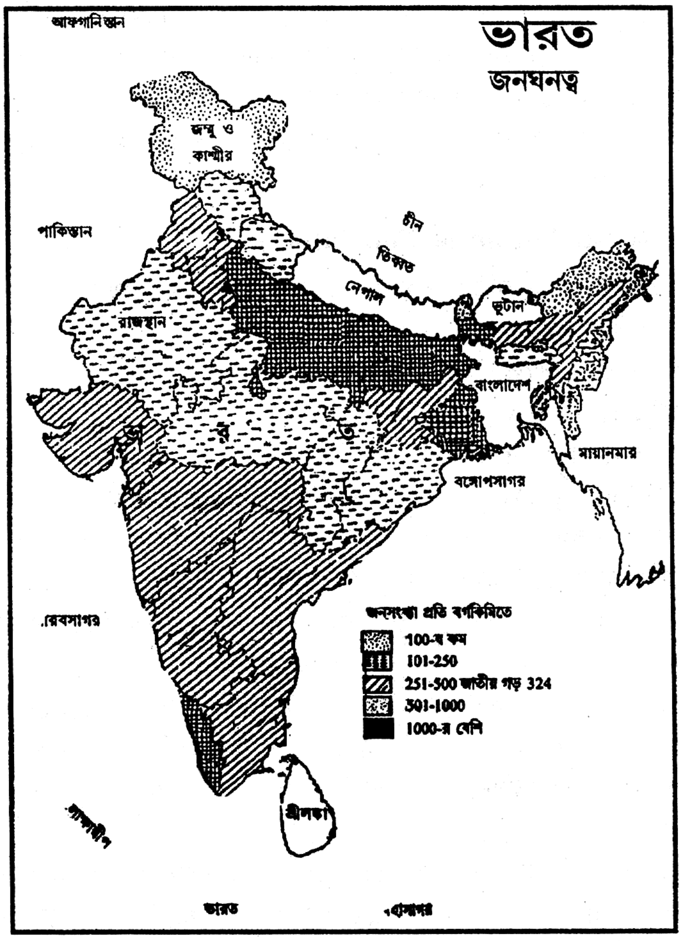

চিত্র 3.78 ঃ ভারতের রাজ্যভিত্তিক জনঘনত্ব (2001) ঃ প্রতি বর্গকিমিতে

সারণি ঃ ভারত ঃ জনঘনত্ব 1991 ও 2001 (প্রতি বর্গকিমি)

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	2001	1991
ভারত	324	267
পশ্চিমবঙ্গ	904	767
বিহার	880	685
কেরালা	819	749
উত্তরপ্রদেশ	689	548
পাঞ্জাব	482	403
তামিলনাড়ু	478	429
হরিয়ানা	477	372
গোয়া	363	316

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	2001	1991
অসম	340	286
ঝাড়খন্ড	338	374
মহারাষ্ট্র	314	257
ত্রিপুরা	304	263
অন্ধ্রপ্রদেশ	275	242
কর্ণাটক	275	235
গুজরাত	258	211
ওড়িশা	236	203
মধ্যপ্রদেশ	196	158
রাজস্থান	165	129
উত্তরাঞ্চল	159	133
ছত্তিশগড়	154	130
নাগাল্যান্ড	120	73
হিমাচল প্রদেশ	109	93
মণিপুর	107	82
মেঘালয়	103	79
জম্মু ও কাশ্মীর	99	77
সিকিম	76	57
মিজোরাম	42	33
অরুণাচল প্রদেশ	13	10
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল		
দিল্লী	9294	6252
চন্ডীগড়	7903	5632
পন্ডিচেরী	2029	1683
লাক্ষাদ্বীপ	1894	1616
দমন ও দিউ	1411	907
দাদরা ও নগর হাভেলী	499	282
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	43	34

A. বেশি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ (High Density Regions)

1981 সালে জনগণনানুযায়ী ভারতের 20% -এর বেশি জেলায় প্রতি বর্গকিমিতে 350 জনেরও বেশি লোক বাস করতেন। হিন্দীভাষী অঞ্চলে— বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ, বিহার রাজ্য, পশ্চিমে হরিয়ানা রাজ্য এবং পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গে— জনঘনত্ব বেশি। মোটামুটিভাবে এই বলয়টিতে গড়ে প্রতি বর্গকিমিতে 500 লোক বাস করেন, যদিও এই বলয়ের কোথাও কোথাও এর থেকে বেশি লোক বাস করেন। এই জনবসতি মূলত গ্রামীণ পরিবেশে গড়ে উঠেছে, যদিও পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত শিল্প বিকাশের ফলে ব্যাপক জনসমাবেশ হয়েছে।

জনবসতির দীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায় যে উর্বর পলিমাটিতে গড়া উঠা কৃষিকাজই এখানকার অর্থনীতির মূল উৎস। এই বলয়ের অধিকাংশ অঞ্চলেই কৃষিকাজ আবার সেকেলে ধরনের। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এখানে ভালো

চাষবাসের সুযোগ (সমতল জমি, পলিমাটি, সেচের জন্য জল) থাকলেও এখানকার কৃষিব্যবস্থা সেকেলে ধরনের। অনুন্নত জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা এই বলয়ের চাষবাস-এ পিছিয়ে থাকার একটা বড় কারণ। সস্তায় প্রচুর শ্রমিক (লোকসংখ্যা বেশি বলে) ও কম পরিমাণ জমি উন্নতমানের চাষবাস চালু করার পথে আর এক বাধা। এর স্বাভাবিক ফল হল— (i) এখানকার বিরাট এলাকা জুড়ে গ্রাম্য জনতার ভীড়। (ii) বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বদিক থেকে ভূমিহীন চাষীদের স্বদেশত্যাগ। এদের গন্তব্যস্থল হল চাষবাসে উন্নত পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও অসম রাজ্য। কিন্তু বহিঃপ্রবণতা সত্ত্বেও এখান ঘনত্ব খুব বেশি। যাহোক, বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে (ইক্ষুশিল্প) ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকায় (পাটশিল্প) গ্রামীণ শিল্পায়ন জনসংখ্যার গ্রহণ ক্ষমতা বাড়িয়েছে। ভারতের এই দুই প্রান্তে অন্যান্য অংশের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ বেশি।

জনঘনত্বের দিক দিয়ে এর পরের স্থান হল মালাবার উপকূল ও তামিলনাড়ু উচ্চভূমি। এই অঞ্চলের মধ্যে মালাবার এলাকা ও পৌর জেলা চেন্নাইয়ের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তামিলনাড়ুর উচ্চভূমিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে প্রায় 350 জন। মালাবার উপকূল অঞ্চলে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 1,000 জন বা তারও বেশি। নিবিড় কৃষিভিত্তিক ধানচাষ এখানকার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। দেশের মধ্যেকার জেলাগুলোতে বাগিচা চাষ (চা, রবার, কফি) এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্প এখানে জনঘনত্ব বেশ বাড়িয়েছে। চাষবাসে উন্নতি ও বেশ কয়েকটি শহরে কুটিরশিল্পের বিকাশ কাবেরী বদ্বীপ ও তার লাগোয়া উত্তর-পূর্ব তামিলনাড়ুর উচ্চভূমিতে বেশি জনঘনত্বের কারণ। যদিও কিছু লোক এখান থেকে বাইরে চলে গেছেন, তবুও ভারতের এ অংশে অধিক নগরায়ন জনঘনত্বের বাড়িয়ে তুলেছে। এখানকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল কেন্দ্র হল চেন্নাই। বাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটোর, মাদুরাই, টুটিকোরিন ও চেন্নাই এই অঞ্চলের পুরনো শহর।

এসব প্রধান ঘনবসতি অঞ্চলগুলো ছাড়া চাষবাসে উন্নত মহানদী বদ্বীপ, গোদাবরী বদ্বীপ, বারী (Bari) এবং বিতস্তা দোয়াব ও অত্যাধুনিক বৃহত্তর মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গালোর, আমেদাবাদ, খেদা (Kheda), ইন্দোর, দিল্লী ও চন্ডীগড়ে ঘন জনবসতি লক্ষ্যণীয়। অ-কৃষি পেশা নির্ভর লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জেও জনবসতি বেশ ঘন।

B. মাঝারি ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ (Medium Density Regions)

1981 সালে লোকগণনাতে ভারতের 130-টি জেলায় মাঝারি ধরনের জনবসতি লক্ষ্য করা যায়। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে সবচেয়ে কম জনবসতি ছিল (প্রতি বর্গকিমিতে 151 জন)। যা হোক, দক্ষিণ ভারতে মাঝারি ধরনের জনবসতি বেশ লক্ষ্যণীয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গোটা মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় এলাকার একটা বড় অংশে মাঝারি ধরনের জনবসতি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণে তামিলনাড়ুর কিছু অংশ, কর্ণাটকের দক্ষিণভাগ, অন্ধ্রপ্রদেশের রায়লসীমার কিছু অংশে মাঝারি জনবসতি দেখা যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সেখানকার ভাসমান ভূপ্রকৃতি চাষবাস ও সেচের জল সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নগরায়ণ ও শিল্পোন্নতির জন্য এখানে মাঝারি ধরনের জনঘনত্ব দেখা যায়। ছোটনাগপুরের সম্ভাব্য সম্পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। সেখানে একই মানের জনঘনত্ব রয়েছে। বলা যেতে পারে যে দেশের এই অংশে বর্তমানে খনিজ ও শিল্পের বিকাশ একদিকে যেমন সম্পদ ব্যবহারে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি এর পশ্চাদপদ এলাকার উন্নতি ঘটিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে মাঝারি জনঘনত্ব সৃষ্টি করেছে।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সমভূমি ও রাজস্থানের উত্তরাংশ মিলিয়ে আর একটি মাঝারি মালের জনবসতি বলয় দেখা যায়। স্বাধীনতার পর জাতীয় রাজধানী দিল্লীর সান্নিধ্য, পাঞ্জাবের পুনর্গঠনের ফল (1966) এবং সর্বোপরি সবুজ বিপ্লবকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে পৌর শিল্পবসতি গড়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে স্বাধীনতার সময় পাঞ্জাব (বর্তমানে পাকিস্তান) থেকে নিরাশ্রয় মানুষদের এদেশে আগমনের ফলে ভারতের এই অংশে শহরায়ন দ্রুততালে ঘটেছে। সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে।

C. কম ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলসমূহ (Low Density Regions)

পাকিস্তান, চীন ও ব্রহ্মদেশের (মায়ানমার) সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে প্রতি বর্গকিমিতে 50 জনেরও কম লোক বাস করেন। এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে কিছু প্রাকৃতিক বাধা রয়েছে। যেমন গুজরাটের কচ্ছের রণে জল জমে থাকা, রাজস্থানের মরুভূমি ও অন্যান্য জেলাগুলোর পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি। যে সব জায়গায় এসব বাধা নেই সেখানে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, যেমন রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলা, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর, অমৃতসর ও ফিরোজপুর জেলা। তাই দেখা যায় যে সীমান্তবর্তী অবস্থান ও তার সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা এই জেলাগুলোর জনঘনত্বকে কমিয়েছে! সীমান্তবর্তী অঞ্চল বাদে মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বে গোণ্ড আদিবাসী অধ্যুষিত বস্তার জেলায় জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 50 জনের কম।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও জনঘনত্ব কম (50 থেকে 150 জন)। কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যাংশেও কম জনবসতি দেখা যায়। এর কারণ হল প্রাকৃতিক বাধা ও জলকষ্ট। তার ফলে এই অঞ্চল দুটো চাষবাসের দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে। তাছাড়া, কোথাও কোথাও ব্যাপক ভূমিক্ষয়, আবার কোথাও গভীর বনভূমি চাষবাসের উন্নতির পক্ষে প্রধান বাধা। এর ফলে এখানে বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে উঠেছে। বর্তমানে কৃষিসম্পদ উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় একই শ্রেণিভুক্ত অন্যান্য অংশের তুলনায় এই অঞ্চলে জনঘনত্ব সামান্য বেড়েছে। কতকগুলো অংশে যেমন দণ্ডকারণ্য, চম্বল উপত্যকায়—(i) আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন, (ii) অবহেলিত অ-খ্রীষ্টীয় আদিবাসী এলাকায় সমাজ জীবনের মান উন্নয়ন, (iii) উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং (iv) প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সামনে রেখে কৃষি উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

জনঘনত্ব : 1991 ও 2001

পূর্বের (767) মত এবার (904) ও জনঘনত্বের দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সবার শীর্ষে রয়েছে। 1991 সালে জনঘনত্বের দিক দিয়ে বিহারের স্থান ছিল তৃতীয় এবং কেরালার দ্বিতীয়। 2001 সালের এদের উভয়ের স্থানের রদবদল ঘটেছে। অর্থাৎ বর্তমান জনগণনায় বিহারের স্থান হয়েছে দ্বিতীয় এবং কেরালার তৃতীয়।

পূর্বের (1991) ন্যায় এবার (2001) ও দশটি প্রদেশের জনঘনত্ব জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি রয়েছে। বলা বাহুল্য, ঐ রাজ্যগুলোতে জনঘনত্ব জাতীয় গড়ের চেয়ে দুবারই বেশি ছিল।

পাহাড়ি এলাকাগুলোতে জনঘনত্ব কমই রয়েছে (1991) সালে পাহাড়ি রাজ্যগুলোতে জনঘনত্ব 100-র (প্রতি বর্গকিমিতে) কম ছিল। বর্তমান জনগণনায় মেঘালয় (103), মণিপুর (107), হিমাচলপ্রদেশ (109) ও নাগাল্যান্ডের (120) জনঘনত্ব 100 ছাড়িয়ে গেছে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া সব কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলোতেই জনঘনত্ব জাতীয় গড়ের অনেক ওপরে। বলা বাহুল্য ঐ সব কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলো শহর এলাকা। আন্দামান ও নিকোবর কতকগুলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নিয়ে গঠিত এবং যোগাযোগের ব্যবস্থাও খুব অনুন্নত। কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলোর মধ্যে দিল্লী ও চন্ডীগড়ের জনঘনত্ব দারুণভাবে বেড়েছে। বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধে যে এর জন্য দায়ী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

3.3 অঞ্চল ও তার শ্রেণিবিভাগ এবং আঞ্চলিকীকরণ

❑ ভূমিকা

আগের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলি এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ভারতের আঞ্চলিক শ্রেণিবিভাগের জন্য প্রয়োজনীয়। প্রতিটি অঞ্চলের বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন—ভূমিরূপ, ভূ গঠনের ইতিহাস, জল নিকাশী ব্যবস্থা, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মৃত্তিকা—এসবের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। আনবিক স্তরে এইসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক প্রবিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তাদের আপাত সামঞ্জস্য সংলগ্ন অঞ্চল থেকে তাদের পৃথক করেছে। যেমন—ভূমিরূপ ও ভূগাঠনিক চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তর ভারতীয় সমভূমির মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নীচু স্তরে এই সমস্ত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পাঞ্জাব সমভূমি উভয়েই পাললিক সমভূমি হলেও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য রয়েছে। যদিও সার্বিক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারন করার জন্য স্থানীয় পার্থক্য উপেক্ষা করতে হয়। ভারতকে প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা সহজ নয়। সঠিক বিভাগ নির্ধারনের ভিত্তিতে এটি করতে হবে। প্রাকৃতিক ইতহাস, ভূ-গাঠনিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু ও মৃত্তিকা সবসময় পরস্পরের মধ্যে সমতা রক্ষা করে না, তারা অন্যত্রও ছড়িয়ে যায় সুতরাং আঞ্চলিক সীমারেখা স্পষ্ট নয়, আনুমানিক এগুলি শুধুমাত্র দুটি অঞ্চলের মধ্যবর্তী সন্ধিস্থানকে নির্দেশ করে।

ভারতের ত্রৈমাত্রিক প্রাকৃতিক বিভাগের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল। উত্তর ভারতীয় সমভূমি ও উপদ্বীপীয় মালভূমির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে এই অঞ্চলগুলিকে আরও অনু-অঞ্চলে ভাগ করা হয়। তিনটি অঞ্চলের এই অনুবিভাগ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন—স্থানীয় ভূমিরূপ, মৃত্তিকা ও জলবায়ু। এ সমস্ত অনু অঞ্চলের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলির বণ্টনে সমতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নিম্ন স্তরে এই উপাদানগুলির বিভিন্নতা লক্ষনীয় পার্থক্যের জন্ম দেয়।

ভারতবর্ষের ত্রৈমাত্রিক ভৌগোলিক বিভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক পার্থক্য রয়েছে। আসাম ও কাশ্মীর হিমালয় ভভয়েই উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের অংশ হলেও হিমবাহ, আদ্রতার বণ্টন, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে। একইভাবে উত্তর ভারতীয় সমভূমিতে পূর্বে হুগলী ও তিস্তা থেকে পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকার মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জসয লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একজন পরিদর্শকও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ, পাঞ্জাব অথবা বিহার সমভূমি ও গঙ্গা যমুনা দোয়াব অঞ্চলের মধ্যে ভূমিরূপ ও জলবায়ুর দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারবে, নদীর পলিক্ষেপন, আঞ্চলিক জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও মাটির অবস্থার বিভিন্নতা এই পার্থক্যের কারন। এমনকি পশ্চিম ও পূর্ব উত্তর-প্রদেশের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই দুই অঞ্চলের জলবায়ু এক নয়। সুতরাং প্রথম স্বরগত আঞ্চলিক বিভাগ দ্বিতীয় স্বরগত আঞ্চলিক বিভাগগুলির তুলনায় পৃথক।

প্রাথমিক স্তরগত আঞ্চলিক বিভাগসমূহ

প্রাথমিক আঞ্চলিক বিভাগ সমূহ হল—

(ক) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল,

(খ) উত্তর-ভারতীয় সমভূমি অঞ্চল,

(গ) উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল,

(ঘ) দ্বীপপুঞ্জসমূহ,

(ক) হিমালয় বিশিষ্ট ভূমিবূপসহ অনু অঞ্চল। এর ভূ-প্রকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির সাম্প্রতিককালে উৎপত্তি ঘটেছে এবং নদী ও হিমবাহের ক্ষয়কার্যের দ্বারা নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে ঢালের উচ্চ মাত্রা বেং তরাই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য মাটির গঠনে সাহায্য করে না। সুতরাং, এই উচ্চভূমিতে শুধুমাত্র মাটির একটি পাতলা স্তর রয়েছে। জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অক্ষাংশ, মাটির এবং পার্বত্য ঢালের যে অংশ সূর্যতাপ ও বায়ুপ্রবাহ যা বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণ এই সমস্ত ক্ষেত্রে পার্থক্য জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের বিভিন্নতার কারণ। অক্ষাংশীয় অঞ্চলের মধ্যে জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। হিমালয়ের এই বৈচিত্র্যই দ্বিতীয় স্তরের অঞ্চল বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে— যা, সম্ভবতঃ হিমালয়ের মতই জটিল।

স্থানীয় সামান্য বৈচিত্র্যসহ সাধারণ সমতল ভূমি উত্তর ভারতীয় সমভূমির বৈশিষ্ট্য তবে জলবায়ু এবং নদীর পলিক্ষেপন এখানে অন্যতম দুই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক। এরা ভূমি ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের কারন। জলবায়ু এবং নদীর উৎসের ভূগাঠনিক চরিত্র নদীর কার্যকে প্রভাবিত করে।

স্থানীয় সামান্য বৈচিত্র্যসহ সাধারণ সমতলভূমি উত্তর ভারতীয় সমভূমির বৈশিষ্ট্য তবে জলবায়ু এবং নদীর পলিক্ষেপন এখানে অন্যতম দুই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক। এরা ভূমি ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের কারণ। জলবায়ু এবং নদীর উৎসের ভূগাঠনিক চরিত্র নদীর কার্যকে প্রভাবিত করে। ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসের প্রাথমিক কাল থেকে যে অঞ্চল ক্ষয়শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সেই উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চলের ভূমিরূপ এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও মালভূমির উপরের স্তরের বৈচিত্র্যময় উত্থান, জলবায়ু, ক্ষয়ের মাত্রা, মৃত্তিকা এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদের বিভিন্নতার ফলে ভূ-গাঠনিক চরিত্রে স্থানীয় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মালভূমির দ্রাঘিমাংশগত বিস্তার প্রচুর। তাই এর স্থানীয় জলবায়ুর বৈচিত্র্যের ফলে মাটি ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতির ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় বৈচিত্র্য রয়েছে। উত্তরের সমভূমির তুলনায় এর বৈচিত্র্যের মাত্রা অনেক বেশী।

দ্বিতীয় স্তরগত আঞ্চলিক শ্রেণিবিভাগ

উপরে বর্ণিত ভারতের তিনটি অণু অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ আমাদের দ্বিতীয় স্তরগত আঞ্চলিক বিভাগসমূহকে নির্নয় করতে সাহায্য করবে।

১। পার্বত্য হিমালয়ের অঞ্চলসমূহ

পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে হিমালয়ের কতগুলি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক বিভাগ রয়েছে। সেগুলি হল ঃ

(১) কাশ্মীর

(২) কারাকোরাম, লাদাখ ও বাল্টিস্তান/বালতিস্তান

(৩) হিমাচল ও কুমায়ুন

(৪) পূর্ব হিমালয়

(৫) পূর্বাঞ্চলীয় পর্বতসমূহ

পশ্চিম হিমালয়ের উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত কাশ্মীর উপত্যকার কিছু অনন্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নাতিশীতোষ্ম জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ম জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ম ও আল্পীয় বনভূমি, সমতল ভূমিরূপ এবং প্রচুর জলের সরবরাহ এর কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সংলগ্ন পর্বতমালা, যেমন—পীরপাঞ্জল এবং হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গ সমূহে জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। অক্ষাংশ এবং সূর্যতাপ ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এর অন্যতম কারন।

উত্তরে উচ্চ হিমালয়ের মধ্যেই নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে কারাকোরাম পর্বতমালা এবং বিভিন্ন প্রাচীন মালভূমিসমূহ, যেমন—বালতিস্তান, আক্সাই চিন, দেওসাই প্রমুখ। উচ্চ হিমালয় পর্বতমালা এবং কাশ্মীর উপত্যকার উত্তর পূর্ব দিকে লাদাখ অবস্থিত। অত্যাধিক শীতল আবহাওয়ার জন্য এর জলবায়ুর অনন্য কিছ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। স্বাভাবিক উদ্ভিদও এখানে বিরল।

শতদ্রু গিরিখাতের পূর্বদিকের পর্বতমালা হিমাচল হিমালয় নামে পরিচিত। আরও পূর্বদিকে গিয়ে এরা উত্তর প্রদেশের উত্তরাখন্ড ও কুমায়ুন অঞ্চলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এর ভূমিরূপের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বৃষ্টিপাতের দিক দিয়ে হিমাচল হিমালয় কাশ্মীর হিমালয়ের থেকে আলাদা। কুলু এবং কাংড়া উপত্যকার নিজস্ব ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সিমলায় প্রতি বছর 160 সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়।

ক্রান্তীয় বনভূমির প্রকৃতি বেশি বৃষ্টিপাত দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিশেষতঃ নীচু অঞ্চলগুলিতে। কুমায়ুনে সাধারণ প্রাকৃতিক কাঠামো মোটামুটি একই প্রকারের ।

পূর্ব হিমালয় পশ্চিম হিমালয়ের তুলনায় এতটাই আলাদা যে তাদের একটি পৃথক বিভাগ হিসাবে গন্য করতে হয়। 86^0 থেকে 88^0 পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 88^0 পূর্ব দ্রাঘিমার পূর্বদিকে পর্বতগুলির অনুবাত ঢাল বঙ্গোপসাগর থেকে আগত শক্তিশালী মৌসুমী বায়ুর মুখোমুখি হওয়ায় এইসব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলের ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরহরিৎ বনভূমির বৃদ্ধিই একে হিমালয়ের পশ্চিমাংশ থেকে পৃথক করে দেয়। কোনোরকম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়াই এইসমস্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্য পূর্বদিকে আসাম হিমালয় পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়।

হিমালয়ের নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালার দক্ষিণের বিস্তৃতিই হল ভারত মায়ানমার পার্বত্য অঞ্চল। এটি নিম্ন অক্ষাংশে অবস্থিত এবং এর ভূমিরূপও ততটা উঁচু নয়। 2000 মিটারের বেশি এদের উচ্চতা দেখা যায় না। এই সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 200 সেমি এরও কম হয়। ঘন বনাঞ্চল রয়েছে, যদিও এটি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ থেকে মৌসুমী পত্রমোচনকারী বনভূমিতে পরিবর্তিত হয়।

(ii) **উত্তর-ভারতীয় সমভূমির অঞ্চলসমূহ**

উত্তর ভারতীয় সমভূমি হিমালয়ের সমান্তরালে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত। এটি পার্বত্য অঞ্চল ও দাক্ষিণাত্য মালভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে নিম্নলিখিত প্রধান আঞ্চলিক বিভাগসমূহ পরিলক্ষিত হয়—

(৬) পাঞ্জাব সমভূমি (সিন্ধু সমভূমির একটি অংশ)

(৭) সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি

(৮) গাঙ্গেয় সমভূমি

(৯) গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ

(১০) আসাম উপত্যকা (ব্রহ্মপুত্র সমভূমি)

একেবারে পশ্চিমে অবস্থিত পাঞ্জাব সমভূমি বৃহত্তর সিন্ধু সমভূমির অংশ। পাঞ্জাব সমভূমির একটি ক্ষুদ্র অংশ আসলে ভারতে অবস্থিত। সাধারণতঃ শুষ্ক জলবায়ু এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। বিস্ ও রবির মধ্যবর্তী বারি, বিশ ও শতদ্রুর এর মধ্যবর্তী বিস্তর, রবি ও চেনাব এর মধ্যবর্তী রচনা এবও চেনাব ও ঝিলাম এর মধ্যবর্তী চর অবশিষ্ট সমভূমির থেকে পরিবর্তিত নদী প্রবাহের জন্য ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আলাদা। এর শুষ্ক জলবায়ু এবং শুষ্ক কাঁটা ঝোপ্ জাতীয় অরণ্য একে পূর্ব দিকের প্রায় আর্দ্র গাঙ্গেয় সমভূমি থেকে পৃথক করেছে।

সিন্ধু-গাঙ্গেয় অঞ্চল সিন্ধু ও গঙ্গানদীদ্বয়ের জলনিকাশী ব্যবস্থার মধ্যবর্তী জলধৌত একটি অঞ্চল। হরিয়ানার যমুনা ও শতদ্রু এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত এই স্থানটির কিছু সাধারন পাললিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আরাবল্লী পর্বতের বহিরাংশ হরিয়ানার দক্ষিন পশ্চিম অংশে কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। ভূ-গাঠনিক চরিত্র এবং জলবায়ু

উভয় ক্ষেত্রেই সিন্ধুগাঙ্গেয় অঞ্চল প্রায় আর্দ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে প্রায় শুষ্ক পাঞ্জাব সমভূমি পর্যন্ত পরিবর্তন সুচিত করে।

গঙ্গা এবং তার অসংখ্য শাখানদী দ্বারা বেষ্টিত সমতল পাললিক ভূমি বিশাল গাঙ্গেয় সমভূমির ভূমিরূপ গঠন করেছে। কিন্তু ভূমিরূপগত এই সামঞ্জস্য জলবায়ুর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। পূর্বদিকে ক্রমশঃ বৃষ্টিপাতের পরিমান বাড়ে। এর ফলে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও মৃত্তিকার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফলতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অঞ্চলটি দুটি উপবিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা— উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি ও নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে জলবায়ুর ক্ষেত্রে আর্দ্রতার পরিবর্তন দেখা যায়। পাললিক সমভূমির ব-দ্বীপীয় বৈশিষ্ট্যের (জালের মতো নদী বিন্যস্ত ও উচ্চ আর্দ্রতা) সঙ্গে উচ্চ তাপমাত্রাও থাকে যা একে অবশিষ্ট সমভূমি থেকে পৃথক করে।

পূর্বের দিকে আসামে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নামে এই সমভূমির একটি সুনির্দিষ্ট উপবিভাগ রয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল, পূর্বাঞ্চল বা পার্বত্য অঞ্চল ও শিলং মালভূমির বহিরাংশ দ্বারা এই উপত্যকা পরিবেষ্টিত। এখানে মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে। যদিও গ্রীষ্মের সময়কাল পশ্চিমের তুলনায় কম তবুও প্রচুর বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার জন্য এখানে ঘন বনভূমি দেখা যায়।

(iii) উপদ্বীপীয় মালভূমির অঞ্চলসমূহ

দাক্ষিণাত্য মালভূমির অন্তর্গত দ্বিতীয় স্তরগত অঞ্চলগুলি হল—

(১১) থর মরুভূমি
(১২) আরাবল্লী পার্বত্য অঞ্চল
(১৩) মধ্য বিন্ধ্য উচ্চভূমি
(১৪) খান্দেশ ও সাতপুরা মহাকাল পার্বত্যভূমি
(১৫) ছোটোনাগপুর মালভূমি
(১৬) মেঘালয় মালভূমি
(১৭) কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়,
(১৮) গুজরাট সমভূমি,
(১৯) কোঙ্কন উপকূলভূমি,
(২০) গোয়া ও কানাড়া উপকূলভূমি
(২১) কেরালা উপকূলীয় সমতলভূমি,
(২২) পশ্চিমঘাট,
(২৩) দাক্ষিণাত্য লাভা মালভূমি
(২৪) কর্ণাটকের মালভূমি,
(২৫) বেনগঙ্গা ও মহানদী উপত্যকা,
(২৬) তেলেঙ্গানা
(২৭) দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল,
(২৮) পূর্বঘাট,
(২৯) ওড়িশার ব-দ্বীপ.
(৩০) অন্ধ্রের উপকূলীয় সমতলভূমি ও ব-দ্বীপ ভূমি,
(৩১) তামিলনাড়ু মালভূমি

সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমির সীমান্তবর্তী মালভূমির উত্তরাংশে নদীর জলধারা দ্বারা বিচ্ছিন্ন টেবিল ল্যান্ডের সারি রয়েছে। আরাবল্লীর পশ্চিমে বিন্ধ্য উচ্চভূমির শুষ্ক অঞ্চল থর মরুভূমি নামে পরিচিত। প্রচণ্ড উষ্ম ও শুষ্ক জলবায়ুতে ক্রমাগতঃ নগ্নীভবনের ফলে বহু বছর ধরে এখানে বালি পুঞ্জীভূত হয়েছে। স্বাভাবিক উদ্ভিদ এখানে বিরল। থর মরুভূমি প্রতিবেশী পাকিস্থানেও বিস্তৃত হয়েছে। আরাবল্লী পর্বত রাজস্থান মরুভূমিকে বিন্ধ্য উচ্চভূমি ও পূর্বে অবস্থিত বুন্দেলখণ্ড উচ্চভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করেচে। আরাবল্লীর পার্বত্য চরিত্র উপয়পুরে বোঝা যায়। এর পশ্চিম ঢালে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় এবং বনাঞ্চল রয়েছে। উত্তর আজমেরে আজ স্বাভাবিক উদ্ভিদের আচ্ছাদন নেই। এখানে তারা আড়াআড়ি উপত্যকা দ্বারা নিজেদেরকে কিছু সমান্তরাল শৈলশ্রেণীতে বিভক্ত করেছে।

মালব মালভূমি ও বুন্দেলখণ্ড উচ্চভূমি দ্বারা গঠিত মধ্য বিন্ধ্য উচ্চভূমি ভৃগুতট ও পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা কিছু অংশে বিভক্ত হয়েছে, যথা—বিন্ধ্যায়ন, বানভার এবং কাইমুর পার্বত্য অঞ্চল। উচ্চভূমি যথেষ্ট বন্ধুর। সরু নদী উপত্যকা ছাড়া এর মাটির আচ্ছাদন পাতলা। এর স্বাভাবিক উদ্ভিদ ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী থেকে ক্রান্তীয় শুষ্ক প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়।

নর্মদার দক্ষিণে কিছু ভৃগুতটযুক্ত মালভূমি রয়েছে। এর ভূমিরূপ প্রধানতঃ খাড়া সাতপুরা, মহাদেব ও বৈকাল পর্বতশ্রেণী দ্বারা গঠিত। তাপী নদীর উপত্যকায় এর শাখানদী পূর্ণ দ্বারা কিছু পরিমান পলি অবক্ষিপ্ত হয়েছে। অজন্তা ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর মাঝে এই পাললিক উপত্যকাতেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক খান্দেশ অবস্থিত।

পূর্বদিকের ছোটোনাগপুর মালভূমির কিছু আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর অন্যাংশের বিভিন্নতা, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্রতা এখানে ঘন ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য সৃষ্টি করেছে। পূর্বদিকে উপদ্বীপীয় মালভূমির বহিরাংশ শিলং মালভূমি আরও বন্ধুর ও আর্দ্র। ক্ষয়কার্যের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহ এখানে ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্য বিশিষ্ট এক জটিল পার্বত্যভূমির সৃষ্টি করেছে।

উপদ্বীপীয় মালভূমির পশ্চিম অংশে কাথিওয়াড় ও কচ্ছ এলাকায় লাভা গঠিত সমভূমি দেখা যায়। কাথিওয়াড় উপদ্বীপের কিছু মালভূমির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি উত্তরে কাদা ও লবন বর্জ্য দ্বারা গঠিত ও কচ্ছ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। কাথিওয়াড়ের সাধারণ উচ্চতা 200 মিটারের নীচে। কিন্তু এখানে কিছু পাহাড়ি শৈলশ্রেণী রয়েছে যেমন—গির শৈলশ্রেণী যার উচ্চতা সাধারণ ভূমিরূপের থেকে বেশি। শিলার গঠন ও ভূমিরূপের বিভিন্নতার ফলে মাটি ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতিতেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। শুষ্ক জলবায়ু এবং বিরল পর্ণমোচী বনাঞ্চল এখানকার মূল বৈশিষ্ট্য।

গুজরাট সমভূমির নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সবরমতী, মাহী, নর্মদা ও তাপ্তি নদী সমূহের ঘন পলিক্ষেপন অঞ্চলটিকে পাললিক উপত্যকা হিসেবে গড়ে তুলেছে। জলবায়ুর দিক থেকে গুজরাট সমভূমি আর্দ্র পশ্চিম উপকূল হিসেবে গড়ে তুলেছে। জলবায়ুর দিক থেকে গুজরাট সমভূমি আর্দ্র পশ্চিম উপকূল এবং শুষ্ক ও প্রায় শুষ্ক রাজস্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অন্তর্গত। আগেই বলা হয়েছে, পশ্চিম উপকূল কোঙ্কন, গোয়া এবং কেরালা উপকূল নিয়ে গঠিত। কোঙ্কন উপকূল সরু এবং এখানে ঘাট পর্বতমালার বহিঃভৃগুতটগুলি দেখা যায়। গোয়া ও কানাড়া উপকূল কোঙ্কন ও কেরালার সন্ধিস্থল। এটি উষ্ম ও আর্দ্র জলবায়ুর বিশিষ্ট অঞ্চল এবং যত দক্ষিনের দিকে এগোনো যায়, তত বর্ষার সময়সীমা বৃধি পায়। উপকূলীয় সমভূমি দক্ষিনে কেরালা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই অঞ্চলটির নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। বৃষ্টিপাতের বণ্টন ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের দিক দিয়ে কেরালা উপকূলে যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। উপদ্বীপের দক্ষিণ বিন্দুর দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমান ক্রমশঃ কমতে থাকে।

দাক্ষিণাত্য লাভা মালভূমির পশ্চিমদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে ঘাট পর্বতমালা দক্ষিণদিকে কর্ণাটক অতিক্রম করে বিস্তৃত হয়েছে। এদের উচ্চতা 900 থেকে 1100 মিটার। কিন্তু গোয়ার কাছে আকস্মিক ভাবেই ঘাটগুলির ভূ-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়।

এখানে বন্ধুর লাভা মালভূমির জায়গায় গ্রানাইট ও নিস্ দ্বারা গঠিত গম্বুজাকৃতি পাহাড় দেখা যায়। ঘাটগুলি নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। যদিও কিছু ফাঁক যেমন পালঘাট ও শোনকোটা ফাঁক যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে। ঘাটগুলিতে সাধারণত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী অরন্য দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে প্রচুর লাভা অবক্ষেপন রয়েছে। উপদ্বীপে আগ্নেয়গিরির কার্যাবলীর শেষ স্তরে এই লাভা স্তরগুলি সমান্তরালভাবে গঠিত হয়েছে। এই সমতল টেবিল ল্যান্ডের সীমায় রয়েছে পার্বত্য শৈলশ্রেণী যেমন অজন্তা পর্বত। ঘটনাগুলি আরব সাগর থেকে আগত দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে, যার ফলে এই অঞ্চল বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ স্বরূপ। লাভাগঠিত শিলার আবহবিকার এখানে ভারতের বিখ্যাত কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে।

দাক্ষিণাত্য মালভূমির লাভার পরিবর্তে কর্ণাটক মালভূমিতে গ্রানাইট ও নিস্ দেখা যায়। এই অঞ্চলে ৪৫০ থেকে ৮০০ মিটারের মধ্যবর্তী সামঞ্জস্যপূর্ণ ভূমিরূপ দেখা যায়। কিন্তু ভূমিরূপের সাধারণ সামঞ্জস্য স্থানীয় জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও মৃত্তিকার বৈচিত্র্যের দ্বারা ব্যাহত হয়। এই বৈচিত্র্যের দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল মালনাদ ও ময়দান।

দাক্ষিণাত্য লাভা মালভূমির পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে কিছু তরঙ্গায়িত সমভূমি ও নীচু উপত্যকা রয়েছে। ছত্তিশগড়ের ওয়েনগঙ্গা ও মহানদী উপত্যকা এর অন্তর্গত এই দুই উপ অঞ্চলের মধ্যে বৃষ্টিপাতের বণ্টন ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। ওয়েনগঙ্গা উপত্যকায় বৃষ্টিপাতের পরিমান সাধারণতঃ ১৩৫ সেমির কম। উত্তর মহানদী উপত্যকায় বৃষ্টিপাতের পরিমান এর বেশী। ওয়েনগঙ্গা উপত্যকায় শালবনের, সৃষ্টি হয়েছে। আবার মহানদী উপত্যকায় টিক বন দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্য মালভূমির দক্ষিণ-পূর্বে তেলেঙ্গানা অবস্থিত। এটি একটি নীচু নগ্নীভূত ও বিচ্ছিন্ন মালভূমি। মুক্ত ও পরিণত ভূপ্রকৃতিতে বিচ্ছিন্ন শিলাখণ্ড যা মোনাডনক নামে পরিচিত তা কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। শুধুমাত্র উত্তর অংশে অল্প গাছপালা রয়েছে। দক্ষিণে প্রধানতঃ সাভানা জাতীয় ক্রান্তীয় ঘাস দেখা যায়।

পশ্চিমঘাটের পালঘাট ফাঁক দক্ষিণের উপদ্বীপের সবচেয়ে জটিল শৈলশ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। নীলগিরি, আন্নামালাই এবং পালনি-কার্ডামম পর্বতসমূহ নিয়ে দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল গড়ে উঠেছে।

বন্ধুর ভূমিরূপ ছাড়াও এই সমস্ত পর্বতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সেগুন ও চন্দন কাঠের ঘন বনভূমি।

উপদ্বীপের পূর্বসীমা নির্দেশ করেছে পূর্বঘাটের বিচ্ছিন্ন পর্বতসমূহ। পশ্চিমঘাটের সঙ্গে তাদের কোনো তুলনা করা যায় না। এই পর্বতমালা তিনটি বিভাগ নিয়ে গঠিত (i) উত্তরের পর্বতসমূহ যা জামসেদপুর ও গোদাবরীর মাঝে রয়েছে। (ii) গোদাবরী ও পালকোণ্ডা শৈলশ্রেণীর মধ্যবর্তী পর্বতসমূহ যা প্রধানতঃ কুডাপ্পা জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত, (iii) পালার ও কাবেরীর মধ্যবর্তী তামিলনাড়ু পর্বতমালা। এই সমস্ত পর্বতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল বৃষ্টিপাত (যা সমভাবে বণ্টিত নয়।) এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদ। পূর্ব উপকূলের সমান্তরালে এর অবস্থিতি এবং উত্তর দক্ষিণে বৃষ্টিপাতের বণ্টনের দরুন এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তরের পর্বতগুলিতে দক্ষিণের পর্বতগুলির তুলনায় বনভূমির আচ্ছাদন বেশি। কুডাপ্পা শৈলশ্রেণীতে বনাঞ্চল রয়েছে তবে তা উত্তরের শৈলশ্রেণীর মতো ঘন নয়। তামিলনাড়ু পর্বতমালার পূর্বঢালে কিছু বনাঞ্চলে দেখা যায়।

ভারতের পূর্ব উপকূলের তিনটি অংশ রয়েছে ওড়িশা উপকূল, অন্ধ্রউপকূল ও তামিলনাড়ুর করমণ্ডল উপকূল, ওড়িশায় মহানদী ও ব্রাহ্মনী এক বিশাল ব-দ্বীপ সমভূমি গড়ে তুলেছে যার কিছু অংশ বেশ আর্দ্র ও বনাঞ্চল রয়েছে। অন্ধ্র উপকূলীয় সমভূমি এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণার বদ্বীপীয় অঞ্চল দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরপূর্ব মৌসুমী অঞ্চলের সন্ধিস্থলকে নির্দেশ করে। গোদাবরী-বদ্বীপে এই সন্ধিস্থল স্পষ্ট বোঝা যায়। করমণ্ডল উপকূলে উত্তর

মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রভাবিত নির্দিষ্ট. বৃষ্টিপাত অঞ্চল রয়েছে। সমগ্র উপকূলীয় সমভূমি এবং গোদাবরী কৃষ্মা ও কাবেরীর ব-দ্বীপসমূহে ঘন কৃষ্কার্যের উপর নির্ভরশীল ঘন জনসমাগম ঘটেচে।

(iv) **দ্বীপসমূহ**

দ্বীপসমূহ দুটি প্রধান বিভাগ নিয়ে গড়ে উঠেছে। যথা (৩২) লাক্ষাদ্বীপ অঞ্চল। (৩৩) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপাঞ্চল।

প্রথমটি আরব সাগরে কেরালা উপকূলের কাছে এবং দ্বিতীয়টি বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। গঠন, ভূমিরূপ, জনসমাগমও ঐতিহ্যের দিক থেকে এই দুই দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। লাক্ষাদ্বীপ পুঞ্জ তিরিশটি ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত যার মধ্যে শুধুমাত্র দশটিতে জনবসতি আছে। তারা প্রবাল দ্বীপ এবং এদের জলবায়ু আর্দ্র ও ক্রান্তীয়। তাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমগ্র দেশের পর্যটকদের আকর্ষন করে। ভৌগোলিক দিক থেকে কেরালার নৈকট্য এদের সংস্কৃতি ও জনগনের ভাষাকে প্রভাবিত করেছে, কারণ অধিকাংশ জনসাধরণেরই ভাষাভুক্ত পূর্বপুরুষ মালয়ালি। তারা অধিকাংশই মুসলিম এবত এদের পুরো প্রজাতি তপশিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রশাসিত লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী কাভারাতিতে অবস্থিত।

অন্যদিকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণদিকে মায়ানমারের কেপ নিগারির অংশীভূত দ্বীপপুঞ্জ হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই দ্বীপপুঞ্জ সুমাত্রার ইন্দোনেশীয়া দ্বীপপুঞ্জ সুমাত্রার ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এর দুইটি উপবিভাগ আছে—আন্দামান ও নিকোবর। প্রথমটি উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান ও দক্ষিণ আন্দামান নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয়টি কার নিকোবর, লিট্‌ল নিকোবর ও গ্রেট্ নিকোবর নিয়ে গঠিত। এই দ্বীপপুঞ্জগুলিতে ঘন বনাঞ্চল রয়েছে। এছাড়া এখানে ওঙ্গি, আন্দামানী ও নিকোবরীদের ছোটো আদিবাসী গোষ্ঠীর জনবসতি রয়েছে। কালের যাত্রায় এই সমস্ত আদিবাসীরা ভারতের মূল ভূখন্ড থেকে আগত অ-আদিবাসীদের তুলনায় সংখ্যায় ছাপিয়ে গেছে। ব্রিটিশরা পোর্টব্লেয়ারে সেলুলার জেল তৈরী করেছিল যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দী করা হত।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্বতন জেলবন্দীরা অনেকেই তাদের পরিবার নিয়ে এখানে বসবাস শুরু করে। নিরক্ষীয় পরিবেশের অন্তর্গত ক্রান্তীয় জলবায়ুর ফলে এখানে স্বাভাবিক উদ্ভিদের ঘন বনাঞ্চল গড়ে উঠেছে ও বন্য প্রাণীদের বসতি স্থাপিত হয়েছে যা দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষার উপপরিবার ভূক্ত ও মন-স্যেমর এর শাখা নিকোবরীদের সঙ্গে নিকোবর আদিবাসীদের সাযুজ্য রয়েছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্টব্লেয়ারে অবস্থিত।

3.3.1 গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ (পশ্চিমবঙ্গ) The Ganga Delta (West Bengal)

● **ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল** ঃ ভূ-তত্ত্বীয় ও ভূমিরূপের বিবর্তনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ও ভূমিরূপ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাগচীকে (1944) অনুসরণ করে গঙ্গা-বদ্বীপকে আমরা তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। বাগচীর গবেষণার পর গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ভূপ্রাকৃতিক দৃশ্যপটের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই বাগচীর শ্রেণিবিভাগের

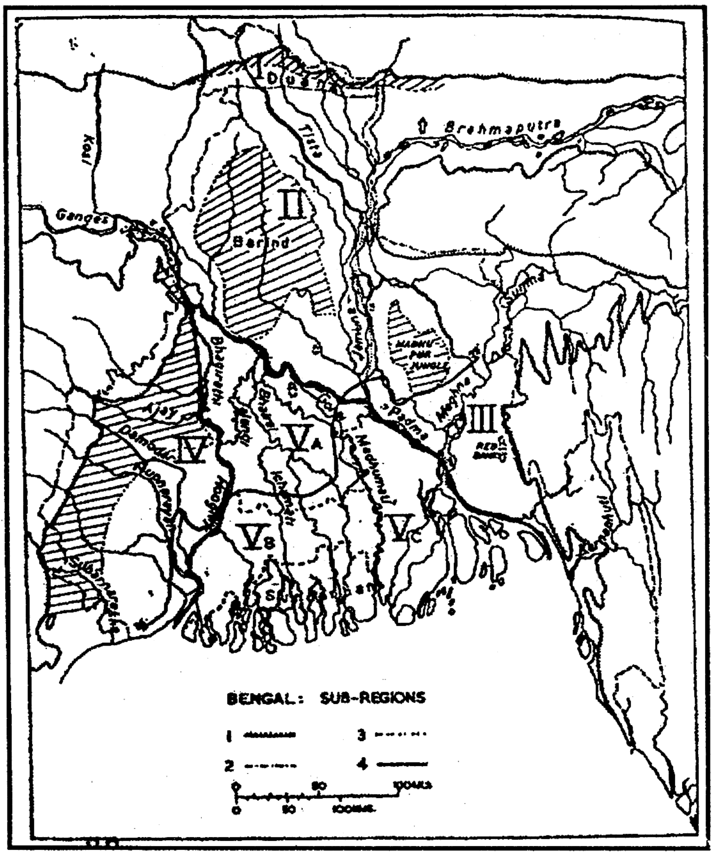

চিত্র 3.79 ঃ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ (অবিভক্ত বাংলা) অঞ্চল চিত্রে V অংশটুকু ব-দ্বীপ অঞ্চল, V-A মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ, V-B মুমূর্ষ ব-দ্বীপ এবং V-C সক্রিয় ব-দ্বীপ অবলম্বনে)

সীমারেখার (Boundary) কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। বাগচী ও মুখার্জীর এক সমীক্ষায় সেকথা বলা হয়েছে। (Diagnostic Survey of Deltaic West Bengal, C.U.Publ.)

● **মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ (Moribund delta)** ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বভাগ ও নদীয়া জেলা, উত্তর 24 পরগনার কিয়দংশ [illegible] এবং বাংলাদেশে কুষ্টিয়া ও যশোহর জেলা এই ভূ-ভাগের অন্তর্গত (চিত্র [illegible])। গঙ্গানদীর মূল প্রবাহ ক্রমশ পূর্বদিকে সরে যাওয়ায় ভাগিরথীর শাখানদীগুলি প্রধান নদী গঙ্গা থেকে যথেষ্ট পরিমান জল পায় না (বর্ষার সময় কয়েকটা দিন ছাড়া)। ফলে তারা মজে গেছে বা ক্ষীণস্রোতায় পরিণত হয়েছে। ভাগিরথী-হুগলী, ভৈরব-জলঙ্গী, চুর্ণী-ইচ্ছামতী, মাথাভাঙ্গা হল এই ধরণের নদী। ভূমির ঢাল কম থাকায়

নদীগুলো বহু বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অনেক নদীবাঁক পরিত্যক্ত হয়েছে। তাই অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, বিল এই অঞ্চলে ইতঃস্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মানের ফলে গঙ্গার জলপ্রবাহ কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের দিকে পদ্মার তট বিপজ্জনক ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছে। এবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে গঙ্গা ও ভাগীরথীর উৎস মুখের (off-take) মধ্যে অল্পভূমি অবশিষ্ট রয়েছে। হয়তো গঙ্গা ভাগীরথীর উৎস মুখকেই গ্রাস করবে। সে ক্ষেত্রে ফারাক্কা বাঁধের উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে। ব-দ্বীপের এই অংশের উচ্চতা 12 মিটার থেকে 18 মিটার। নদীগুলো স্বাভাবিক বাঁধের মধ্য দিয়ে ভূমিকে কেটে প্রবাহি হচ্ছে। বর্ষার জল এই সমস্ত নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। নদীগুলির অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বর্ষার সময় ও বিস্তৃত ক্ষেত্র প্লাবিত হয় না। দুই নদীর মধ্যবর্তী নীচু জায়গা (interfluve) বর্ষার জলে ভরে যায়। ধৌতক্রিয়ার (leaching) অভাবে স্থানীয়ভাবে মাটি লবণাক্ত হয়ে উঠেছে।

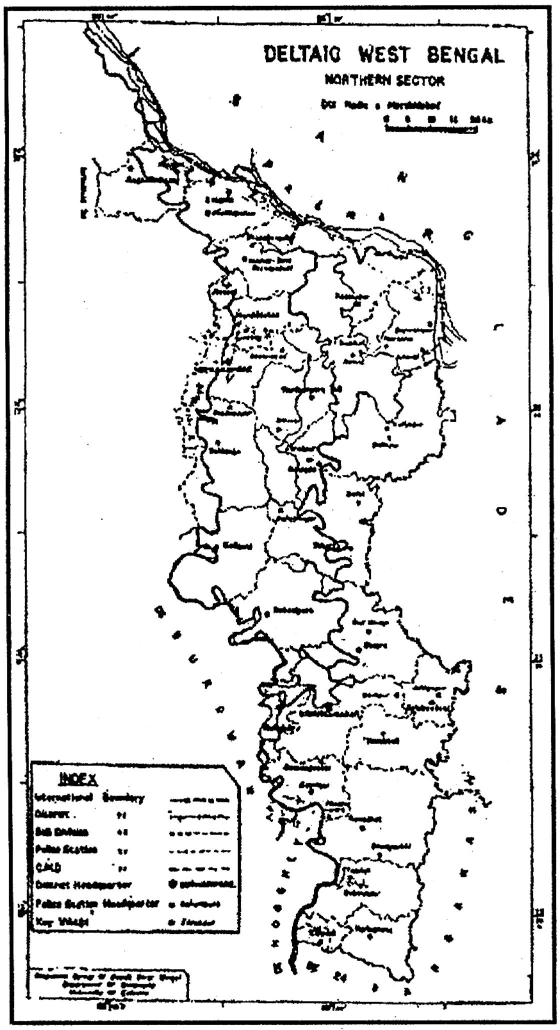

চিত্র 3.80 ঃ ব-দ্বীপের (পশ্চিমবঙ্গ অংশ) উত্তরাংশে

● **পরিনত ব-দ্বীপ (Mature delta)** ঃ মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ ও সুন্দরবন অঞ্চলের অন্তবর্তী অংশে উত্তর 24 পরগনা জেলার অর্ধাংশে (দক্ষিণভাগ) এবং দক্ষিণ 24 পরগণার অর্ধাংশ (উত্তরভাগ) তথা বাংলাদেশে খুলনা জেলার উত্তরের অর্ধাংশ এই ব-দ্বীপের অন্তর্গত। এই অংশের অবস্থা এখন ও পূর্বোক্ত মৃতপ্রায় ব-দ্বীপের অবস্থায় পৌঁছায়নি। কারণ এই অংশের নদীগুলো এখনও কিছুটা সজীব রয়েছে ও নদীর ধারে ধারে কিছু কিছু পলি সঞ্চয় হচ্ছে। অর্থাৎ ব-দ্বীপের এই অংশে ভূমি গঠনের কাজ এখনও চলছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে নদীর স্বাভাবিক স্রোত অপেক্ষা জোয়ার ভাঁটা জনিত স্রোতই নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অবশ্য এটা ঠিক যে বর্ষাকালে বৃষ্টির জল এখানকার নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অবশ্য এটা ঠিক যে বর্ষাকালে বৃষ্টির জল এখানকার নদী গুলোকে প্রচুর জল সরবরাহ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ইচ্ছামতী, বিদ্যাধরি ও পিয়ালী নদীর নিম্নপ্রবাহ সজীব থাকলেও এদের উর্ধ্বপ্রবাহে মৃত প্রায় অবস্থায় রয়েছে। পরিণত ব-দ্বীপের উচ্চতা 12 মিটার থেকে 6 মিটার।

● **সক্রিয় ব-দ্বীপ (Active delta)** ঃ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশ (অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চল), বাংলাদেশের খুলনা জেলার দক্ষিণাংশ এবং মধুমতী ও মেঘনা নদীর অন্তবর্তী অংশে ফরিদপুর, বরিশাল, নোয়াখালি ও পটুয়াখালি জেলা সক্রিয় ব-দ্বীপের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল জনবসতিহীন। তাই এখানে নদীর সাথে মানুষের সংঘাত বাধেনি। এজন্য এখানে ব-দ্বীপ গঠনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। Bagchi ও Mukherjee (1978)-র ভাষায় "The delta margin as a whole is showing advancing towards

the sea", এখানে ম্যানগ্রোভ অরন্য গড়ে উঠেছে। সুন্দরবনের অর্ধাংশ জোয়ারের জলে নিমগ্ন হয় ও দুই নদীর অন্তবর্তী স্থানে পলি সঞ্চিত হচ্ছে। তাই এই অংশে ভূমিগঠন প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে চলেছে। এর ফলে উপকুলীয় অংশে বিভিন্ন দ্বীপগুলোর উচ্চতা ক্রমশ বাড়ছে ও ছোট ছোট দ্বীপগুলো জোড়া লেগে বড়-দ্বীপের সৃষ্টি হচ্ছে।

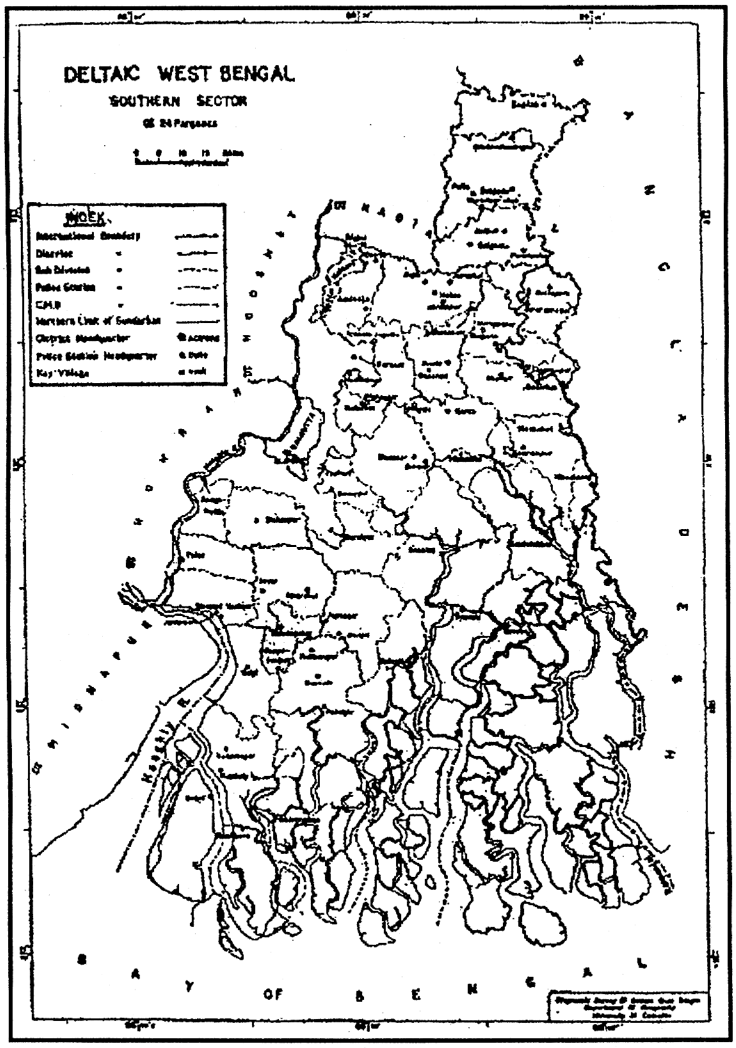

চিত্র 3.81 ঃ ব-দ্বীপ দক্ষিণাংশে

বড় দ্বীপগুলো আরো বড় হচ্ছে। Bagchi ও Mukherjee (1978)-র ভাষায় "The surface levels of the islands are being gradually elevated and in the process small islands are uniting to both bigger islands and the bigger ones even more big" সুন্দরবন অঞ্চলে উত্তর দক্ষিনে বিস্তৃত প্রধান খাঁড়ি নদীগুলো হল পশ্চিমবঙ্গের বুড়ীগঙ্গা-বড়তলা, সপ্তমুখী, ঠাকুরান, মাতলা, গোসাবা, রায়মঙ্গল। এখানকার উচ্চতা 3 মিটারের কম।

পরিশেষে একটা কথা অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হল মানুষের হস্তক্ষেপের দরুন ব-দ্বীপ গঠনের কাজ ব্যাহত হয়। Bagchi (1944) সক্রিয় ব-দ্বীপের মধ্যে সাগর, নামখানা ও পাথরপ্রতিমা থানাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত

করেছিলেন, কিন্তু মানুষের হস্তক্ষেপে যে সব পরিণত ব-দ্বীপে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। কারণ "These areas are at present protected by embankments, settled and cultivated. The land building process has thus been made to cease."।

● **নদনদী ঃ** গঙ্গা ভাগীরথী-হুগলী এই অঞ্চলের প্রধান নদী। এখানকার নদী বিবর্তন আলোচনা করতে গিয়ে Spate লিখেছেন "The cardinal factor in the later history of the delta has been the eastward shift of the Ganga waters from a main oulet along the western margins the Bhagirathi– Hoogly- to the main course, the Padma-Meghna, with such streams as the Ichamati, Jalangi, Matabhanga, Gorai"। কিন্তু কেন গঙ্গা নদীর এই পূর্বমুখী অভিযান? এই নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। "Whether this is mainly due to alluviation at the heads of successive main spillways, to tectonic change, to shifts in the balance of the Delta due to changes of course elsewhere or the secular swing to the east, are questions which admit of large and inconclusive debate (O.H. Spate, 1967)"।

প্রধান নদীতে চড়া পড়ে শাখা নদী (Distributary) ও উপ-শাখানদী (Re-distributary) কিভাবে হয়? আমরা জানি গঙ্গা তার উচ্চ ও মধ্যগতি থেকে প্রচুর পলি ও বালুকা বহন করে এনে নিম্নপ্রবাহে নদীগর্ভে সঞ্চয় করে থাকে। এভাবে ভাগীরথীহুগলী নদীর বুকে পলি ও বালি জমতে জমতে জড়াভূমির সৃষ্টি হয় এবং নদীর প্রবাহপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় চড়াভূমির দুপাশ দিয়ে নদী বেগে প্রবাহিত হয়। তাছাড়া হুগলী নদীর মোহনা থেকে নবদ্বীপ অঞ্চল পর্যন্ত প্রতিদিন জোয়ার আসে। ভাগীরথী-হুগলী নদীর প্রবাহ বিপরীত সমুদ্রস্রোতে বাধা পায়। এভাবে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে এখানে ভাগীরথী-হুগলীর গর্ভে প্রচুর বালিও পলি জমে চড়া পড়তে থাকে। এক সময়ে ভাগীরথী অনেক শাখা বিস্তার করে এইখানে অনেক চড়া ও ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছিল। নদীয়া জেলার নবদ্বীপও (নব-নতুন) যে একসময় এইরূপ একটি চড়া থেকে উৎপন্ন হয়েছে তার ইঙ্গিত নবদ্বীপের নামকরণে রয়েছে। ত্রিবেণীর (ি-তিন) কাছে ভাগীরথী যে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়েছিল তার প্রমাণ পশ্চিম পার্শ্বস্থ সরস্বতী নদীর মজে যাওয়া প্রবাহপথ এবং পূর্ব পার্শ্বস্থ প্রায় লুপ্ত যমুনা নদী। এ কথা ঠিক যে এই অঞ্চলটি অনেকগুলি ব-দ্বীপ একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছে। এ কথা ঠিক যে এই অঞ্চলটি অনেকগুলি ব-দ্বীপ একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছে। তাই Spate মন্তব্য করেছেন যে 'the deltaie plain of Bengal has a double, on even a multiple origin; one shuld not say the delta, but rather the deltas'।

নদীতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী এখানকার নদীগোষ্ঠীকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। "The decayed west, scarred with silted or stagnant bhils the dissected members of dead rivers, and the active west. (Spate 1967)" ব-দ্বীপ উত্তরাংশের নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা/পদ্মা, ভাগীরথী-হুগলী, সিয়ালমারী ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, চূর্নী, গড়াই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে গঙ্গা-পদ্মা প্রধান নদী, ষোড়শ শতকে যখন চৈতন্যদেব তদান্তীন পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) তখন নদীটি এত চওড়া ছিল না। সেই সময় ভাগীরথী-হুগলী ছিল প্রধান নদী।

আমরা সবাই জানি যে গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হতে উত্তরাঞ্চল উত্তর প্রদেশ ও বিহারের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার ধূলিয়ানের কাছে গঙ্গা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। প্রধান শাখা পদ্মা নাম ধারণ করে বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের মধ্যে সীমা নির্দেশ করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। নদীটি তার গতিপথ বরাবর পরিবর্তন করেছে এবং এই কাজে মানুষের বহু কীর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। এ জন্য একে কীর্তিনাশা (Destroyer of all achievements) বলা হয়। পদ্মার বন্যায় হল বলে এর পাড়ে অসংখ্য অস্থায়ী কুঁড়েঘর দেখা যায়। গঙ্গার

বেশীরভাগ জল বাংলাদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে ভাগীরথীতে জল কম থাকে এবং এই কারণেই কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে গঙ্গার ওপর ফারাক্কা নামে একটি বিরাট বাঁধ দেওয়া হয়েছে। ঐ স্থানে একটি খাল (Bhagirathi Feeder canal) কেটে জঙ্গীপুরের কাছে গঙ্গার জল ভাগীরথীতে আনা হচ্ছে। ফরাক্কায় বাঁধ দেবার ফলে উত্তর বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ-বঙ্গের যোগাযোগ সহজসাধ্য হয়েছে।

ধূলিয়ানের কাছে বিভক্ত গঙ্গার অপর একটি শাখা ভাগীরথী নাম ধারণ করে সোজা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এর তীরে মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, বহরমপুর বেলডাঙ্গা, পলাশী প্রভৃতি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি রয়েছে। নবদ্বীপের কাছে গঙ্গার অপর এক শাখানদী জলঙ্গী পূর্ব দিক থেকে এসে ভাগীরথীতে মিলেছে। এর পর থেকে ভাগীরথীর নাম হয়েছে হুগলী। কলকাতা শহর হুগলীর তীরে অবস্থিত। ভাগীরথী-হুগলী নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ভাগীরথী-হুগলীর ডানতীরে পশ্চিম থেকে আগত ময়ুরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, হলদি এসে মিশেছে।

ভৈরব (ভয়ঙ্কর), শিয়ালমারী, জলঙ্গী প্রত্যেকটি পদ্মা থেকে বেরিয়েছে। উপরোক্ত সব কটি নদীতে বর্ষার কয়েকটি দিন ছাড়া পদ্মা দিয়ে জল ঢোকে না। সব কটি নদীতেই পলি জমে গেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে উৎস থেকে প্রায় 3 কি.মি. (নীচের দিকে) জলঙ্গীর গতিপথ শুকনো রয়েছে (Sen, 1988)। এই স্থান থেকে শিয়ালমারীর সাথে সঙ্গ মস্থল পর্যন্ত বিল ও মাটির নীচে থেকে চোঁয়ানো জল জলঙ্গীকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

উত্তরের ব-দ্বীপের উপর একটি শাখানদী হল মাথাভাঙ্গা (হাউলি)। জলঙ্গীর উৎস্থলের 16 কি.মি. নীচে পদ্মা থেকে এর উৎপত্তি। হাঁসখালির কাছে নদীটি দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটি শাখা (পশ্চিম) চুর্নী নাম নিয়ে হুগলীতে মিশেছে। অপরটি ইচ্ছামতী নামে 24 পরগনার মধ্য দিয়ে কালিন্দীতে (সুন্দরবনে) মিশেছে।

উত্তরের ব-দ্বীপের আর দুটি শাখানদী যমুনা ও পদ্মা (বিল)। প্রথমটি হুগলী নদী থেকে বেরিয়েছে ও শেষোক্ত নদীটির সহিত মিশেছে। পদ্মা (বিল) বলতে গেলে একদম মৃত নদী। কিন্তু এক সময় এই নদী দিয়ে প্রচুর বাণিজ্য চলত। এখন নদীগর্ভ খুঁড়লে বড় বড় দেশী নৌকার ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে।

● **জলবায়ু ঃ** গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বসতি তথা কৃষি অর্থনীতি আর্দ্রতা ও উষ্মতার মতন জলবায়ুর উপাদান দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। উপরোক্ত উপাদানগুলি এলাকার গৃহের ছাদ, শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। কর্কট ক্রান্তি রেখা কৃষ্ণনগর শহরের ($23^0 24'$ উঃ অঃ) ওপর দিয়ে গেছে। আবার দক্ষিণ দিকে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এই দুয়ের প্রভাব অঞ্চলটির জলবায়ুর ওপর প্রতিফলিত হয়। উত্তরে গ্রীষ্মকাল অসহ্য এবং শীতকাল শুষ্ক এবং মোটামুটি শীতল ও আরামদায়ক আর দক্ষিণের উপকূলভাগে সমভাবাপন্ন জলবায়ু অনুভূত হয়। মৌসুমী বায়ুর আগমনের আগে বৈশাখ (এপ্রিল-মে) মাসে কালবৈশাখীর (nor-wester) এবং দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রত্যাগমনের আগে আশ্বিন-কার্ত্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর) মাসে আশ্বিনের ঝড় বয়।

আবহাওয়া দপ্তরে মতে এখানে বাৎসরিক চারটি ঋতু আছে—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও শীত। গ্রীষ্মকাল মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার কাছে থাকায় এই সময় বায়ুমণ্ডলের উষ্মতা বাড়ে। সমুদ্র সান্নিধ্যের জনয সাগরদ্বীপের উষ্মতা কম, কিন্তু কৃষ্ণনগরের উষ্মতা বেশী। নীচের সারণি থেকে তা পরিষ্কার হবে।

গ্রীষ্মকালীন মাসিক গড় উষ্মতা (সেঃ)

স্টেশন	মার্চ	এপ্রিল	মে
কৃষ্ণনগর	30.65	31.1	30.25
সাগরদ্বীপ	28.9	29.7	29.55

জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষাকাল। সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে (সাগরদ্বীপ) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়ায় 190 সে.মি. আর বহরমপুরে প্রায় 125 সে.মি.।

অক্টোবর এবং নভেম্বর হল শরৎকাল। এই সময় প্রত্যাবর্তনকারী দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বয়। অনেক সময় গ্রীষ্মের দঃ পঃ মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ ও শীতের উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ফলে ঝড়-বৃষ্টি ও ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয় যা আশ্বিনের ঝড় নামে পরিচিত।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শীতকাল। এই সময় উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুপ্রবাহিত হয়। স্থলভাগের ওপর দিয়ে এই বায়ু প্রবাহিত হয় বলে তা শুষ্ক ও শীতল। সমুদ্র থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, উষ্ণতা ততই কমতে থাকে। নীচের সারণি থেকে তা পরিষ্কার হবে। কখনও কখনও পশ্চিম ঝঞ্ঝার দরুণ সামান্য বৃষ্টিপাত হয় যা রবিশস্যের উপকারে লাগে।

শীতকালীন মাসিক গড় উষ্ণতা (সেঃ)

স্টেশন	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী
কৃষ্ণনগর	23.45	19.75	18.95	21.65
সাগরদ্বীপ	24.1	20.35	20.4	22.85

● **মৃত্তিকা** ঃ এখানে নদীর আশেপাশে নবীন পলিমাটি দেখা যায় যা খুব মসৃণ ও উর্বর। এখানকার মাটি বেলে দোঁ-আঁশ। এখানকার মাটিতে ফসফরাস, কার্বন, পটাশের পরিমাণ এক এক জায়গার এক এক রকম, যা শস্য চাষে প্রভাব বিস্তার করে। উপকূলভাগে পলি ও সমুদ্রের জোয়ারের লবনাক্ত জলে একপ্রকার মৃত্তিকা গঠিত যা উপকূলীয় মৃত্তিকা নামে পরিচিত। এতে ক্যালসিয়াম ও ম্যঅগনেষিয়ামের ভাগ বেশী থাকে। এই মাটিতে লবনের ভাগ বেশী থাকে বলে চাষ ভালো হয় না। এখানে উল্লেখ্য যে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় এক ফসলের (ধান) চাষ হত। বর্ষার পর জমির লবনতা বৃষ্টির জলে ধুয়ে নীচে নেমে গেলে ধানের চাষ হত। এখন আমন ধান ছাড়াও রবি ফসলের চাষ হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জী যথা টমেটো, লঙ্কা, বাঁধা কপি, ফুল কপি, উচ্ছে ও লাউ ইত্যাদি। সেচের সুবিধার জনয বাড়ীর আশেপাশে পুকুর কাটা হয়েছে। এখান থেকে পামসেটের সাহায্যে পাম্প করে জমিতে জল দেওয়া হচ্ছে। তবে যেবার প্রবল বন্যায় নদীবাঁধ ভেসে যায়, সেবার জমিতে নোনা জল ঢুকে জমিকে সাময়িকভাবে অনুর্বর করে তোলে।

● **স্বাভাবিক উদ্ভিদ** ঃ সাধারণভাবে বসতি ও কৃষিকাজের বিস্তারের জন্য বনভূমি কেটে ফেলা হয়েছে। উত্তরের ব-দ্বীপ অঞ্চলের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রয়োজ্য। তাই Spate লিখেছেন "the countryside is in general far from treeless villages, semi-dispersed hamlets, or sparate homesteads earry their clumps of bamboo, the toddy-plam and the Indian date, banyans, pipal, tamarinds and mangoes" আর দক্ষিণে রয়েছে "the great tidal jungles of the Sunderbans"। সুন্দরি গাছ ছাড়াও গরান, গেঁওয়া, গর্জন, কেওড়া, হেঁতাল, গোল, বাইন, বেত গাছ এখানে জন্মে। এখানকার গাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, গাছগুলির কাণ্ড উঁচু উঁচু একাধিক শিকড়োর উপর দাঁড়িয়ে থাকে। গাছের ডাল থেকে অনেক ঝুরি নীচের দিকে নেমে আসে। সুন্দরী গাছের কাঠ আসবাবাপত্র, খেলনা, গরাণ কাঠ ঘরের খুঁটি, গরাণ ও গাঁওয়া কাঠের নৌকা, বাইন কাঠে নৌকার পাঠাতন, গরাণ ও হেঁতাল কাঠে টালির ঘরের কড়ি ও বরগা, হোগলাপাতা ঘর ছাওয়াতে (বেড়া ও চাটাই) কাজে লাগে। কেয়া, গরাণ, খলসী গাছে মৌমাছি মৌচাক বাঁধে যা থেকে মধু ও মোম পাওয়া যায়। শোলা এখানকার জলজ উদ্ভিদ। খেজুর ও তালের রস থেকে গুড় তৈরী হয়, যার খ্যাতি সুবিদিত।

● **কৃষিকাজ ঃ** এখানকার জলবায়ু ও মৃত্তিকা কৃষিকাজের উপযোগী। খাদ্য ফসলের মধ্যে ধান আর তন্তু ফসলের মধ্যে পাট প্রধান। এখানকার বনভূমি অঞ্চল (সুন্দরবন) ছাড়া সর্বত্রই চাষবাস হয়। 2/3 ভাগের বেশী

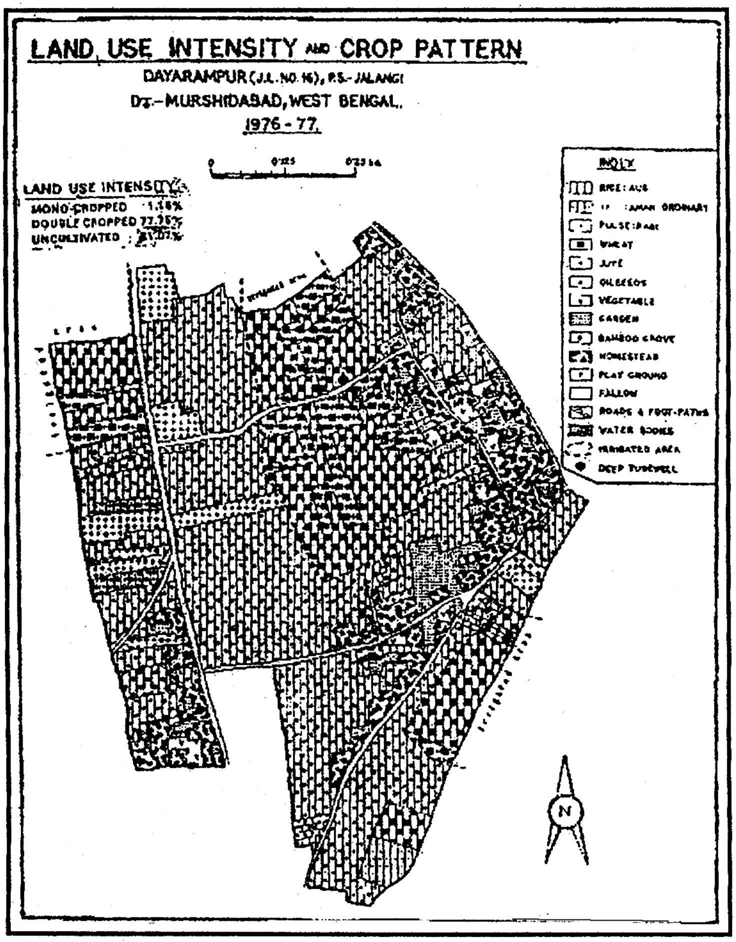

চিত্র 3.82 ঃ ব-দ্বীপের উত্তরাংশের জমির ব্যবহার

জমিতে ধান চাষ হয়। ঋতুর ওপর নির্ভর করে তিনপ্রকার ধান চাষ হয়, যথা আউস, আমন ও বোরো। নীচের সারণীতে বিভিন্ন প্রকার ধানের বপন ও কাটার সময় দেখানো হল—

ধানচাষের মরশুম

ধান	ফসলের ঋতু	রোপনের সময়	কাটার সময়
আউস	ভাদই	মে-জুন	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
আমন	আঘাণি	জুন-জুলাই	নভেম্বর-ডিসেম্বর
বোরো	রবি(জেড)	নভেম্বর-ডিসেম্বর	মার্চ-এপ্রিল

উপরোক্ত তিন প্রকার ধানের মধ্যে আমন ও বোরো ধান বেশী জনপ্রিয়। ইদানীং বোরো চাষের দিকে চাষীরা বেশী করে ঝুঁকেছেন। কারণ এই ধানের ফলন সর্বাধিক। তবে এই ধানের জল লাগে বেশী। তাই সব জায়গায় বোরো ধানের চাষ সম্ভব নয়, বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায়। আউস ধান চাষের পক্ষে মুর্শিদাবাদ (পূর্ব), নদীয়া এবং উত্তর 24 পরগণার মৃত্তিকা (বেলে দোঁয়াশ) ও কালবৈশাখীর বৃষ্টি বিশেষ উপযোগী কিন্তু উৎপাদন কম হওয়ায় এবং আউস ধানের চাল মোটা হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা কমে গেছে। বলা যেতে পারে এর চাষ দেশ থেকে প্রায় উঠেই গেছে। ইদানীং আউসের চেয়ে সব্জী চাষ লাভজনক। তাছাড়া স্থানীয় আউস ধানে পোকা লাগে বেশী। তাই আমন ধানের দিকে মানুষ বেশী ঝুঁকেছেন। স্বাধীনতার পর ভালো পাট চাষের উর্বর জমিগুলি পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) চলে যাওয়ায় এদেশে (মুর্শিদাবাদ পূর্ব, নদীয়া, উত্তর 24-পরগণা) পাট চাষ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু ইদানীং দাম না পাওয়ায় চাষীরা পাট চাষে আর উৎসাহ পাচ্ছেন না। তাই হয় জমিকে ফেলে (fallow) রাখা হচ্ছে নয়তো সব্জীর চাষ হচ্ছে।

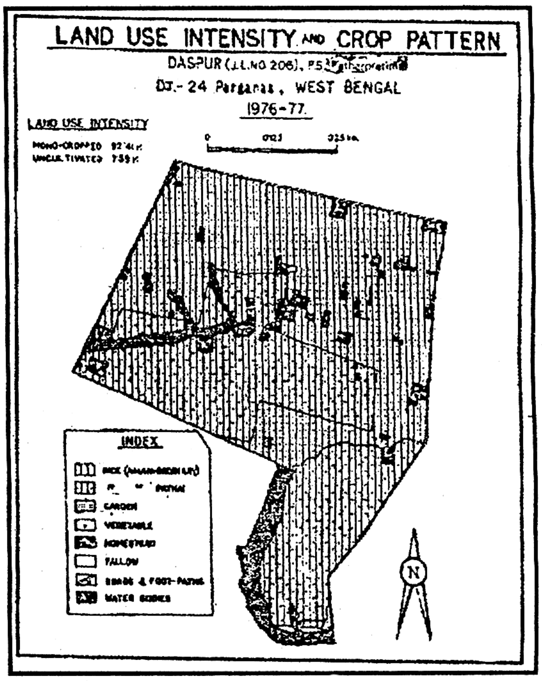

চিত্র 3.83 ঃ ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশের জমির ব্যবহার

ব-দ্বীপ অঞ্চলে নানা প্রকার ডাল উৎপন্ন হয়। পদ্মার চরে এখন কলাই ডাল চাষ হয়। এখানে কলাই ফলে ও প্রচুর। অড়হর (ডাল) গাছ জমির উর্বরতা নষ্ট করে দেয় ঠিকই, কিন্তু এ দিয়ে (অরহড়) জমিতে বেড়াও দেওয়া হয়। গাছ কাটা হয়ে গেলে তা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার ডালও পাওয়া যায়। মুগের চাষ কম হয়। ছোলার চাষ হয় বেশী।

এককালে বেলডাঙ্গা ও পলাশীতে চিনি কলের উপস্থিতির দরুণ এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে আখ চাষ হত। এখন অবশ্য "গুড়" তৈরীতে আখের ব্যবহার হয়। এবং অনেক জায়গাতেই কিছু না কিছু আখ চাষ হয়।

মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ব্যাপকভাবে সরিষা ও রাই জন্মায়। 1960-র দশক থেকেই মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তর 24 পরগণায় ব্যাপকভাবে গবের চাষ শুরু হয়েছে। রবি ফসল হিসেবে এটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছে।

তুঁত চাষ মুর্শিদাবাদে (পূর্ব) বেশ জনপ্রিয়। 24 পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ) বিভিন্ন প্রকার ফল উৎপাদন করে ও কলকাতার বাজারে চালান দেয়। দঃ 24 বরগণার বারুইপুর পিয়ারার জন্য বিখ্যাত। সাগরদ্বীপ এলাকায় প্রচুর তরমুজ চাষ হয়। মুর্শিদাবাদ আমের জন্য প্রসিদ্ধ।

● **শিল্প ঃ** গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল শিল্পসমৃদ্ধ। পৃথিবীর অন্যতম শিল্পাঞ্চল (হুগলী) এই অঞ্চলে অবস্থিত। কাঁচামালের সহজলভ্যতা, শক্তি সরবরাহ, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা এবং দক্ষ শ্রমিকের যোগান এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করেছে। তাই শিল্প বিকাশের দিক দিয়ে এই অঞ্চলকে তিনভাগে ভাগ করা যায় (a) উত্তরের কুটির শিল্প এলাকা, (b) কলকাতার আশেপাশে গড়ে ওঠা হুগলী শিল্পাঞ্চল এবং (c) শিল্প হীন সুন্দরবন এলাকা।

● (a) **উত্তরের কুটির শিল্পাঞ্চল ঃ** এখানকার কাশিমবাজার (কাপড়ের কল), বেলডাঙ্গা (চিনির কল), কল্যানী

(স্পিনিং মিল, সাইকেল কারখানা) এবং হাবড়া ছাড়া বড় আকারের কোন শিল্প নেই। পূর্বে পলাশীতে একটি চিনির কল থাকলেও তা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এখানকার অধিকাংশ শিল্প কৃষি-ভিত্তিক শিল্প এবং যেহেতু এটি কৃষি প্রধান এলাকা, তাই এখানে ভবিষ্যতে আরো কৃষি-ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের মধ্যে রয়েছে পাগলাচণ্ডী, নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদ শহরের কাচে অবস্থিত মিনি চিনি কল। এ থেকে চিনি ও খান্দাসারী চিনি প্রস্তুত হয়। এই এলাকা গুড় উৎপাদনে খ্যাতিলাভ করেছে। বেশীরভাগ গুড় উৎপাদন কেন্দ্র বহরমপুর বেলডাঙ্গা, হাঁসখালি এবং কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকায় রয়েছে। রেশমের শাড়ী উসলামপুর চক (রাণীনগর থানা), মির্জাপুর গণকরে (রঘুনাথগঞ্জ থানা) এবং চটের দড়ি উৎপাদন কেন্দ্র বেলডাঙ্গায় রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ শিল্ক-এর খ্যাতি শুধু বাংলার নয়, ভরতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইসলামপুর তসর ও মটকা, মির্জাপর গরদ এবং জিয়াগঞ্জ বালুচরি-বুটিদার শাড়ী এবং চেলি-র জন্য বিখ্যাত। আজ অবশ্য শিল্পের অবস্থা স্বাধীনতার সময়ের তুলনায় অনেকটা ভালো। খড়ের মোড়ক কেন্দ্র ফুলিয়া (নদীয়া)-য় অবস্থিত। বিড়ি শিল্পের সংখ্যা অগুনতি এবং সারা এলাকা জুড়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিড়ি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হল ঔরঙ্গাবাদ (নিমতিতা)। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর, বগুলাতে বিড়ির কারখানা আছে। কালীগঞ্জে শোলার জিনিস (টুপি, মুকুট) তৈরী হয়।

কম্বল ও পৃথিবী-বিখ্যাত হাতী দাঁতের কাজ আজ বিলুপ্তির পথে। কাঁসা শিল্প কিছুটা জীবিত হলে ও আজ আবার তা ধুঁকছে। খাগড়া, সৈদাবাদ (বহরমপুর)-এ। এই শিল্প এখন ও টিকে আছে। তবে কুটীর শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে উন্নতি লাভ করেছে তাঁতের শাড়ী। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলা থেকে বহু তাঁতী এখানে এসে এই শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে ও তাঁতের শাড়ী প্রস্তুত হয়। অন্যান্য কুটীর শিল্পের মধ্যে ঘুর্নী (কৃষ্ণনগর), জঙ্গীপুর, জোতকমল (রঘুনাথগঞ্জ থানা) এবং দৌলতাবাদের (বহরমপুর) মাটির কাজের কথা উল্লেখ করতে হয়। করিমপুরে বালিডাঙ্গা এবং ডোমকল থানার জঙ্গীপুর এবং লক্ষ্মীকান্তপুর-এ শাঁখার কাজ হয়।

● (b) **হুগলী শিল্পাঞ্চল ঃ** ভারতের অন্যতম শিল্পাঞ্চল। উহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পাট-শিল্পাঞ্চল এবং ভারতের অন্যতম ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পাঞ্চল। পাট শিল্প ব্যতীত যে সকল শিল্প এই অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে, তাদের মধ্যে কার্পাস বয়ন, হোসিয়ারী, পোশাক, চর্ম, ধাতুদ্রব্য, পূর্ত, বৈদ্যুতিক পাখা, সেলাই মেসিন, রাসায়নিক দ্রব্য, রবার, মোটর গাড়ি নির্মাণ, মুদ্রনশিল্প, খাদ্যদ্রব্য, শিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি প্রধান।

এই অঞ্চলে পৃথিবীর বৃহত্তম পাটশিল্পের সমাবেশ ঘটেছে। বর্তমানে হুগলী নদীর উভয় তীরে 54টি পাটকল আছে। নৈহাটী, জগদ্দল, হালিসহর, টিটাগড়, খড়দহ, উত্তরপাড়া, কামার হাটি, বজবজ প্রভৃতি স্থানে পাটশিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটেছে।

1818 সালে কলকাতার নিকটবর্তী ঘুষড়ি নামক স্থানে ভারতের প্রথম আধুনিক কার্পাস বয়ন শিল্প স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে কার্পাস বয়ন মিলগুলি হুগলী শিল্পাঞ্চলেই গড়ে ওঠে। শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, সালকিয়া, বেলঘরিয়া, সোদপুর প্রভৃতি স্থানে কার্পাস বয়ন মিলগুলি বিদ্যমান। অন্যান্য যে সকল শিল্প এই অঞ্চলে প্রসার লাভ করছে তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম তাদের অবস্থানসহ নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

শিল্পের নাম	স্থানের নাম
কাগজ শিল্প	টিটাগড়, ত্রিবেণী, নৈহাটি, হালিসহর, আলমবাজার।
বন্দুক শিল্প	ইছাপুর, কাশীপুর।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	হাওড়া, বেলঘরিয়া, দমদম, যাদবপুর, শ্রীরামপুর, কল্যাণী, বেহালা, ক্ষিদিরপুর, টালিগঞ্জ, গার্ডেনরীচ সহ কলকাতা।
বস্ত্রবয়ন শিল্প	সোদপুর, বেলঘরিয়া
জুতাশিল্প	বাটানগর
টায়ার শিল্প	সাহাগঞ্জ, বল্যানী।
মোটর গাড়ি	হিন্দমোটর
জাহাজ শিল্প	গার্ডেনরীচ
রেল ওয়াগন	দমদম
ইলেকট্রনিক	সল্টলেক

● (c) **সুন্দরবন অঞ্চল ঃ** এই অঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। এর কারণ হল এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব উন্নত নয়। তবে ইদানীংকালে যেমন এখানে শিল্পের প্রসার ঘটছে, তেমনি এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। বাসন্তীর কাছে নদীর ওপর একটি সেতুর কাজ শীঘ্রই শেষ হবে। এতে করে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সুগম হবে। এখন কয়েকঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা থেকে সরাসরি বকখালি পৌঁছানো যাচ্ছে। আবার গঙ্গাসাগর ও কলকাতার মধ্যে পৌঁছানো যাচ্ছে। তাই দুর্গমতা এখন আর নেই। তাই এখন আর কেউ বলবেন না—

"সব তীর্থ বার বার
গঙ্গাসাগর এক বার"

বস্তুতপক্ষে এই কারণেই এই অঞ্চলে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সুন্দরমন অঞ্চলে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদুৎ উৎপাদন হচ্ছে। এখানে জোয়ার ভাঁটা শক্তি, বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এখানকার অন্যতম শিল্প হল মৎস্য সংক্রান্ত (fish processing) শিল্প। এটি নামখানাতে অবস্থিত। বস্তুতপক্ষে, নামখানা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ মৎস্য বন্দর। এখানে মাছ ধরা হয়। শুকানো হয় ও বাইরে পাঠানো হয়। এখান থেকে ধান, ডাল অন্য জেলাতে পাঠানো হয়। এ দিয়ে কৃষি-ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠতে পারে। সম্ভাবনা আছে পাউরুটি তৈরীর কারখানার।

● **পরিবহন ঃ** কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পরিবহন ব্যবস্থার দিক দিয়ে সমভূমি খুবই ভাগ্যবান। রাজধানী শহরের (সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ, ভারতের পূর্বতন রাজধানী এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা) উপস্থিতি, সুনাব্য নদীপথ, উর্বর সমভূমি, বিপুল সংখ্যক জনতার বসবাস, রেলপথের সদর দপ্তর, বিভিন্ন পরিবহন সংস্থার সদর দপ্তর এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র শওয়ায় এই অঞ্চল পরিবহন ব্যবস্থার দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নত। এখানে জল, সড়ক, রেল ও বিমান অর্থাৎ সব প্রকার পরিবহন ব্যবস্থাই উন্নতি লাভ করেছে।

● **সড়ক পরিবহন ঃ** এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে দুটি জাতীয় সড়কপথ (National Highway or N.H.)

গেছে। সেগুলি হল N.H. 34 (কলকাতা—বারাসাত—বহরমপুর—ডালখোলা) এবং N.H. 35 (বারাসাত—বনগাঁ)। এখানকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক হল V.I.P. রোড, বি. টি. (Barrackpur Trunk) রোড, বনগাঁ—বাগদা—বয়ড়া রোড, দক্ষিণ 24 পরগণার মথুরাপুর—ঘোড়াদল রোড, জয়নগর থানায় শ্রীরামপুর রোড, মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর—করিমপুর, কৃষ্ণনগর—করিমপুর ইত্যাদি। এছাড়া দ্রুত পরিবহনের জন্য এক্সপ্রেস হাইওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। যেমন ইষ্টার্ণ মেট্রোপলিটন বাইপাস।

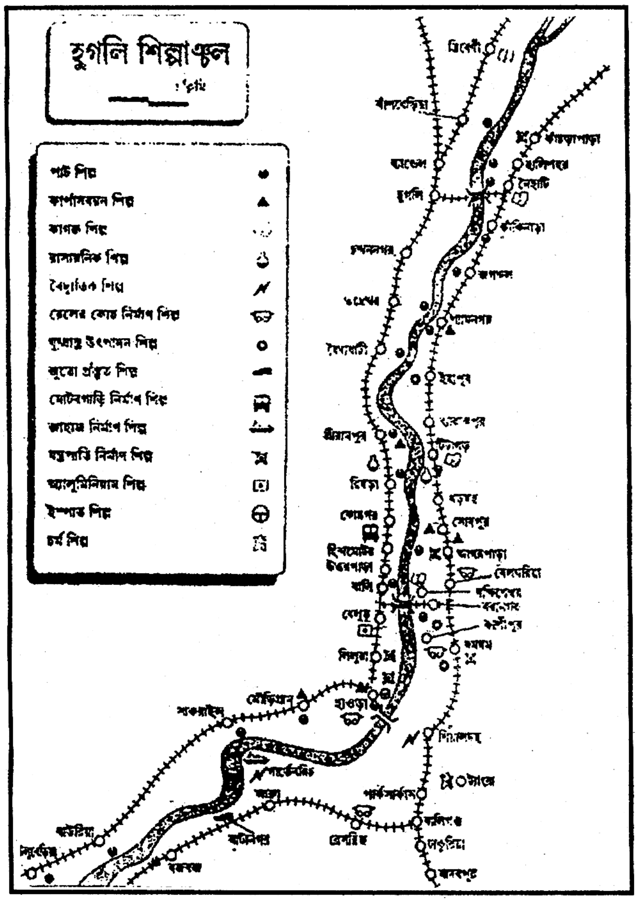

চিত্র 3.84 ঃ হুগলী শিল্পাঞ্চল

● **রেলপথ ঃ** এ অঞ্চলটি পূর্ব রেলপথ দ্বারা পরিবেষ্টিত। শিয়ালদহ হল এই এলাকার রেলপথের বিভাগীয় (Divisional) দপ্তর। এখান থেকে ব-দ্বীপের বিভিন্ন অংশে রেলপথ প্রসারিত হয়েছে। যেমন শিয়ালদহ ডানকুনি হয়ে প্রধান সড়কপথ একদিকে পশ্চিমদিকে দিল্লী এবং উত্তরদিকে শিলিগুড়ি হয়ে আসামের দিকে গিয়েছে। আর রেলপথগুলির মধ্যে অন্যতম হল শিয়ালদহ-লালগোলা শাখা। এছাড়া রাণাঘাট, গেদে, শিয়ালদহ—বারাসাত—বনগাঁ শাখা, বারাসাত—হাসনাবাদ শাখা, শিয়ালদহ—ডায়মণ্ডহারবার, শিয়ালদহ—ক্যানিং, শিয়ালদহ—কাকদ্বীপ—নামখানা উল্লেখযোগ্য। এই সব পথে যাত্রী ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার পন্য (খাদ্যশস্য, শাকসব্জী, দুগ্ধ, ছানা) পরিবাহিত হয়।

● **নদীপথ ঃ** হুগলী শুধু এই অঞ্চলের নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান, নদীপথ। এর তীরেই দাঁড়িয়ে আছে কলকাতা বন্দর। কলকাতা গোটা পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার তথা বাণিজ্যকেন্দ্র। এক সময় যে হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে কলকাতা বন্দর গড়ে উঠেছিল তার এখন মুমূর্ষ অবস্থা । ফারাক্কা বাঁধ রূপায়িত হলেও এর (বন্দর) অবস্থার খুব একটা ইতর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

ব-দ্বীপ অঞ্চলের উত্তরাংশের নদীগুলোর মধ্যে চূর্ণী নদী দিয়েই বর্ষার সময় নৌচলাচল করে। জলঙ্গী নদী দিয়ে স্থানীয় ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চলে। ইচ্ছামতী নদীতে সারা বছরই নৌ-চলাচল করে। বসিরহাট ও হাসনাবাদ অঞ্চলে সাথে সুন্দরবন এলাকার এই নদীপথে বাণিজ্য চলে। সুন্দরবনের নদীপথে বাণিজ্যচলে ছোট, বড় লঞ্চে ও মোটরচালিত নৌকায়। শুধু স্থানীয়ভাবেই নয়, অন্ত-জেলার, এবং বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যও চলে নদীপথে। যেমন—নামখানা নদীবন্দর থেকে বাংলাদেশে বড় বড় লঞ্চ, জাহাজে করে বাণিজ্য চলে।

● **খালপথ ঃ** সারকুলার (circular) খাল, বেলেঘাটা খাল, নিউ-কা খাল প্রভৃতি কলকাতা বন্দরের মাল আমদানি ও রপ্তানিতে ব্যবহৃত হয়।

কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খাল—চারটি খাল কলকাতার আশেপাশে রয়েছে, যথা— (1) নিউ কাট খাল

থেকে ভাঙ্গরকাটা খাল 16 কি.মি. লম্বা, (2) কুলটি লক থেকে কেষ্টপুর খাল, 11 কি.মি. লম্বা (3) বকষি ও গাইঘাটার মধ্যে 10 কি.মি. লম্বা বক্‌সি— গাইঘাটা খাল, (4) ডায়মণ্ডহারবার ও কগরাহাট রেলপথের সমান্তরালে প্রবাহিত 19 কি.মি. লম্বা উস্তি-নৈণ্যর খাল।

● **বিমানপথ ঃ** এই অঞ্চলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (পূর্বতন নাম কলকাতা বিমানবন্দর) রয়েছে। এখান থেকে ভারতের বিভিন্ন শহরের সাথে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যায়। সরকারী ছাড়া ও বেসরকারী সংস্থার বিমান এখান থেকে ছাড়ে। দেশের যে সব জায়গায় ভূ-প্রকৃতি বিমান পরিবহন ব্যবস্তার অনুকূল নয়, সে সব স্থানে বায়ুদূত বিমান চলাচল করে।

● **জনসংখ্যা ঃ** ব-দ্বীপের পরিবেশ এখানকার জনসংখ্যাও জনবসতির ওপর প্রভাব ফেলেছে। ব-দ্বীপের দুই অংশে জনসংখ্যার বিস্তারে এই প্রভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। ব-দ্বীপের উত্তর অংশ মৃতপ্রায় ব-দ্বীপের অন্তর্গত। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে প্রায় প্রতিটি থানা এলাকার জনবৃদ্ধি ছিল নেতিবেচক। এর কারণ ছিল "devastating malarial fever, emigration of population from this decadent area" (Sen, and Sen, 1989)" নদীগুলিতে ক্রমশ পলি জমে যাওয়ায় এখানকার মাটি অনুর্বর হয়ে পড়েছিল। 1891-র জনগণনায় এখানকার জনবসতির এক সুন্দর চিত্র আঁকা হয়েছে "Almost all the older settlements bear unmistakable signs of decay-rank vegetation, ruined houses, dried-up tanks and abandoned homesteads"। অবশ্য যে সব এলাকায় নদী সক্রিয়, সেখানে জলবৃদ্ধি ঘটেছিল। যেমন পদ্মাতীরে অবস্থিত লালগোলা, ভগবানগোলা, এবং রাণীনগর। এই সব এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রার্দুভাব কম ছিল।

পক্ষান্তরে সক্রিয় ব-দ্বীপ এলাকায় জনবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। গত একশ বছরের বেশী সময় ধরে গোসাবা, বাসন্তী থানা এলাকায় অনেক স্থানে মেদিনীপুর জেলা থেকে লোকসমাগম ঘটেছে। এঁরা বনজঙ্গল পরিস্কার করে বসতি স্থাপন করেছেন, আবাদ বানিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর অবশ্য অবস্থাটা পাল্টে গেছে। ব-দ্বীপের উত্তরাংশে জলা জঙ্গল পরিস্কার করে, ডি.ডি.টি. ছিটিয়ে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে এবং সেই সঙ্গে জনবৃদ্ধি ঘটেছে ও এই এলাকার প্রায় সর্বত্র একই প্রকার জনঘনত্ব লক্ষ করা যায়। জনঘনত্বের বিচারে এই অঞ্চলকে তিনভাগে ভাগ করা যায়— (a) কলকাতা ও হুগলী শিল্পাঞ্চল যেখানে জনঘনত্ব অত্যাধিক। যেমন কলকাতা জনঘনত্ব (2001 সাল) হল 24,760 (প্রতি বর্গ কি.মি.) পশ্চিমবঙ্গের গড় 2001 সন, 903 জন)। ভারতবর্ষের 10টি সর্ব্বোচ্চ জনসংখ্যার জেলার দুটিই এখানে অবস্থিত। উত্তর 24 পরগণা (প্রথম স্থানে রয়েছে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা)-র জনসংখ্যা (2001) ছিল 8,930,295 এবং দক্ষিণ 24 পরগণার ছিল 6,919,698 জন। পশ্চিমবঙ্গের (80, 176, 197 জন) 19.77 শতাংশ লোক এই দুই জেলাতেই বাস করে (2001 লোকগণনা)।

(a) কলকাতা (4,580,544–2001 সাল) পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, ভারতের অন্যতম জনবহুল শহর (গ্রেটার মুম্বাই ও দিল্লীর পর), একটি প্রধান বন্দর এবং পূর্ব-ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। আমরা জানি অর্থনৈতিক কাজকর্মের আকর্ষণই ঘন জনবসতির অন্যতম কারণ। এই কারণেই কলকাতা শহরে যেমন জনঘনত্ব বেশী তেমনি হুগলী শিল্পাঞ্চলেও। কলকাতা শহরের ভেতরে আর বসবাসের স্থান নেই। তাই সল্ট লেক, বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, বাঁশদ্রোণী ইত্যাদি নতুন নতুন উপনগরীর সৃষ্টি হয়ে চলেছে। (b) দ্বিতীয় ঘন বসতিযুক্ত অঞ্চল হল উত্তরের ব-দ্বীপ অঞ্চল। এটি প্রধানত কৃষি প্রধান অঞ্চল। আবার এর মধ্যেও স্থানীয়ভাবে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন বেলডাঙ্গা ও গাইঘাটা থানা এলাকা। এটি কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল। এটি প্রধানত কৃষি প্রান অঞ্চল। আবার এর মধ্যেও স্থানীয়ভাবে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন বেলডাঙ্গা ও গাইঘাটা থানা এলাকা। এটি কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল। আবার রঘুনাথগঞ্জ, চাকদাহ, হরিণঘাটা, হাবরা, কল্যাণীতে ঘনবসতির পেছনে অন্য কারণ রয়েছে।

রঘুনাগঞ্জের কৃষি ছাড়াও বিড়ি, লুঙ্গি, গামছা ইত্যাদি শিল্পের প্রভাব উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া এখানে ভাগীরথীর দুই তীরে দুটি শহর আছে—জঙ্গীপুর (মহকুমা শহর) ও রঘুনাথগঞ্জ। চাকদহে ও কয়েকটি মাঝারি আয়তন শিল্প (কার্ড বোর্ড) রয়েছে। এটি একটি দ্রুত বিকাশশীল শহর। হরিণঘাটায় ডেয়ারী ফার্ম রয়েছে। কল্যাণীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কল্যাণী শহরটি পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ড. বিধান চন্দ্র রায়ের চিন্তাপ্রসূত। কলকাতা শহরের ওপরের ওপরের থেকে চাপ কমানোর জন্য এই উপনগরীর সৃষ্টি হয়েছিল।

(c) এখানকার তৃতীয় বসতি অঞ্চলটি দক্ষিণ 24 পরগণাকে ঘিরে। আমরা জানি হুগলী শিল্পাঞ্চলটি উত্তরে কল্যাণী থেকে দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত বিস্তৃত (হুগলী নদীর ধার দিয়ে)। বজবজের পূর্বে ক্যানিং বারুইপুর (জয়নগর-মজিলপুর), দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার কাকদ্বীপ প্রভৃতি প্রাচীন শহর। জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভা পশ্চিমবঙ্গের এক প্রাচীন পৌরসভা। বারুইপুর, ডায়মণ্ডহারবার ইত্যাদি মহকুমা শহর ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার জন্য এইসব স্থানে লোকবসতি ঘন।

এরপর সুন্দরবনের কথায় আসা যাক। সুন্দরবনের যে সব জায়গায় যোগাযোগ উন্নত সেখানে লোকবসতি ঘন, যেমন নামখানা (মৎস্য বন্দর), বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ ইত্যাদি। আবার পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, বাসন্তী থানা এলাকা নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন এখানে জনঘনত্ব কম (প্রতি বর্গ কি.মি. 400-র কম)। পূর্ব ও দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অরণ্যাবৃত। বন বিভাগের কিছু বিট অফিস ছাড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল জনশূন্য।

● **সারসংক্ষেপ ঃ** এতক্ষণ আমরা এক বিশেষ প্রাকৃতিক অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করলাম যেখানে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে দুই বিপরীত অবস্থা চলছিল। মানুষের আন্তরিক প্রয়াস এবং সরকারী সহযোগিতা কিভাবে একটা এলাকার সামাজিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টিয়ে দিতে পারে তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হল পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এক মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ম্যালেরিয়ার কারণে এখান থেকে মানুষজন চলে গিয়েছিলেন। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু কৃষিজীবিরা জমিতে সোনা ফলালেন। তাদের কল্যাণেই পাট চাষ শুরু হল। গম চাষে এ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। তবে এক সময়কার সোনার ফসল পাটের চাহিদা পড়ে যাওয়ায় চাষীরা অন্য চাষে ঝুঁকেছেন।

অন্যদিকে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে গত 100 বছরের ও বেশী সময় ধরে লোকজন বসতি স্থাপন করে চলেছেন। তখনকার দিনে জমিতে এক ফসলী চাষ (ধান) হত, তাও আবার বর্ষার পর যখন লবণ ধুয়ে মাটির নীচে চলে যেত। আজ জলাশয় এবত পাম্পসেটের দৌলতে জমিতে দুবার করে ফসল হচ্ছে। নগণ্য হলেও বোরো ধানের চাষ হচ্ছে। তুলো চাষ একদিন জনপ্রিয় হবেই। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং শিক্ষার বিস্তার নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

তবে হুগলী শিল্পাঞ্চলে পাট, বয়ন, কাগজ শিল্পের দুরাবস্থা আমাদের ভাবায় বৈ কি! অনেকগুলি পাটকল, কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে গেছে। বন্দ হয়ে গেছে বেশ কিছু নামীদামী শিল্প (কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরী, সুলেখা ওয়াকর্স, উষা কোম্পানী ইত্যাদি)। তবে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার শিল্পায়নের দিকে ঝুঁকেছে। এরকম এক নতুন শিল্প হল I.T. বা ইনফরমেশন টেকনোলজী শিল্প। আমাদের দেশে অনেক মানুষ গ্রামে বাস করেন, তাই গ্রামীণ শিল্পের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ফ্লাইওভার, ব্রীজ, নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলকে পুনরায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঞ্চলে রূপান্তরিত করবে।

3.3.2 ছোটনাগপুর মালভূমি (Chotanagpur Plateau)

ছোটনাগপুর মালভূমি বলতে পূর্বতন দক্ষিণ বিহারকে (ঝাড়খণ্ড) বোঝায় (গঙ্গানদীর দক্ষিণাংশ)। এর আয়তন 86,239 বর্গ কি.মি.। এর অক্ষাংশগত বিস্তার হল 22^0 উঃ অঃ থেকে $25^0 50'$ উঃ অঃ এবং দ্রাঘিমাগত বিস্তার হল $83^0 47'$ পূ. দ্রা. থেকে $87^0 50'$ পূঃ দ্রাঃ পর্যন্ত। বর্তমানে এই মালভূমি ঝাড়খণ্ডের রাঁচী, হাজারিবাগ, সিংভূম, ধানবাদ, পালামৌ, সাঁওতাল পরগণা এবং পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি বলে ধরা যায়, যদিও এর সঠিক সীমারেখা চিহ্নিতকরণ নিয়ে ভূমিরূপবিদ্‌দের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

● **ভূতত্ত্ব** ঃ এই মালভূমিটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত, ছোটনাগপুর মালভূমি ও কাইমুর মালভূমি। ছোটনাগপুর মালভূমির অধিকাংশই প্রি-ক্রাম্বিয়ান যুগের গ্রাণাইট ও নীস পাথরের তৈরী। একে উত্তর ও দক্ষিণে ঘিরে আছে ধারওয়ার যুগের শিলা। মালভূমির মধ্যাংশে রয়েছে দামোদর উপত্যকার অববাহিকা। এই অংশের আদি শিলা হল তালচের সিরিজের বেলেপাথর এবং কিছু শেল ও কাদাপাথর। ছোটনাগপুর মালভূমির উত্তর পূর্ব এবং পূর্ব দিকে রয়েছে যথাক্রমে রাজমহল ও দলমা পাহাড়।

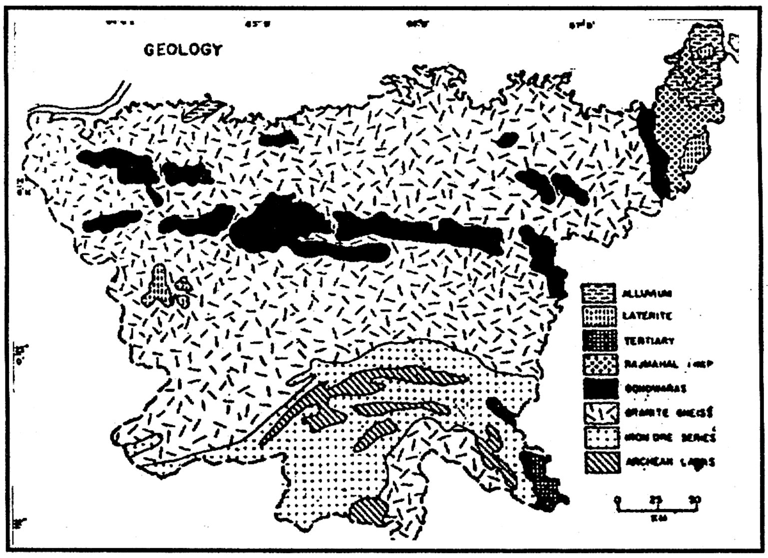

চিত্র 3.85 ঃ ছোটনাগপুর ভূতত্ত্ব

কাইমুর টেবিলল্যান্ড বিন্ধ্যযুগের শিলা দিয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে বেলেপাথর, শেল এবং চুনাপাথর।

উপরোক্ত ভূগঠন থেকে ছোটনাগপুর মালভূমির জটিল ভূতাত্ত্বিক গঠনের কথা আমাদে মনে আসা স্বাভাবিক। William Kirk নিম্নোক্ত ছত্রে খুব সুন্দরভাবে এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সুদীর্ঘকাল ধরে ক্ষয়ের ফলে প্রি-ক্যাম্বিয়ান যুগের গ্রাণাইট ও নীস শিলায় সৃষ্টি ভূমিভাগের ক্ষয়, এরপর আপার কারবোনিফেরাস যুগের বরফাচ্ছাদন, পার্মিয়ান যুগে চ্যুতির ফলে দামোদর উপত্যকার মতন একটি মুখ্য অবনমিত অঞ্চলের সৃষ্টি এবং ঐ স্থানের স্বাদু জলের হ্রদে গণ্ডোয়ানা যুগের শিলার সঞ্চয়। টিরাসিক যুগের উষ্ম মরু জলবায়ুতে ভূমিভাগের উত্থান, এবং প্রায় $5000'$ উচ্চতাসম্পন্ন গাণ্ডোয়ানা পলির অপসারণ ও মহাদেব সিরিজের বেলেপাথরের সঞ্চয়; জুরাসিক যুগে অগ্ন্যুৎপাত এবং টার্সিয়ারী যুগে ভূ-আলোড়নের ফলে শিলায় ফাটল ও বিচ্ছন্নীকরণ। ভূ-তাত্ত্বিক নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ক্রেটাসিয়াস যুগের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষয় এবং টার্সিয়ারী যুগের ভূ-উন্নয়ন।

ছোটনাগপুর মালভূমিতে টার্সিয়ারী যুগের ভূ-আলোড়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল—

❑ (ক) টার্সিয়ারী যুগের প্রথম দিককার সমপ্রায়ভূমির প্রায় 300 মিটার উত্থান এবং তার উত্তরপূর্বে কাত হয়ে পড়া।

❑ (খ) মধ্য ও বিলম্বিত টার্সিয়ারী যুগে পুনরায় 300 মিটার উত্থান

❑ (গ) এরপর দীর্ঘ বিরতির পর সমপ্রায়ভূমির গঠন এবং ঐ সমভূমির পুনরায় 100 মিটার উত্থান।

● **ভূপ্রকৃতি** ঃ ছোটনাগপুরকে পর পর কয়েকটি মালভূমির সমাহর রচনা বলে। এইসব মালভূমির বিভিন্ন উচ্চতা এবং সর্ব্বোচ্চ উচ্চতা হল 1100 মিটার (চিত্র 3.86)। এটি মধ্য-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। একে 'পাট' দেশ বলে। এখান থেকে ধাপে ধাপে ভূমিভাগ বিভিন্ন দিকে নেমে গেছে। আর পূর্বদিক তা নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিতে মিশেছে। বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত মালভূমিগুলি খাড়া ভৃগুতট (Scarp) দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। নদীগুলি যখন খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে আসছে, তখন তারা জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। সুবর্ণরেখা নদী ওপর সৃষ্ট হুড্রু, যোগ এই

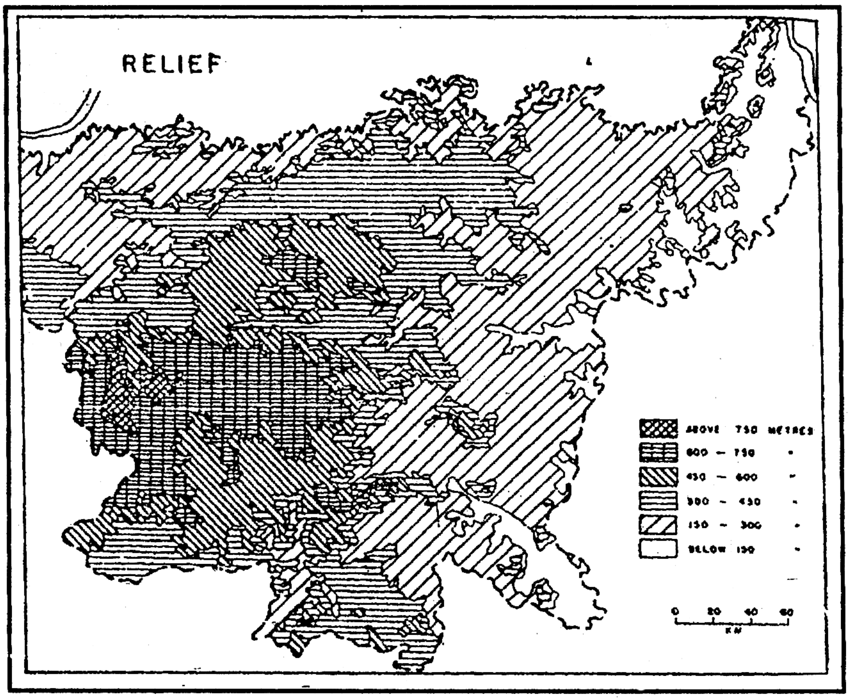

চিত্র 3.86 ঃ ছোটনাগপুর ঃ ভূপ্রকৃতি

রকম ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রাঁচী মালভূমি থেকে চাইবাসা সমভূমি পর্যন্ত ছোটনাগপুরের ভূভাগ ধাপে ধাপে নেমে গেছে। আমরা আগেই বলেছি এই ভূভাগ টার্সিয়ারী যুগে কতবার উত্থিত হয়েছে। অবশ্য কতবার এই উত্থান ঘটেছে, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। ভৌগোলিক S.P. Chatterjee-র মতে ভূ-উত্থান ও ক্ষয়ীভবনের ফলে চারটি সমপ্রায় ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে, ভূতত্ত্ববিদ J. A. Dunn তিনটি সমপ্রায় ভূমির কথা বলেছেন। যা হোক, তিনটি অসম উচ্চতায় অবস্থিত মালভূমিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, এগুলি "Flat extremely gullied, studded with low rounded hills and bordered by steep escarpments. (600 মিটার) ছোটনাগপুর মালভূমির ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল একই উচ্চতায় অবস্থিত রাঁচী

ও হাজারীবাগ মালভূমির উপস্থিতি। এই দুটি মালভূমির মাঝখানে রয়েছে দামোদর উপত্যকা। হাজারীবাগ মালভূমিতে অবস্থিত সর্বোচ্চ পাহাড়টি হল পরেশনাথ। এর উচ্চতা 1370 মিটার। হাজারীবাগ মালভূমির উত্তরে রয়েছে কোর্ডামা মালভূমি 300 মিটার। এটি ভারতের অন্যতম অভ্র উৎপাদক অঞ্চল। কোর্ডামা মালভূমির উত্তর পূর্ব দিকে রয়েছে রাজমহল পাহাড়। আগ্নেয়গিরির লাভায় আবৃত এই পাহাড়টি (300–450 মিটার উঁচু) উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত।

● **নদনদী ঃ** বহু সংখ্যক নদনদী এই মালভূমির উপর দিয়ে নানা দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এদের মধ্যে সাউথ কোয়েল, নর্থ কোয়েল, সুবর্ণরেখা, দামোদর এবং বরাকরের বিস্তীর্ণ অববাহিকা রয়েছে (চিত্র 3.87)। আর অজয়, ময়ূরাক্ষী, ব্রাহ্মনী, পরস্পরের সাথে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমভূমিতে গঙ্গায়-ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। মালভূমির উত্তর প্রান্তে পুনপুন, ফল্গু, সাকরী এবং কিউল নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

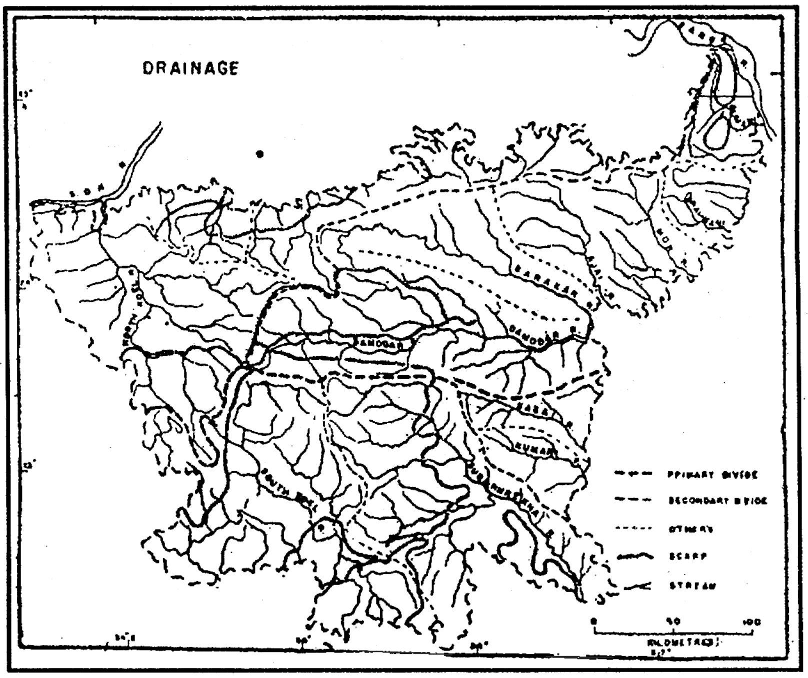

চিত্র 3.87 ঃ ছোটনাগপুর ঃ নদনদী

নদীগুলি নিম্ন অংশে বিস্তীর্ণ, অগভীর উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছ, কিন্তু উচ্চ অংশে খাড়া, সরু উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এই অংশে জলপ্রপাত ও রয়েছে।

ছোটনাগপুরের নদীবর্তন (River regime) বেশ চিত্তাকর্ষক। বর্ষাকালে নদীগুলিতে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়, অন্যসময় (খরার সময়) নদীতে জল থাকে না বললেই চলে। নদীগুলিতে হঠাৎ করে বন্যা দেখা যায়, আবার কয়েক ঘণ্টা পর জলস্তর হঠাৎ নেমে যায়।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সমপ্রায় ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহি হবার দরুণ এখানকার জলনির্গম প্রণালী বৃক্ষরূপী। এ থেকে বোঝা যায় এখানকার নদনদীর বিকাশে আংশিক গাঠনিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আবার স্থানীয় ভূ-গঠন জলনির্গম প্রণালীর বিকাশে সাহায্য করেছে। যেমন চ্যুতি সৃষ্ট অববাহিকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত দামোদরের বিস্তীর্ণ

সোজাপথ গম্বুজাকৃতি পরেশনাথ পাহাড় থেকে সৃষ্ট কেন্দ্রবিমুখ প্রণালী।

● **জলবায়ু ঃ** অঞ্চলটি মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবাধীন। মার্চ মাস আসার সাথে সাথে উষ্মতা বাড়তে থাকে এবং মে মাসে তা চরমে পৌঁছায়। মাসিক গড় তাপমাত্রার পার্থক্য 29^0 সে. থেকে 32^0 সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর ফলে মালভূমির উত্তর পূর্ব দিকে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। আর পশ্চিম দিক থেকে প্রতি ঘণ্টায় 9.6 থেকে 14.4 কি.মি. বেগে বায়ু বয়। পশ্চিমবঙ্গের কালবৈশাখীর প্রভাবে এপ্রিল মাসে এখানে কিছু বৃষ্টি হয়।

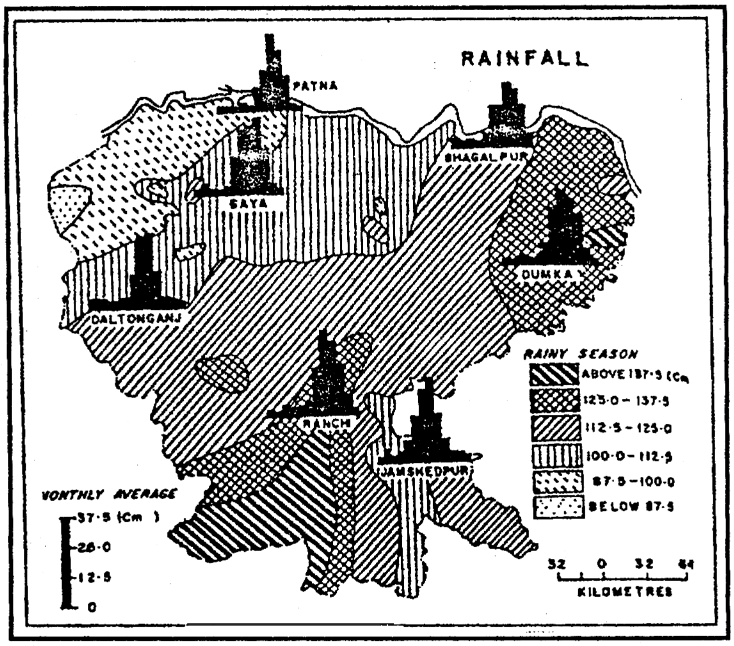

চিত্র 3.44 ঃ ছোটনাগপুর বার্ষিক বৃষ্টিপাত

বর্ষা আসার (জুন থেকে অক্টোবর) সাথে সাথে তাপমাত্রা কমতে থাকে। গোটা বছরের বৃষ্টির 40 শতাংশ এই সময়ই ঘটে থাকে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 100 থেকে 150 সে.মি.র মধ্যে থাকে। বছরে বছরে অবশ্য এর হেরফেরও ঘটে। বৃষ্টিপাত দক্ষিণ থেকে উত্তর এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে কমে যায়। এছাড়া ভূপ্রকৃতিগত কারণে স্থানীয়ভাবে বৃষ্টিপাতের পার্থক্য ঘটে। উঁচু স্থানগুলিতে বৃষ্টিাতের পরিমান বেশী। যেমন নেতারহাটে (1000 মিটার উঁচু) সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়, আর চাইবাসা সমভূমিতে (300 মিটার কম) বেশ কম বৃষ্টি হয়।

শীতকাল নভেম্বর মাস থেকে শুরু হয় ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত চলে। জানুয়ারী মাসের সাধারণ উষ্মতা হাজারীবাগ ও রাঁচীতে যথাক্রমে 16.4^0 সে. এবং 17.3^0 সে.।

● **মৃত্তিকা ঃ** আদি শিলার প্রকৃতি অনুযায়ী মৃত্তিকার হেরফের হয়। দামোদর উপত্যকার আল্‌গা পলি মাটি, পাট অঞ্চলের উচ্চতায় ল্যাটেরাইট মাটি, রাজমহল উচ্চভূমির (রেগুর ও ল্যাটেরাইট মাটি ছাড়া) মৃত্তিকা হল গ্রানাইট ও নীস পাথর থেকে সৃষ্ট লোহিত মৃত্তিকা। শেষোক্ত মাটির স্তর উপত্যকা এলাকায় গভীর। এতে যথেষ্ট পরিমাণে পটাশ ও চুন আছে, কিন্তু নাইট্রোজেন, ফসফরিক অ্যাসিড এবং হিউমাসের অভাব আছে। রাজমহল পাহাড়ের রেগুর মাটি সিলিকা, কেয়োলিন এবং পটাশ, ম্যাগনেসিয়া এবং আয়রন-অক্সাইড সমৃদ্ধ। বর্ষার সময় এই মাটি চটচটে হয়, কিন্তু গরমকালে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়। এই মাটি উর্বর। পাট দেশের ল্যাটেরাইট মাটি অনুর্বর।

● **স্বাভাবিক উদ্ভিদ ঃ** যদিও যথেষ্ট অরণ্যচ্ছেদন ও পশুচারণের দরুণ অধিকাংশ স্বাভাবিক উদ্ভিদ কেটে ফেলা হয়েছে, তবুও কিছু কিছু নামী দামী অরণ্য মনুষ্যের অগোচরে রয়ে গেছে। ছোট নাগপুর মালভূমিতে তিন ধরণের অরণ্য রয়েছে—

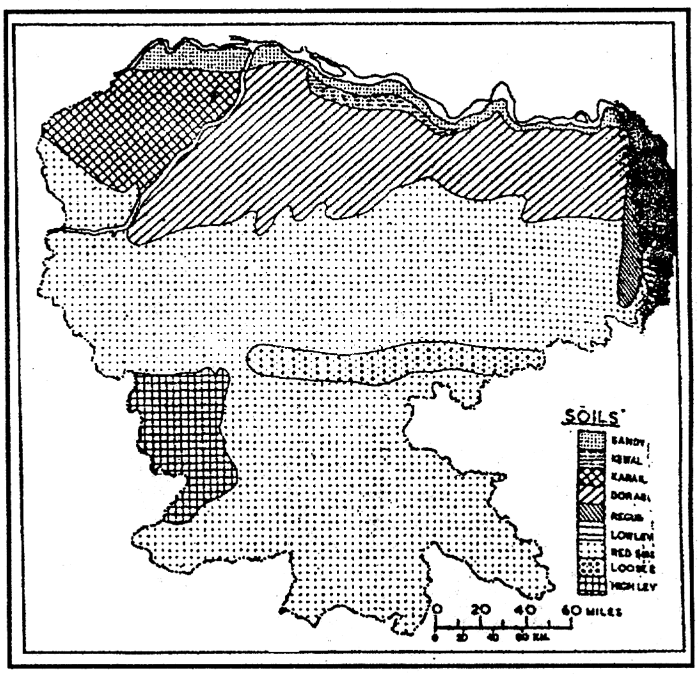

চিত্র 3.89 ঃ ছোটনাগপুর মৃত্তিকা

(i) হাজারীবাগ মালভূমির প্রান্তভাগে শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য দেখা যায়। এখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 125 সে.মি.-র কম। এখানে বিভিন্ন ধরণের খর্বাকৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ দেখা যায়— মহুয়া, পলাশ, খয়ের, আমলতাস, হারা, বাঁশ এবং কুশ বা সাবাই ঘাস জন্মায়। এই ধরণের অরণ্য বিচ্ছিন্ন ভাবে নদী উপত্যকায় দেখা যায়।

(ii) হাজারীবাগ মালভূমি, লোয়ার পালামৌ এবং পাট অঞ্চলে ব্যাপকভাবে শুষ্ক শাল অরন্য দেখা যায়। রাঁচী মালভূমি এবং সিংভূম জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে শাল অরন্য গড়ে উঠেছে। উত্তর পশ্চিম দিকে বাঁশ, বাবুল ও শালের মিশ্র অরণ্য দেখা যায়।

(iii) আর্দ্র শাল অরণ্য সিংভূত জেলায় দেখা যায় (চিত্র 3.90)। এছাড়া এখানে কুসুম, মহুয়া, খয়ের গাছও পাওয়া যায়। এই স্থানে সাবাই ঘাস ও বাঁশ ও জন্মায়। সিংভূমের সারাণ্ডা ও কোলহান অঞ্চলে সেগুণ গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

● **খনিজ সম্পদ ঃ** ছোটোনাগপুর মালভূমিকে বলা হয় ভারতের খনিজ ভাণ্ডার। তিনটি পৃথক দৃষ্টিকোন থেকে ছোটোনাগপুর মালভূমিকে খনিজ ভাণ্ডার বলা চলে। এই মালভূমি ও তার নিকটবর্ত্তী এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের খনিজ নির্ভর শিল্পের প্রধান খনিজ দ্রব্য অনেকক্ষেত্রেই ছোটোনাগপুর মালভূমি থেকে উত্তোলিত হয়। দ্বিতীয়, ছোটোনাগপুর মালভূমিতে যত খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয় তত খনিজদ্রব্য ভারতের অন্য কোথাও উত্তোলিত হয় না। তৃতীয়ত, কতগুলি খনিজ সম্পদ জাতীয় উৎপাদনের শতকরা 60 থেকে 40 ভাগ পর্যন্ত এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। ভারতের তাম্র উৎপাদনের শতকরা 60 ভাগ, কায়ানাইট উৎপাদনের শতকরা 15 ভাগ,

কয়লা, অভ্র, বক্সাইট ও চীনামাটি উৎপাদনের শতকরা 50 ভাগের বেশী এবং আকরিক লৌহ উৎপাদনের শতকরা প্রায় 40 ভাগ ছোটোনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়। ভারতের সঞ্চিত কয়লা ভাণ্ডারের শতকরা 80 ভাগ

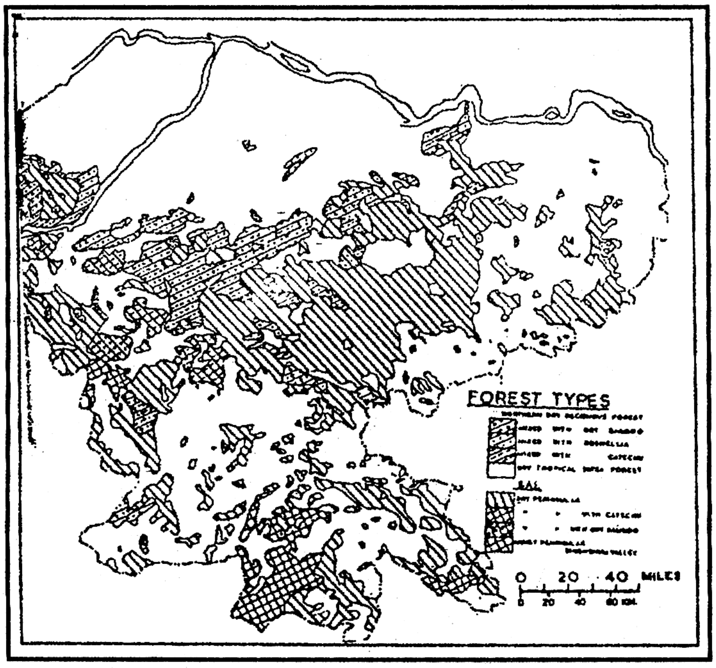

চিত্র 3.90 ঃ ছোটনাগপুর উদ্ভিদ

এবং জ্বালানী কয়লা ভাণ্ডারের শতকরা 80 ভাগ এই অঞ্চলে মজুত আছে। পশ্চিমে বোকারো কয়লা বলয় থেকে পূর্বে ঝরিয়া কয়লা বলয় পর্যন্ত বিস্তৃত এখানকার কয়লা সম্পদ (চিত্র 3.90)। সিংভূম জেলাস্থ কোলহান অঞ্চলের আকরিক লৌহ ভাণ্ডারটি ধারওয়ার বলয়ের অন্তর্গত। পালামৌ, হাজারীবাগ, রাঁচী ও সিংভূম জেলাগুলিতে চুনাপাথর ছড়ান আছে। কোডার্মা মালভূমির উত্তরাংশে 128 km দৈর্ঘ্য ও 32 km প্রস্থ স্থান জুড়ে অভ্র বিদ্যমান। সিংভূম জেলাস্থ 130 km দৈর্ঘ্যের বলয় জুড়ে তাম্র খনি রয়েছে। চক্রধরপুরের কাছে দৌরপুরল থেকে রাখা খনি, মোসাবানি ও বাহারগোড়া পর্যন্ত ঐ তাম্র বলয় প্রসারিত। পাট অঞ্চলের লোহারদাগায় বক্সাইট পাওয়া যায়। সিংভূম জেলাস্থ চাইবাসা অঞ্চলে আকরিক ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। রাখা খনি অঞ্চলে অদূরে যদুগোড়ায় ইউরোনিয়াম পাওয়া যায়। রাজমহলের নিকট চীনামাটি পাওয়া যায়। এছাড়া অ্যাপাটাইট, অ্যাসবেস্টস, ডলোমাইট, পাইরাইটস, ক্রোমাইট, কায়ানাইট, ফেলস্‌পার স্টিয়াটাইট প্রভৃতি সিংভূম অঞ্চলে পাওয়া যায়।

নিম্নে কয়েকটি প্রধান খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন অঞ্চলের নাম দেওয়া হল ঃ

❑ 1. **কয়লা ঃ** ঝরিয়া অঞ্চল (লৌহ ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় উন্নত মানের কোক কয়লার জন্য প্রসিদ্ধ), বোকারো অঞ্চল, রামগড় অঞ্চল, করনপুরা অঞ্চল, ডাল্টনগঞ্জ অঞ্চল, দেওঘর-গিরিডি অঞ্চল, রাজমহল অঞ্চল।

❑ 2. **অভ্র ঃ** হাজারীবাগ জেলাস্থ কোডার্মা, ঝুমরি-তিলাইয়া, সিঙ্গুর, দোমচাঞ্চ, গিরিডি অঞ্চলে উন্নতমানের অভ্র উত্তোলন করা হয়।

❑ 3. **তাম্র** ঃ সিংভূত তাম্র বলয়ের মোসাবানি, রাখা ও তামাপাহাড় খনি অঞ্চল।

❑ 4. **আকরিক লৌহ** ঃ সিংভূমি জেলার দঃ পঃ ভাগে আকরিক লৌহ সমৃদ্ধ সারি সারি পাহাড় বর্তমান। উহা উন্নতমানের হেমাটাইট। নোয়ামান্ডি ও গুয়া লৌহ আকরিকের জন্য প্রসিদ্ধ।

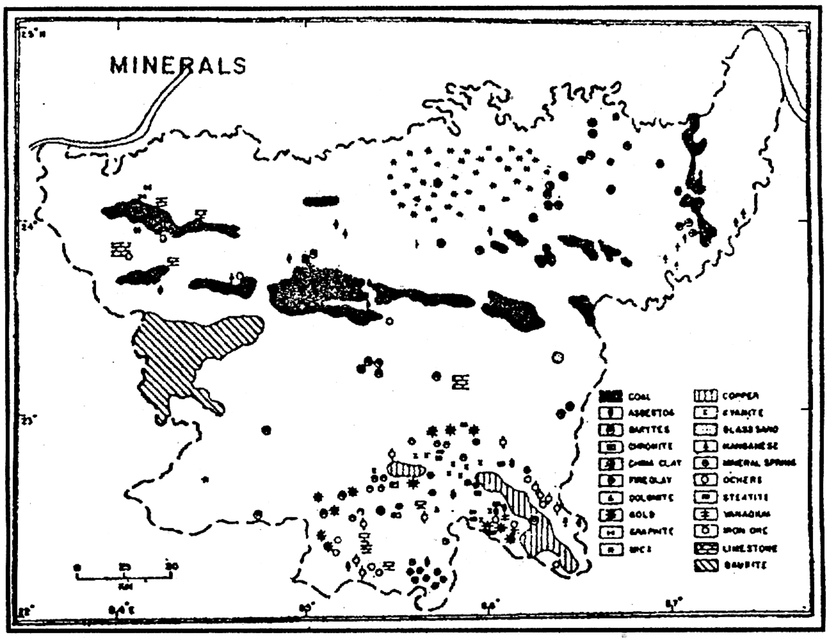

চিত্র 3.91 ঃ ছোটনাগপুর খনিজ সম্পদ

❑ 5. **চুনাপাথর** ঃ পালামৌ জেলার চাপ্রি, বাজেটোলি এবং ভবনাথপুরে উন্নতমানের চুনাপাথর পাওয়া যায়। শোন উপত্যকার চুনাপাথরের সঙ্গে তা মিশিয়ে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ধাতু নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সিমেন্ট তৈরীর উপযোগী চুনাপাথর হাজারীবাগ, রাঁচী ও সিংভূম জেলায় পাওয়া যায়।

❑ 6. **বক্সাইট** ঃ চী ও পালামৌ জেলায় অবস্থিত উপারঘাট ও ঘুরিয়া উচ্চভূমির নানা জায়গায় বক্সাইট বিদ্যমান। রাঁচীর লোহারডগা উন্নত মানের বক্সাইটের জন্য প্রসিদ্ধ।

❑ 7. **আকরিক ম্যাঙ্গানীজ** ঃ সিংভূম জেলার চাইবাসা অঞ্চলে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়।

❑ 8. **অ্যাসবেস্টস** ঃ সিংভূম জেলার কালিমাটি, বিচাবারু, জোজোহাটু, রোরেবুরু প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রাইসোটাইল অ্যাসবেস্টস পাওয়া যায়। অ্যাবেস্টস সিমেন্ট তৈরী করতে ক্রাইসোটাইল অ্যাবসেস্টস ব্যবহৃত হয়।

❑ 9. **ক্রোমাইট** ঃ সিংভূম জেলার জোজোহাটু, রোরেবুরু ও কোলহান অঞ্চলে উচ্চমানের ক্রোমাইট পাওয়া যায়। স্টেইনলেস স্টীল, রাসায়নিক দ্রব্য, ক্রোমাইট ইট তৈরীর কাজে উহার ব্যবহার হয়।

❑ 10. **চীনামাটি** ঃ সিংভূম জেলার চাইবাসার 48 km দক্ষিণে অবস্থিত হাট গামারিয়ায় অতি উচ্চমানের চীনামাটি বা কেওলিন পাওয়া যায়। মৃৎশিল্পে উহা ব্যবহৃত হয়।

❑ 11. **ফায়ার ক্লে** ঃ পালামৌ জেলার রাজাহারা অঞ্চলে ফায়ার ক্লে পাওয়া যায়। তাপ নিরোধক দ্রব্যাদি উৎপাদনে উহার ব্যাপক ব্যবহার আছে।

❑ 12. **ডলোমাইট** ঃ হারিপাহাড় ও পানপাহাড় অঞ্চলে ডলোমাইট পাওয়া যায়।

❑ 13. **ইউরেনিয়াম ঃ** সিংভূম জেলায় যদুগোদা খনি-ই-বর্তমানে ভারতের একমাত্র ইউরোনিয়াম উৎপাদন কেন্দ্র। পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

❑ 14. **কেয়োনাইট ঃ** সিংভূম জেলার লার্পাসা বুরু অঞ্চলে প্রায় সাত লক্ষ টন কায়ানাইট মজুত আছে। কায়ানাইট সাধারণ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়না। উহা উষ্মতায় প্রসারিত হয়। 12000°C উষ্মতায় কায়ানাইটকে মিডলাইট নামক পদার্থে রূপান্তরিত করা হয়। গ্যাস বাতির আলো জ্বালাবার অংশ, স্পার্ক প্লাগ, হিটার, উচ্চশক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর এবং তাপ নিরোধক ইট তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

❑ 15. **স্টিয়াটাইট ঃ** প্রায় ষাট লক্ষ টনের মত স্টিয়াটাইট এখানে মজুত আছে। ক্রোমাটাইট বলয়েই প্রধানত উহা পাওয়া যায়। সিংভূত জেলার ভিটারের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ও টাটানগরের দক্ষিণে টুরামদি ও বুদাদা অঞ্চলে উহার উত্তোলন কেন্দ্র কেন্দ্রীভূত। মৃৎশিল্পে স্টিয়াটাইটের ব্যাপক ব্যবহার আছে। সুইচ বোর্ড ও অ্যাসিড প্রুফ টেবিলে, টিউব এবং ট্যাঙ্ক তৈরী করতে স্টিয়াটাইটের প্রয়োজন হয়।

❑ 16. **ভ্যানাডিয়াম ঃ** সংকর ইস্পাত তৈরী করতে ভ্যানাডিয়াম প্রয়োজন। ভারতে উহার খুব অভাব। সিংভূম জেলার দুবলাবেরা অঞ্চলে ম্যাগনেটাইটের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় ভ্যানাডিয়াম পাওয়া যায়। ভ্যানাডিয়ামের শতকরা 15 ভাগ বিশেষ ধরণের সংকর ইস্পাত তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক শিল্পে ও উহার ব্যবহার আছে।

● **জনসংখ্যা ঃ** ছোটনাগপুর মালভূমির জনবন্টন অসম। প্রধানত ভূ-প্রকৃতি ও অংশত জনসংখ্যা বিস্তারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এর জন্য দায়ী। পাহাড়ী ও এবড়ো খেবড়ো এলাকা যেমন পাট অঞ্চল পালামৌ ও পশ্চিম হাজারীবাগের ক্ষয়িত ভূমিভাগ, কোডার্মা মালভূমির উত্তরের ব্যবচ্ছিন্ন প্রান্তভাগ, রাজমহল পাহাড় এবং দক্ষিণের ব্যবচ্ছিন্ন উচ্চভূমিতে খুব কম জনবসতি লক্ষ্য করা যায়। বিস্তীর্ণ উপত্যকায় ঘন বসতি লক্ষ্য করা যায়। খাড়া ভৃগু ও পাহাড়ী ঢাল বলতে গেলে জনমানবহীন। তুলনামূলকভাবে হাজারীবাগ ও রাঁচী মালভূমির সমতল এলাকা, এবং সিংভূম সমভূমিতে একটু বেশী লোক বাস করে।

আমরা জানি যে একসময় ছোটনাগপুর মালভূমি ঘন অরণ্যে ঢাকা বিপদ সংকূল এলাকা ছিল। কিন্তু খনিজ দ্রব্যের প্রাপ্তি, এবং বিশেষ করে স্বাধীনতার পর বড় বড় শিল্প (সিন্ধ্রির সার কারখানা, বোকারো ইস্পাত কারখানা), দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ ঐসব স্থানগুলিতে অত্যাধিক জনসমাগম ঘটিয়েছে। যেমন দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ) ধানবাদ শিল্পবলয়, কিংবা জাবশেদপুর আদিত্যপুর শিল্পবলয়ের জনসংখ্যা বিস্তার একটি সীমার মধ্যে এসে পৌঁছেছে। অন্যত্র অর্থাৎ পাহাড় ঘেরা স্থানগুলি এখন ও জনবিরল রয়ে গেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বসতির ধরণ নিয়ে দু-চারকথা বলা যাক। মোটের ওপর, ছোটনাগপুর মালভূমির বসতি হল বিক্ষিপ্ত ধরণের। নিম্ন দামোদর উপত্যকায় সংঘবন্ধ বসতি দেখা যায়, যথা ধানবাদ জেলা, এবং চাইবাসা সমভূমি। তুলনামূলকভাবে সমতল রাঁচী এবং হাজারীবাগ মালভূমিতে সংঘবন্ধ বা প্রায় সংঘবন্ধ বসতি দেখা যায়। সাঁওতাল পরগণায় বিক্ষিপ্ত লাইনবন্দী বসতি খুব চোখে পড়ে। পালামৌ জেলায় ছোট ছোট গ্রাম চোখে পড়ে। নর্থ কোয়েল অববাহিকায় সংঘবন্ধ গ্রাম চোখে পড়ে। মালভূমিতে বেশীর ভাগ বসতি সংঘবন্ধ ও নয়, আবার বিক্ষিপ্ত ও নয়। এখানে একটা মধ্যবর্তী গ্রাম থাকে, তার সাথে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি এবং কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বসতি।

ঘরবাড়ি ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম বিহারের অবস্থাপন্নদের দোতালা বাড়ির সামনে লাগোয়া বড় বারান্দা থাকে। দোতলা বাড়ির একতলায় রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর থাকে। সাঁওতাল পরগনার সাঁওতালারা তাদের বাড়িতে রোজকার ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু গাছ লাগায়। একটা লম্বা রাস্তার দু'ধারে বাড়িগুলো তৈরি হয়। এদের গ্রামগুলো উঁচু ও শুকনো জায়গায় গড়ে ওঠে। প্রধান ঘরের পাশে গোয়াল ঘর, গোলা ও কোন কোন সময় শুয়োরের খোঁয়াড়

থাকে। সাঁওতালরা মাটির দেওয়ালে নানারকম ছবি আঁকে। তুলনামূলকভাবে ছোটনাগপুরের অন্যান্য অঞ্চলের বাড়িগুলো ছোট্ট— 2.5 মিঃ উঁচু, 3 মিঃ চওড়া। দেওয়াল মাটির ও ছাদ লাল টালি বা ঘাস দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির দু'দিকই একটু উঁচু করে বারান্দা তৈরি করা হয়। ছোটনাগপুরের উত্তর ও পশ্চিমে বসবাসকারী ওঁরাও উপজাতিদের ঘরবাড়ি সাদামাটা। ঘরগুলো বেশ ছোট। বাড়িগুলো অপরিষ্কার, এগুলো ঘেরা থাকে না। বাড়িগুলো তিন চারটে সারিতে মুখোমুখিভাবে বানানো হয়। প্রতি বাড়িতে ছোট্ট উঠোন থাকে। উঠানে জল বের হবার ভালো ব্যবস্থা থাকে না। মানুষ ও পোষা জন্তুজানোয়ারের এক সঙ্গে বাস করে, তবে শুয়োরের খোঁয়াড় আলাদা থাকে। এখানকার দেওয়াল ল্যাটারাইট মাটি দিয়ে তৈরি বলে তা খুব শক্ত হয়। পরনো ওঁরাও গ্রামে অবিবাহিত পুরুষদের রাতে থাকা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য ধুমকারিয়া নামে আলাদা যুবগৃহ থাকে। সেখানে কেউ গরহাজির থাকলে কিম্বা অন্য জায়গায় রাত কাটালে তাকে জরিমানা দিতে হয়। গ্রামের অনুঢ়া বালিকারা একত্রে অন্য একটি ঘরে রাত কাটায়। ওঁরাও পরিবারের ছোট ছোট বাড়ির কথা চিন্তা করলে এধরনের ব্যবস্থা খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। সিংভূম জেলায় "হো" উপজাতিরা পাহাড়ের গায়ে সুন্দরভাবে গ্রাম তৈরিকরে। বহু প্রকার প্রয়োজনীয় গাছপালা দিয়ে সাজানো এই গ্রামগুলো দূর থেকে দেখতে সুন্দর লাগে। কোন কোন অবস্থাপন্ন চাষীরা এই অরণ্য পরিবেশেই বাস করে। এখানকার বাড়িগুলোর ভিত উঁচু। বাড়িগুলো আয়তনে বড়। বাড়িতে বারান্দাও আছে। বাড়ির দেওয়াল মাটি ও কঞ্চি দিয়ে তৈরি। চাল খড় কিংবা শুকনো ডালপাতা দিয়ে ছাওয়া হয়।

কৃষি ঃ 70 থেকে 85 শতাংশ লোকের প্রধান বৃত্তি হল কৃষি। কৃষিফসলের মধ্যে এখানে মোট দানার ধানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি জেলাতেই খারিফল শস্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি জেলাতেই খারিফ শস্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ভাদই শষ্যে গুরুত্ব কম। রবি শস্যের চাষ অনেক স্থানে হয় না বললেই চলে। সাঁওতাল পরগণা, হাজারীবাগ ও রাঁচী জেলায় ভুট্টা জাতীয় ভাদই শস্যের চাষ হয়।

ছোটনাগপুর মালভূমির প্রধান সমস্যা হল বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, অনুর্বর মৃত্তিকা, মৃত্তিকার অগভীর আস্তরণ, মৃত্তিকার ক্ষয়, মৃত্তিকার জল ধারণ ক্ষমতাহীনতা এবং মৌসুমী বৃষ্টির ওপর নির্ভরতা।

বৃষ্টি শুরুর সাথে সাথে ভুট্টার বীজ উঁচু জমিতে (বাড়ীর লাগোয়া জমিতে) ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ভুট্টা কাটা হয়ে যাবার পর, জমিকে ফেলে রাখা হয়। ধান ও ভুট্টা ছাড়াও রাগী, ছোলার ডাল, ও শাকসজ্জী চাষ করা হয়। হাজারীবাগ ও রাঁচীতে, ছোলার ডাল পালামৌ এবং সাঁওতাল পরগনাতে এবং শাকসুজ্জী ধানবাদ ও রাঁচী জেলায় বেশী চাষ করা হয়। বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল ধানের উৎপাদন বছরে বছের হেরফের হয়।

চাষবাসের পাশাপাশি পশুপালন ও পোল্টীফার্ম ও করা হয়। এতে করে কিছুটা আয়ের পথ প্রশস্ত হয়। এখানকার গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রুগ্ন, কারণ তারা মাঠের ঘাসের ওপরই বেঁচে থাকে। অনেক সময় খরায় মাঠের ঘাস শুকিয়ে যায়। এখানকার কৃষি ব্যাপক প্রকৃতির তাই উৎপাদন ও সীমিত। খাদ্য উৎপাদনের দিক দিয়ে ছোটনাগপুরের কোন জেলাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাই বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়।

পরিবহন ঃ ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। মেন লাইন (রেলপথ) 1871 সালে তৈরী হয়েছিল। এবার ধীরে ধীরে দক্ষিণ পূর্ব মেন লাইন, রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া লাইন, গ্রাণ্ড কর্ড লাইন যাত্রী পরিবহন করে, যেমন বরকাকানা কয়লা, টাটানগর-বাদামপাহাড়, রাজখারসাবাস-গুয়া লৌহ আকরিক, লোহারডগা, রাঁচী-মুরী লাইনে বক্সাইট পরিবাহিত হয়।

রেলপথ বিকাশের পাশাপাশি সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে সড়কপথের বিকাশ ঘটেছে। এখানকার দুটি প্রধান সড়কপথ হল গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোড এবং গাড়োয়া-ডালটনগঞ্জ-রাঁচী-মুরী সড়কপথ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সড়কপথের মধ্যে অরঙ্গাবাদ, ডালটনগঞ্জ, নাওয়াদা-বারহি-রামগড়-রাঁচী, দুমকা-সাহেবগঞ্জ, ডালটনগঞ্জে-রাঁচী-মুরীর নাম করা যেতে পারে। এছাড়া গ্রামথেকে গ্রামে যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ী চলার পথ এবং পায়ে হাঁটার পথ রয়েছে।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের যে সকল উপাদান শিল্প বিকাশে সহায়তা করে তা নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করা চলে ঃ

1. ছোটনাগপুরে বনজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য আছে যা শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান দেয়।
2. উন্নত মানের আকরিক লৌহ, কোক কয়লা, চুনাপাথর, তামা, বক্সাইট প্রভৃতির প্রাচুর্য থাকার জন্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ও অন্যান্য ধাতব শিল্প গড়ে উঠেছে।
3. বাঁশ, সাবাই ঘাস, কাঠ, লঙ্কা, তসর প্রভৃতি কাগজ শিল্প, আসবাবপত্র শিল্প, প্লাইউড শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, লাক্ষা শিল্প, তসর বস্ত্র শিল্প এবং অনুরূপ আরও অনেক বনজ দ্রব্য-নির্ভর শিল্প গড়ে উঠেছে।
4. চুনাপাথর, কোয়ার্টজ, বালি, কয়লা ও কোক কয়লার প্রাচুর্যের জন্য অনেক বড় বড় সিমেন্ট শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, সার শিল্প, রিফ্রাক্টর শিল্প প্রসারলাভ করেছে।
5. ইদীনীংকালে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি শিল্পের প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়। দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের (DVC) অধীনে বোকারো ও চন্দ্রপুরায় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং মাইথন, তিলাইয়া ও পাঞ্চেৎ বাঁধে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া বিহারের পাত্রাভু কেন্দ্রে এবং পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালডিহি কেন্দ্রে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।
6. রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের উন্নতমানের কয়লা এখানকার কলকারখানার অতি প্রয়োজনীয় জ্বালানীর যোগান দেয়।
7. জাতীয় সড়ক নম্বর 2, 6, 23, 33 এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ও পূর্ব-রেলপথ এই অঞ্চলের সঙ্গে কলকাতা, দিল্লী ও মুম্বাই শহরের যোগসাধন করেছে। কাঁচামাল পরিবহন ও উৎপন্ন দ্রব্য সারা ভারতে ও বিদেশে পাঠাবার জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। রাঁচীতে একটি বিমান ঘাঁটি আছে।
8. পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশের নিবিড় জনবসতি এখানকার কলকারখানায় সুলভ শ্রমিক ও দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার পাবার সুবিধা দেয়।

   ছোটনাগপুর মালভূমির আদি অধিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, ওঁরাও মুন্ডা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এরা কায়িক শ্রমে পটু। এই সকল উপজাতির কর্মদক্ষতা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও কায়িক শ্রম এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে সহায়তা করেছে।
9. পার্শ্ববর্তী গঙ্গা সমভূমির নিবিড় জনবসতি এখানকার শিল্প দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করে।
10. যদিও কর্কটক্রান্তিরেখা ছোটনগাপুর অঞ্চল দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে, অধিকতর উচ্চতার জন্য এখানকার তাপমাত্রা পার্শ্ববর্তী গঙ্গা সমভূমি অপেক্ষা কম। মে জুন নাগাদ তাপমাত্রা বেশী থাকে। ঝড়ঝঞ্ঝার প্রকোপ কম। অর্থাৎ এখানকার জলবায়ু শিল্পায়নের প্রতিবন্ধক নয়।
11. সরকারী শিল্প নীতি এই অঞ্চলের শিল্প বিকাশের অন্যতম সহায়ক।

খনিজ শিল্প ঃ ভারতের বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র সর্বপ্রথম ছোটনাগপুর অঞ্চলে গড়ে ওঠে। জামসেদজী টাটার ব্যক্তিগত উদ্যোগে 1907 খ্রীষ্টাব্দে জামসেদপুরে সুবর্ণরেখা ও তাহার উপনদী খরকাই-এর মিলনস্থলে ভারতের বৃহত্তম বেসরকারী ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। 1911 খ্রীষ্টাব্দে এই কারখানায় উৎপাদন আরম্ভ হয়। স্থানীয় উচ্চমানের আকরিক লৌহ, কোককয়লা, চুনাপাথর ও ডলোমাইট, সুবর্ণরেখা ও খরকাই নদীরজল, কলকাতা শিল্পাঞ্চল ও বন্দরের সুবিধা এর সহায়ক।

পূর্বও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ও আধুনিক সড়কপথ প্রভৃতি এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে বোকারো শহরে আরও একটি লৌহ-ইস্পাত কারখনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা। ছোটনাগপুর মালভূমির পর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ এইখানে আরও নতুন নতুন কলকারখানা

গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সরকারী আনুকূল্যে ছোটনাগপুর মালভূমির শিল্পায়নে প্রভূত উন্নতি হয়। 1958 খ্রীষ্টাব্দে সরকারী পরিচালনাধীন রাঁচীর হেভি-ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন গঠিত হয়। এই সংস্থার অধীনে ক) হেভি মেসিন ব্লিডিং প্ল্যান্ট, খ) ফাউন্ড্রি ফোর্জ প্ল্যান্ট ও (গ) হেভি মেসিন টুল প্ল্যান্ট— এই তিনটি পৃথক শিল্পসংস্থা গঠন করা হয়েছে। জামসেদপুরে টাটা কোম্পানির টেলকো নামক শিল্প সংস্থায় 1943 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সর্বপ্রথম রেল-ইঞ্জিন নির্মিত হয়। জামসেদপুরে জার্মানীর মার্সিডিজ কোম্পানীর সহযোগিতায় টাটা-মার্সিডিজ কোম্পানীর ট্রাক নির্মাণের একটি কারখানা গড়ে উঠেছে। জামসেদপুরের ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানী ও পাইরাইটস্ এণ্ড কেমিক্যাল ডেভলপমেন্ট কোম্পানী নামে আরও দুইটি খনিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

এ ছাড়া ইন্ডিয়ান এক্সপোসিড ফ্যাক্টরি (গোমিয়া), ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানী তাম্র নিষ্কাশন কারখানা, ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (সিন্ধ্রি), দস্তা নিষ্কাশন কারখানা, সিমেন্ট তৈয়ারির কারখানা (ভুরকুণ্ডা, বানিয়ারি, সিন্ধ্রি, জাপলা, পুরুলিয়া, কাঁচশিল্প (রামগর), বৈদ্যুতিক শিল্প (তিতিসিলাই ও আদিত্যপুর) প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খনি শিল্প ঃ এখানকার খনিজ ভান্ডারকে কেন্দ্র করে ছোটনাগপুর মালভূমি ভারতের বৃহত্তম খনি শিল্প বলয়ে পরিণত হয়েছে। হাল্কা ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এবং চিরাচরিত কুটির শিল্প প্রভৃতির সমাবেশ ছোটনাগপুর শিল্পাঞ্চলকে স্বাধীন ভারতের একটি বিশিষ্ট শিল্পাঞ্চলে পরিণত করেছে।

বনজ শিল্প ঃ ছোটনাগপুর মালভূমির অন্যতম সম্পদ হল বনভূমি। পালমৌ অঞ্চলে বনভূমি সর্বাধিক (৫০ শতাংশ)। এর পর হাজারীবাগ (48 শতাংশ), সিংভূম (47 শতাংশ), রাঁচী (25 শতাংশ), এবং সাঁওতাল পরগণায় (23.7 শতাংশ) বনভূমি বিদ্যমান। শাল, মহুয়া, পলাশ, খদির, শিমূল, শিশু, গর্জন প্রভৃতি বৃক্ষ এবং বাঁশ ও সাবাই ঘাস এখানে জন্মায়। এই বনভূমি ছোটনাগপুর অঞ্চলে অনেক বনজ শিল্প গড়ে তুলেছে। শাল, সেগুন, মহুয়া, অর্জুন, কুসুম, শিরিস, পলাশ, শিমূল, ও কুসুম বৃক্ষে লাক্ষা উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে লাক্ষা শিল্প বিস্তার লাভ করেছে। এখানকার তসর শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার কেন্দুপাতা বিড়ি বাঁধার পাতা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাঁশ, সাবাই ঘাস প্রভৃতি কাগজ শিল্পের কাঁচামালের যোগান দেয়। দুমকায় কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে। কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁত শিল্প প্রধান। তসর, সিল্কদ্রব্য, চর্মদ্রব্য, লাক্ষাদ্রব্য, ছুরি ও কাঁচি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্পজাত দ্রব্য।

খনিজ শিল্প ও বনজ শিল্প ছাড়া আরও অনেক নতুন নতুন শিল্প ছোটনাগপুর মালভূমিতে গড়ে উঠেছে। সরকারী আনুকূল্যে/ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে প্রসার লাভ করেছে। সরকারী মালিকানায়ও অনেক কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে।

শিল্পাঞ্চল সমূহ ঃ খনিজ শিল্পগুলি খনি শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। রেলপথ ও জাতীয় সড়কের সহায়তায় খনি শহরের কারখানাগুলির আঞ্চলিক বিস্তার ঘটে। এইভাবে এই মালভূমি অঞ্চলে কয়েকটি শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে। যথা—(1) ধানবাদ ঝরিয়া—সিন্ধ্রি শিল্পাঞ্চল। (2) নোয়ামুন্ডি— ঘাটশিল্প—মৌভান্ডার—মোসাবনি—শিল্পাঞ্চল। (3) ঝুমরি— তিলাইয়া— গিরিডি— শিল্পাঞ্চল। (4) জামসেদপুর শিল্পাঞ্চল, (5) রাঁচী শিল্পাঞ্চল, (6) বোকারো শিল্পাঞ্চল জামসেদপুর শিল্পাঞ্চল বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

3.4 গ্রন্থপঞ্জী

1. মিত্র, কল্পনা ও পূরবী সেনগুপ্ত, ২০০৮ : *ভূ-ভারত তথা দূর-সংবেদন, কল্যাণী পাবলিশার্স, কলকাতা।*
2. বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ ও অজিতকুমার শীল, ২০০৮ : *আধুনিক ভূ-পরিচয়, ২য় খণ্ড, স্কলার বুকস্, কলকাতা।*
3. সেন, জ্যোতির্ময় ও রুমা ভৌমিক (সেনগুপ্ত) : *ভারতের ভূগোল, জি.এল.জি. পাবলিকেশনস্, শিলিগুড়ি।*
4. Khuller, D.R. 2008 : *India, A Comprehensive Geography, Kalyani, New Delhi.*
5. Singh, R.L. 1971 : *India, A Regional Geography, National Geographical Society of India, Varanasi.*
6. Tiwari, R.C. 2008 : *Geography of India, Prayag Pustak Bhawan, Allahabad.*

3.5 প্রশ্নাবলী

বড় মাপের প্রশ্নাবলী ঃ

1. ভারতবর্ষকে ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করুন। দাক্ষিণাত্য মালভূমির ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা করুন।
2. হিমালয় পর্বতশ্রেণীকে প্রধান প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করুন ও তাদের সম্বন্ধে লিখুন।
3. উত্তর ভারতের নদীর সাথে দক্ষিণ ভারতের নদীর (গোষ্ঠী) তুলনা করুন।
4. ভারতবর্ষকে ঋতু অনুযায়ী কয়ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলির বিবরণ দিন।
5. ভারতবর্ষকে জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করুন ও তাদের বিবরণ দিন।
6. ভারতবর্ষের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করুন ও তাদের বিবরণ দিন।
7. ভারতবর্ষের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের শ্রেণীবিভাগ করুন ও তাদের বিবরণ দিন।
8. ভারতবর্ষকে কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করুন ও আপনার শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি উল্লেখ করুন।
9. ভারতবর্ষের কয়লার উৎপাদন ও বণ্টন সম্বন্ধে একটি বিবরণ দিন।
10. ভারতের পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন ও বণ্টন সম্বন্ধে যা জানুন লিখুন।
11. ভারতবর্ষের কার্পাস বয়ন শিল্পে বণ্টন সম্বন্ধে কি জানেন লিখুন। কি কি কারণ এই শিল্পের অবস্থানের জন্য দায়ী?
12. ভারতবর্ষের জনবৃদ্ধির রূপটি কিরূপ? (1901-2001 সাল পর্যন্ত) ?
13. গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দিন।
14. ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দিন।

মাঝারি মাপের প্রশ্নাবলী ঃ

1. সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দিন।
2. গঙ্গা নদীগোষ্ঠীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
3. ভারতের জলবায়ুকে কি কি উপাদান নিয়ন্ত্রণ করে?
4. ভারতীয় অর্থনীতিতে মৌসুমী জলবায়ুর গুরুত্ব নিরূপণ করুন।
5. ভারতে বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

6. কার্পাস বয়ন মৃত্তিকা (রেগুন) সম্বন্ধে যা জানুন লিখুন।
7. হিমালয় পর্বতশ্রেণীর স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের একটি বিবরণ দিন।
8. অরণ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি?
9. অরণ্য নিধন কেন হচ্ছে?
10. ভারতে অচিরাচরিত শক্তি সম্বন্ধে যা জানুন লিখুন।
11. ভারতে আণবিক শক্তি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

1. ট্রান্স হিমালয় কি?
2. হিমাদ্রি হিমালয় কি?
3. ভারতে উপদ্বীপীয় অঞ্চল বলতে কি বোঝায়?
4. ভারতের উপকূলীয় সমভূমিতে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি?
5. ইন্দোব্র্যাম (Indo-Brahm) নদী সম্বন্ধে কি জানেন?
6. ভারতের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর নদনদীর দুটি প্রভাবের কথা উল্লেখ করুন।
7. ভারতের কৃষি উৎপাদনে পলিমাটির ভূমিকা কি?
8. Cwg বা আর্দ্র উপ-ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চল কি?
9. নালী ক্ষয় কি?
10. বাতাস দ্বারা মৃত্তিকা কিভাবে ক্ষয় হয়?
11. অরণ্য থেকে কি কি দ্রব্য পাই।
12. ভারতে ধান চাষের পদ্ধতিগুলি কি কি?
13. গম চাষের উপযোগী অবস্থাগুলি কি কি?
14. চা চাষের উপযুক্ত পরিবেশ বলতে কি বোঝায়?
15. কার্পাস চাষের অনুকূল অবস্থা কি কি?
16. পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষে ভালো হয় কেন?
17. রানধাওয়া (Randhawa) -র মতে ভারতের কৃষি অঞ্চল কটি ও কি কি?
18. ভারতে জলসেচের পদ্ধতিগুলি কি কি? জলাশয় থেকে জলসেচ কোন কোন কোন চালু আছে?
19. জলসেচের প্রয়োজনীয়তা কি?
20. ভারতের গন্ডোয়ানা যুগের কয়লা কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?
21. ভারতের কয়লাখনি অঞ্চলের সমস্যাগুলি কি কি?
22. ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ভৌগোলিক অবস্থাগুলি কি কি ?
23. ভারতে বিদ্যুৎশক্তি সম্বন্ধে লিখুন।
24. ভারতের জৈবগ্যাস সম্বন্ধে লিখুন।
25. ভারতের আকরিক লোহা কোন কোন রাজ্যে পাওয়া যায়? এদের উৎপাদন সম্বন্ধেও লিখুন।
26. ভারতের ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদক অঞ্চলগুলি কি কি?
27. বক্সাইটের ব্যবহার কি কি?
28. ভারতের কোথায় কোথায় তামা পাওয়া যায়?

29. ভারতের চুনাপাথরের বণ্টন সম্বন্ধে লিখুন।
30. হুগলী নদীর তীরে পাটকলগুলি গড়ে উঠেছে কেন?
31. ভারতে পাটশিল্পের সমস্যাগুলি কি কি?
32. ভারতের কার্পাস বয়নশিল্পের সমস্যাগুলি কি কি?
33. পূর্ব ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে কেন?
34. ভারতে লৌহা ও ইস্পাত শিল্পের সমস্যাগুলি কি কি?
35. উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পার্থক্য কেন ঘটে?
36. গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলকে ভূপ্রাকৃতিক দিক দিয়ে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি?
37. ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি কিরূপ?
38. ছোটনাগপুর মালভূমির খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও।